নিমাই ভট্টাচার্য

প্রেমের গল্প

প্রেমের গল্প

নিমাই ভট্টাচার্য

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

কামিনী প্রকাশালয়

১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন

কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ—১৩৫৯

প্রচ্ছদ :
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

banglabooks.in

সেলিম চিস্তি

'দেওয়ান-ই-আম'-এ এখন আর সম্রাট বিচার করেন না। 'দেওয়ান-ই-খাস্'-এ বীরবলের সঙ্গে পরামর্শ হয় না সম্রাটের। রাজপুত দুহিতা, জাহাঙ্গীর পত্নী যোধবাঈ তুলসী মঞ্চে প্রণাম করে 'দেওয়ান-ই-খাস্'-এর আসরে আসন গ্রহণ করেন না। সে সব দিন শেষ। ফুরিয়ে গেছে! ফতেপুর সিক্রী এখন মূক, বধির, প্রাণহীন। মিঞা তানসেনের গান শুনে যে রাজপ্রাসাদের মানুষ চঞ্চল হয়ে উঠত সকালে, সন্ধ্যায়, চারপাশের গ্রামের মানুষ মুগ্ধ হত যে সঙ্গীত সম্রাটের সুরে, সে অমৃত কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না।

সম্রাট নেই, সম্রাজ্ঞী নেই, নেই রাজপুত্র মন্ত্রী, রাজ জ্যোতিষী, গায়ক, সখী, বাঈজী, নতর্কী। কেউ নেই। সেনাপতি তো দূরের কথা, একজন সাধারণ সৈন্য পর্যন্ত নেই ফতেপুর সিক্রীতে। বুলান্দ দরওয়াজায় আজ আর অশ্বারোহী সৈন্যরা পাহারা দেয় না।

তা না হোক আজও মানুষের কলগুঞ্জনে মুখরিত হয় ফতেপুর সিক্রী। প্রাণহীন এই প্রাসাদ, তার পুরনো দিনের স্মৃতি সারা দেশের মানুষকে ঘরছাড়া করে। টেনে আনে! সারা বছর ধরে তারা আসে। দেখে। ভাবে। একটু আনমনা হয়ে ফিরে যায়।

না, রাজপ্রাসাদ দেখেই ফিরে যায় না। সবাই আসে শেখ সেলিম চিস্তির সমাধিতে। প্রণাম করে, প্রার্থনা করে। শ্বেতপাথরের জালিতে লাল সুতো বাঁধে। শ্বেত, শুভ্র, নির্মল, পবিত্র তীর্থে এসে কামনা-বাসনার আগুন ছড়িয়ে যায় সবাই।

'পাপিয়া, তুমি কিছু প্রার্থনা করে লাল সুতো বাঁধবে না?'

'না।'

অবাক হয় রঞ্জন, 'সেকি'? এবার একটু কাছে এসে নিবিড় হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, 'শুনেছি সেলিম চিস্তির কাছে কিছু চাইলে পাওয়া যায়।'

'আমিও শুনেছি।'

'তুমি কিছু চাইবে না? তোমার কোন প্রার্থনা নেই?'

পাপিয়া মুখ ঘুরিয়ে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি মুখ ফুটে চাইলেই সেলিম চিস্তি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন?'

রঞ্জন ঠিক জবাব দিতে পারেনি। 'না, তা ঠিক নয়, তবুও...'

'সেলিম চিস্তি নিশ্চয়ই আমার মনের কথা জানেন।'

সারা বছর ধরে মানুষের স্রোত বয়ে যায় এই সেলিম চিস্তির সমাধিতে। শীত গ্রীষ্ম শরৎ-হেমন্ত। সব সময়। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। আজ কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। বিকেল হতে না হতেই সবাই তাজের পথে। বিবর্ণ মনকে একটু রঙিন করবার জন্য

আজ সেলিম চিস্তির সমাধি ছেড়ে সবাই যমুনা পাড়ের তাজ দেখতে চলেছেন।

যখন শেষ দর্শনার্থীর দল ফতেপুর সিক্রীর পাহাড় থেকে নীচে নামতে শুরু করেছেন তখন বিবেক আস্তে আস্তে সেলিম চিস্তিব সমাধির সামনে এগিয়ে গেল।

'তোমার কাছে আমি আর কিছু চাই না, শুধু বছরে একবার আমাকে সেলিম চিস্তির সমাধিতে নিয়ে যেও।'

'আমাব কাছে আর কিছু চাও না?'

'না।'

বিবেক অবাক হয়। একটু ভাবে। 'সেলিম চিস্তির সমাধিতে গিয়ে কোন কিছু মানত করবে?'

'না, না, সেসব কিছু না।'

'তবে?'

'কিছুই না, শুধু ভালো লাগে।' একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে বিবেকের স্ত্রী। দৃষ্টিটা একটু যেন দূরের দিকে ছড়িয়ে দেয়। 'খুব ভালো লাগে ওখানে গেলে। মনে ভীষণ শান্তি পাই।'

বিবেক প্রত্যেক বছর স্ত্রীকে এনেছে। ফতেপুর সিক্রীতে এসে আকবরের প্রাসাদ দেখেনি। সারাদিন কাটিয়েছে এই সমাধি মন্দিরে। বিবেক বাধা দেয় না, কিছু বলে না। শুধু দেখে, বিভোর হয়ে দেখে আনমনা স্ত্রীকে।

হাসতে হাসতে বিবেক বলে, 'তুমি বোধহয় গতজন্মে সেলিম চিস্তির কেউ ছিলে।'

বিবেকের স্ত্রী হাসে।

'হাসছ?'

'হাসব না?'

'সত্যি বলছি তুমি ওখানে গেলে এমন বিভোর হয়ে যাও, আত্মভোলা হয়ে যাও যে আমার সত্যি মাঝে মাঝে মনে হয়...'

সমাধির মুখোমুখি হতেই থমকে দাঁড়াল।

'হ্যাঁগো, তোমাকে আমি বড্ড কষ্ট দিই, তাই না?'

'না, না, কষ্টের কি আছে?'

'কষ্ট বৈকি। আমার খামখেয়ালিপনার জন্য তোমাকেও দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়।'

বিবেক একটু কাছে টেনে নেয় স্ত্রীকে। 'আমার একটুও কষ্ট হয় না, ববং...'

'তুমি আমাব উপর রাগ করো না?'

পাহাড় দিয়ে নামতে নামতে বিবেক বুকের কাছে টেনে নেয় স্ত্রীকে। 'রাগ করব কেন?'

'বিশ্বাস কর, এখানে এলে আমার খুব ভালো লাগে। এখানে না এসে আমি থাকতে পারি না।' মুখ থেকে নয়, অন্তর থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এলো।

বিবেক যেন সব কথা শুনতে পাচ্ছে।

'যখন আমি থাকব না, তখন তুমি এসো! সেলিম চিস্তিব সমাধির আশেপাশেই

আমার আত্মা ঘোরাফেরা করবে। আমি এখান থে'ক কোথাও যাব না।'

ভাবতে গিয়েই বিবেকের চোখে জল আসে। তবু আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। একবার সেলিম চিস্তির সমাধির দিকে তাকিয়েই দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিল।

এপাশ থেকে ওপাশ।

মাঝপথে আটকে গেল। মনে হল এই ভদ্রলোককে যেন আগেও দেখেছে বিবেক। এই শেখ সেলিম চিস্তির সমাধিতে। গত বছর! পব পর কয়েক বছব। একবার এক হোটেলেই বোধহয় ছিল দুজনে।

টাঙাওয়ালা এসে ভদ্রলোককে ডাক দিল, 'সাব! চলিয়ে। রাস্তা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।'

ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়াতেই বিবেক যেন চিনতে পারল। কিছু বলল না। মনে মনে ভাবল, শেখ সেলিম চিস্তির কাছে ইনিও কিছু গচ্ছিত রেখেছেন নাকি?

তুফান এক্সপ্রেসের কামবায় দুজনের দেখা। টুন্ডলা পাব হবার পরই আলাপ হল। বিবেক জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি প্রায়ই দিল্লি আসেন?'

'কেন বলুন তো?'

'মনে হয় পর পর কয়েক বছর আপনাকে ফতেপুর সিক্রীতে দেখেছি।'

'ফতেপুর সিক্রী, মানে শুধু সেলিম চিস্তির সমাধিতে যাই।'

'হাঁ, হাঁ, সেলিম চিস্তির সমাধিতেই দেখেছি।'

এবার রঞ্জন জানতে চাইল, 'আপনিও বুঝি প্রত্যেক বছর এদিকে আসেন?'

একটু শুকনো হাসি হাসল বিবেক। একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ছাড়ল। 'আসি মানে আসতে হয়, না এসে পারি না।'

'কিছু মানত করেছেন বুঝি?'

'কিছু মানত করিনি। সেলিম চিস্তির কাছে আমার কিছু চাইবার নেই।'

'তবে আসেন কেন?'

তুফান এক্সপ্রেস চলছে। কানপুর, ফতেপুর পার হয়ে এলাহাবাদ আসে রাতের অন্ধকারে। প্রায সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদের দুজনের চোখে ঘুম নেই।

'আচ্ছা রঞ্জনবাবু, মারা যাবার পর আত্মার দেখা পাওয়া যায়?'

'ঠিক জানি না, তবে অনেকে বলেন, পাওয়া যায়।'

বিবেকবাবু তলিয়ে যান নিজের মধ্যে।

বোধহয় মির্জাপুর এল।

রঞ্জন প্রশ্ন কবল, 'আপনি কি অলৌকিক কিছু দেখার আশায় সেলিম চিস্তির সমাধিতে যান?'

'না তা ঠিক নয়, তবে আমার স্ত্রী বলেছিল, মরার পর সেলিম চিস্তির সমাধিব আশেপাশেই থাকবে..'

'উনি বুঝি সেলিম চিস্তির ভক্ত ছিলেন?'

'নিশ্চয়ই ছিল, তা নয়তো প্রত্যেক বছর কেন আসত?'

'প্রত্যেক বছর আসতেন?'

'হ্যাঁ।'

'বোধহয় সেলিম চিস্তির কাছে মানত করে কিছু পেয়েছিলেন। অথবা...'

বিবেকবাবু তাড়াতাড়ি ওকে বাধা দিয়ে বললেন, 'না রঞ্জনবাবু, ও কিছু মানত করত না। চুপ করে বসে বসে কি যেন ভাবত। তন্ময় হয়ে ভাবত।'

রাত আরো গভীর হয়।

'জানেন রঞ্জনবাবু, হঠাৎ আমাদের বিয়ে হয়। আমার স্ত্রী আগ্রাতে ওর ছোটোমামার কাছে ছিলেন। আমার শ্বশুরমশাই ওকে টেলিগ্রাম করে কলকাতায় আনান। ও আসার দুদিন পরেই আমাদের বিয়ে হয়।'

'তারপর?'

'বিয়ের পর আমার স্ত্রী আমাকে শুধু একটি অনুরোধ করেছিলেন...'

'কি?'

'প্রত্যেক বছর এই সেলিম চিস্তির সমাধিতে আনার অনুরোধ করেছিলেন।'

রঞ্জনের যেন কেমন লাগে শুনতে। একটু ভাবে। উনি কি 'আর্কিওলজিতে ইন্টারেস্টেড ছিলেন?'

'ওর মামা আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। আগে বহুদিন আগ্রা ফতেপুর সিক্রীতে ছিলেন।'

হঠাৎ রঞ্জন জিজ্ঞাসা করে, 'কি নাম বলুন তো?'

'সুধীর সরকার।'

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'সুধীরদা!'

সুধীর সরকারের নাম শুনতেই রঞ্জনের হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, মুখখানা কালো হয়ে গেল, কিন্তু অন্ধকার কম্পার্টমেন্টে বিবেকবাবু বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওঁকে চেনেন নাকি?'

'হ্যাঁ চিনি।'

'আপনিও কি আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন?'

আর সত্যি কথা বলতে পারল না রঞ্জন। বলল, 'না।'

বিবেকবাবু পার্সের ভেতর থেকে একটা ফটো বের করে প্যাসেজের আবছা আলোয় এগিয়ে ধরলেন, 'রঞ্জনবাবু, আমার স্ত্রীর ছবি।'

রঞ্জন ও ছবি দেখতে চায়নি। ও ছবি ওর মনের মধ্যে অসংখ্য স্মৃতির মালা দিয়ে বাঁধানো আছে। তবু না দেখে পারল না। পাপিয়া!

ট্রেন মোগলসরাই স্টেশনে ঢুকছে। রঞ্জন তাড়াতাড়ি সুটকেসটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল 'নমস্কার।'

'এখানেই নামবেন?'

'হ্যাঁ, আমি একটু বেনারস ঘুরে যাব।'

'আপনার ঠিকানাটা...'

রঞ্জন হাসল, 'কোনো দরকার নেই। ঐ শেখ সেলিম চিস্তির সমাধিতেই দেখা হবে।'

ব্যান্ড মাস্টার

ছেলেটির বেশ মিষ্টি চেহারা। প্রথম দিন দেখেই আমার ভালো লেগেছিল। বড় ট্রে-তে কাপ-ডিশ তুলে একটা ময়লা কাপড় দিয়ে টেবিল পরিষ্কার করে চলে যেত। চলে যাবার সময় হয়তো বা একবার চাইত আমার দিকে। এক মুহূর্ত, তার বেশি না। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি গুটিয়ে নিয়ে জনতা কফি হাউসের মধ্যে হারিয়ে যেত। তারপর উর্দিপরা বেয়ারা আসত। অর্ডার দিলে কফি এনে দিত। কফি খাওয়া শেষ হবার পরও আমি আর মৃদুলা বসে বসে গল্প করতাম। ওরই এক ফাঁকে বেয়ারা এসে পয়সা নিয়ে যেত। দশ-বিশ পয়সা টিপস দিতাম। কোনোদিন জাপানী পুতুলের মত হাতটা একটু তুলতো, কোনোদিন তুলতো না। চলে যেতো। আমি আর মৃদুলা তখনও গল্প করতাম। উঠতাম না। আবার ঐ ছেলেটা আসত। ট্রে-তে কাপ-ডিশ তুলতো, টেবিল সাফ করে দিত। একটু সলজ্জ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইত, হয়তো বা মৃদুলার দিকেও। আমি ওকে একটু ভালো করে দেখার আগেই ও জনতা কফি হাউসের জনারণ্যে হারিয়ে যেত।

এসব বেশ অনেক কাল আগেকার কথা। মুসৌরীতে বেড়াতে গিয়ে মৃদুলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। দিল্লিতে এসে ভাব হয়েছে। রোজ কফি হাউসে যাই, কনট প্লেসে ঘুরে বেড়াই। পাশাপাশি বসে সিনেমা-থিয়েটার দেখি। একটু হাত চেপে ধরি, একটু অহেতুক হাসি। সন্ধ্যায় অন্ধকার নেমে এলে দুজনে দুদিকে চলে যাই। রাত্রির অন্ধকারেও কেমন যেন একটা সোনালি সকালের নেশায় বিভোর থাকি।

তারপর আস্তে আস্তে কফি হাউসে যাওয়া বন্ধ করলাম। অত ভীড়ের মধ্যে কথা বলে মৃদুলার মন ঠিক ভরত না। একটু নিবিড় হবার জন্য মৃদুলা নিয়ে যেতো ইন্ডিয়া গেটের আশে-পাশের গাছতলায়, বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কে অথবা অন্য কোথাও। কফি হাউসের ঐ মিষ্টি চেহারার ছেলেটার সঙ্গে আর দেখা হতো না, কিন্তু মাঝে মাঝেই আমার মনে পড়তো। মনে পড়ত ওর সলজ্জ মিষ্টি দৃষ্টির কথা।

আমার আর মৃদুলার দিনগুলি বেশ কাটছিল। আনন্দে, খুশিতে। বিভোর হয়ে যেতাম নিজেদের স্বপ্নে। আস্তে আস্তে ভুলে গেলাম ঐ সুন্দর মিষ্টি চেহারার ছেলেটাকে। কফি হাউসের সামনে দিয়ে যাবার সময়ও মনে পড়ত না ওর সলজ্জ দৃষ্টির কথা।

বছরখানেক পার হয়ে গেল।

সুরেশ তানিজার বিয়েতে গেছি আমরা দুজনেই। বিরাট আয়োজন। প্যান্ডেলের গেটের কাছে বেশ ভীড়। একটু দূরেই ব্যান্ড পার্টি। মাঝে মাঝে হিন্দি ফিল্মের গান বাজাচ্ছে। আমি আর মৃদুলা একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। নানা কথা। নিজেদের

কথা। কবে এই রকম প্যান্ডেলের সামনে আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করব, কবে আমরা দুজনে...

'সেলাম সাব!' ব্যান্ড পার্টির একটা লোক এসে হঠাৎ আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে সেলাম জানাতেই চমকে উঠলাম।

আমি আর মৃদুলা অবাক হয়ে ওর দিকে চাইলাম।

'চিনতে পারছেন স্যার?'

আমি আর মৃদুলা এক সঙ্গেই বললাম, নাতো।

মাথার লাল রং-এর টুপিটা খুলে বলল, আমি কফি হাউসে...

এবার মনে পড়ল। কাপ-ডিশ তুলে নিত, টেবিল সাফ করত, আর মুহূর্তের জন্য একবার আমাকে আর মৃদুলাকে দেখত।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এখন তুমি ব্যান্ড পার্টিতে জয়েন করেছ?'

'হ্যাঁ সাব, বহুদিনের ইচ্ছা ছিল...'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

আরো দু'চারটে কথাবার্তার পর ও একবার মৃদুলার দিকে তাকিয়েই দৃষ্টিটা নামিয়ে নিল। খুব চাপা গলায় বলল, আগে জানলে আপনাদের সাদির সময় আমাদের ব্যান্ড পার্টি নিয়ে যেতাম।

কনুই দিয়ে মৃদুলাকে একটু গুঁতো দিয়ে আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমাদের এখনও বিয়ে হয়নি।

ও আমার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। মৃদুলাকে জিজ্ঞেস করল, বাবুজি ঝুট বলছেন, তাই না বিবিজি?

মৃদুলাও হাসল। 'বাবুজি ঝুট বলবেন কেন? সত্যি কথাই বলছেন।'

ছেলেটা যেন একটু নিশ্চিন্ত হল। দৌড়ে গিয়ে ব্যান্ড মাস্টারের কাছ থেকে একটা কার্ড এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, সাদির ডেট ঠিক হলেই একটা খবর দেবেন।

মৃদুলাকে বিয়ে করার সময় অনেক কিছু করার পরিকল্পনা ছিল মনের মধ্যে। কিন্তু ব্যান্ড পার্টি আনার কোনো ইচ্ছা ছিল না। তবু তাকে তা বলতে পারলাম না। কার্ডটা নিয়ে বললাম, আচ্ছা।

একটা কার্ডে ও আমার ঠিকানাও লিখে নিল।

তারপর আবার সেলাম করল আমাদের। 'গরিব জয়দীপকে ভুলবেন না।'

জয়দীপ কদাচিৎ কখনও আমার বাসায় আসত। বসত। গল্প করত, 'সাব, আপনি তো আর্টিস্ট। আমার একটা কাজ করে দেবেন?'

'কি কাজ?'

মুখ নীচু করে জবাব দিল, 'আমার সাদীর সময় সুন্দর কার্ড তৈরি করে করে দেবেন?'

'দেব।'

জয়দীপ খুব খুশি। ঐ সামান্য প্রতিশ্রুতির জন্য ও আমার আরো ভক্ত হয়ে উঠল।

পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার একটা ছোট্ট গ্রামে জয়দীপের বাড়ি। পাশের গ্রামের এক ব্যান্ড মাস্টারের মেয়েকে ভালোবাসে। দারুণ ভালোবাসে। বিয়ে করবেই। জয়দীপের মা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন ঐ ব্যান্ড মাস্টারের কাছে। রাজি হয়নি ব্যান্ড মাস্টার। বলেছে, ক্ষেত খামারি করা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে না ; বিয়ে দেবে বড় শহরের কোনো ব্যান্ড মাস্টারের সঙ্গে।

বড় শহরের ব্যান্ড মাস্টার! ফিরোজপুর, অমৃতসর, আম্বালা, লুধিয়ানার ব্যান্ড মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে দেবে?

জয়দীপ চলে এসেছে দিল্লি। ফিরোজপুর, অমৃতসর, আম্বালা, লুধিয়ানা, জলন্ধরকে পেছনে ফেলে এসেছে দিল্লি। সারা হিন্দুস্থানের রাজধানী! প্রথমেই ব্যান্ড পার্টিতে চান্স পায়নি। কুছ পরোয়া নেই! কফি হাউসে নোংরা কাপ-ডিশ তুলেছে, টেবিল সাফ করেছে, তারপর চান্স পেয়েছে ব্যান্ড পার্টিতে। রাষ্ট্রপতি ভবনের সৈন্যদের মত সোনালি রূপালি জরির লাল পোশাক পরে জয়দীপ ব্যান্ড পার্টিতে বাজনা বাজায়। আরো কিছুকাল বাজাবে! তারপর নিজের ব্যান্ড পার্টি তৈরি করবে। ব্যান্ড মাস্টার হবে। উঁচু প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ক্লারিওনেট বাজাবে! ওর ক্লারিওনেটের সুরে বেজে উঠবে আর সব বাজনা। বিয়েবাড়ির সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনবে সেই বাজনা আর চেয়ে দেখবে ব্যান্ড মাস্টারকে। জয়দীপকে।

তারপর মাকে আর একবার পাঠাবে পাশের গ্রামে।

আমি ঘরের মধ্যে ছবি আঁকতাম আর জয়দীপের কথা শুনতাম!

'জানেন সাব, যেদিন লালকেল্লার সামনে লাজপত মার্কেটে 'জয়দীপ ব্যান্ড'-এর সাইন বোর্ড ঝুলবে, তারপর দিন মাকে পাঠাব।'

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করতাম, 'তোমার বিয়েতে আমাদের নেমন্তন্ন করবে তো?'

'সত্যি যাবেন বাবুজি?'

'যাব না কেন?'

'বিবিজিকেও নিয়ে যাবেন তো?'

'গেলে দুজনেই যাব।'

'আপনারা গেলে তো গ্রামের লোক চমকে যাবে!'

'কেন?'

'কেন আবার! আমাদের মতো সাধারণ গরিবের বিয়েতে কি আপনাদের মত লেখাপড়া জানা লোক যায়?'

* * *

অনেককাল পরে দিল্লি এসেছি এশিয়া-৭২ এর জন্য। সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হই। চলে আসি কনট প্লেসের কফি হাউসে। রোজ। চুপচাপ বসে বসে কফি খেতে খেতে মনে পড়ে পুরনো দিনের কথা।

'সাব! আপনি বাঙালিবাবু আর্টিস্ট আছেন?' কফির কাপটা আমার সামনে নামিয়ে

রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা করল।

একটু অবাক হলাম। 'হ্যাঁ।'

'বহুকাল আর আপনাকে দেখি না তো?'

'আমি আর এখানে থাকি না।'

'কোথায় থাকেন?'

'কলকাতায়।'

কনট প্লেসের কফি হাউসে নিত্য প্রতিনিয়ত কত হাজার হাজার লোক আসে। তবু এই বেয়ারা যে আমাকে চিনতে পেরেছে, তার জন্য সত্যি আশ্চর্য হলাম।

'আমাকে আপনি চিনতে পারেননি, তাই না?' একটু শুকনো হেসে বেয়ারাটা প্রশ্ন করল।

চিনতে পারিনি ঠিকই কিন্তু মুখে বললাম, এবার মনে পড়েছে।

বেয়ারাটা এবার সোজাসুজি বলল, বাবুজী আমি জয়দীপ!

জয়দীপ! ব্যান্ড পার্টির জয়দীপ! ব্যান্ড মাস্টার হবার স্বপ্ন দেখত যে সে কফি হাউসের বেয়ারা হয়েছে?

'তোমার ব্যান্ড পার্টি—'

কথাটা শেষ করতে হল না। জয়দীপ বলল, 'গরিব মানুষের কপালই খারাপ হয় বাবুজী।'

আমি অবাক হয়ে জয়দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

'বাবুজী, বিবিজিকে নিয়ে এসেছেন?'

বিবিজি? মৃদুলা?

তাড়াতাড়ি একটা কাগজে আমার হোটেলের ঠিকানা লিখে ওর হাতে দিয়ে বললাম, একটু রাত করে এসো। কথা হবে।

জয়দীপ এসেছিল। বলেছিল সব কথা। দুঃখের কথা, হতাশার কথা, ব্যর্থতার কথা।...লাজপাত নগরের এক বিয়েবাড়িতে রিসেপশনে বাজাতে গিয়েছিল জয়দীপের ব্যান্ড পার্টি। প্যাণ্ডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছিল খুব সুন্দর একটা গান। হঠাৎ পাশ দিয়ে গ্রামের কুলদীপ সিংকে যেতে দেখে জয়দীপ ছুটে গেল। না গিয়ে পারল না...

জয়দীপের চোখে জল। গলার স্বরটাও কেমন পালটে গেছে। 'জানেন বাবুজী, যাকে বিয়ে করব ভেবেছিলাম, সে ঐ বাড়িতেই বৌ হয়ে এসেছিল।'

জয়দীপের কথা শুনে আমি যেন ইলেকট্রিক শক্ খেলাম। 'বল কি?'

'হ্যাঁ বাবুজী! আপনাকে কি মিথ্যে কথা বলব?'

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইলাম। তারপর জয়দীপ জিজ্ঞাসা করল, 'বিবিজি ভালো আছেন তো?'

আমারও চোখের কোণায় একবিন্দু জল এসে গেল। 'খুব বড় এক সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হবার পর ও বিলেতে চলে গেছে।'

জয়দীপ প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'বলেন কি বাবুজী?'

অনেক কষ্টে আমি মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বললাম, 'জয়দীপ, আমিও ব্যান্ড মাস্টার হতে পারলাম না।'

পরের দিন কফি হাউসে গেলাম। জয়দীপ কফি দিল, কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও পয়সা নিতে এলো না। অনেক খুঁজলাম, কিন্তু অত ভীড়ের মধ্যে কিছুতেই ওকে খুঁজে পেলাম না। কাউন্টারে পয়সা দিয়ে আমি কফি হাউস থেকে বেরিয়ে কনট প্লেসের ভীড়ে হারিয়ে গেলাম।

রবিবার

'কি ব্যাপার? মিট মিট করে হাসতে হাসতে কি দেখছ?'

'দেখছি আর ভাবছি।'

'কি দেখছ আর কি ভাবছ?'

'অনেক কিছু।'

'দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখবে আর ভাববে? কথা বলবে না?'

'বলব বলেই তো এসেছি, কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'ভাবছি তুমি বলব নাকি আপনি বলব।'

'চমৎকার!' প্রজ্জ্বল হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'আগে কি বলতে?'

'আগে তো তুমিই বলতাম, কিন্তু তুমি তো আর সেই আগের তুমি নেই।'

'কেন? আমি কি পাল্টে গেছি?' প্রজ্জ্বল সোজাসুজি মায়াবৌদির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'নাকি ভালো চাকরি করছি বলে তুমি বলতে দ্বিধা হচ্ছে?'

এবার মায়াবৌদিও চোখ তুলে তাকায়। বলে, 'তুমি হঠাৎ এত বড় হয়ে গেছ যে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক।'

'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই।'

'এখন খুব বড় হয়েছি আর আগে বুঝি খুব ছোট ছিলাম?'

'তা তো বলছি না। তবে তুমি যে এখন অনেক বড় হয়েছ, তা তো ঠিক?'

'তার জন্য তোমার সঙ্কোচ বোধ করার কি কারণ ঘটল? আমি যাই হই, তুমি তো আমার বৌদিই আছ!'

মায়াবৌদি জানত, প্রজ্জ্বল বড় হলেও পাল্টাতে পারে না। পাল্টাবে না। তবুও দ্বিধা এসেছিল। আসাটা স্বাভাবিক। ডি-জি পি অ্যান্ড টি অফিসের আপার ডিভিশন কেরানির স্ত্রীর পক্ষে একজন আই-এ-এস অফিসারের কাছে সহজ হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। সে প্রজ্জ্বল হলেও নয়।

প্রজ্জ্বলের কথায় মায়াবৌদি খুশি হয়।

মামী দুহাতে দুকাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়েই মায়াবৌদিকে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, 'কিরে মায়া, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

মায়াবৌদি কিছু বলার আগেই প্রজ্জ্বল হাসতে হাসতে বলল, 'জান মামী, মায়াবৌদি পুজোর সময় থিয়েটার করবে বলে এখন থেকেই রিহার্সাল দিচ্ছে।'

সেন্টার টেবিলে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে মামী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে?'

'আমি মামার অন্ন ধ্বংস করে ভালো চাকরি পেয়েছি বলে মায়াবৌদি আমাকে তুমি বলতে ভরসা পাচ্ছে না।' প্রজ্জ্বল মায়াবৌদির দিকে তাকিযে হাসতে হাসতে কথাগুলো বলল। .

এবার মামীও হাসে। 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে মায়া? মানা আই-এ-এস হয়েছে বলে কি আমি মামী নেই, নাকি তুই বৌদি নেই?'

মামী আর কথা না বলে রান্নাঘরে চলে গেল। মামা বাথরুমে! বেরুলেই খেতে বসবেন। আটটা চল্লিশ হয়ে গেছে। মামী চলে যেতেই প্রজ্জ্বল উঠে গিয়ে মায়াবৌদির হাত ধরে এনে পাশে বসাল।

'নাও, চা খাও।'

'খাচ্ছি।'

চা খেতে খেতে প্রজ্জ্বল জিজ্ঞাসা করল, 'বল কি ব্যাপার?'

'শুনলাম তুমি এসেছ। তাছাড়া ক'দিন থাকছ বলে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।'

'কি কথা?'

'সামনের শনিবার দিল্লিতে থাকবে?'

'শনিবার আছি, তবে রবিবার সকালেই চলে যাবার কথা।'

'এই শনিবার তো সেকেন্ড স্যাটারডে। আমরা সবাই পিকনিকে যাচ্ছি, তুমি যাবে?'

এই রামকৃষ্ণপুরমের মামার বাড়িতে ক'টা বছর থাকার সময় প্রজ্জ্বল তখন প্রত্যেকটা পিকনিকে গেছে। আনন্দ করেছে। দারুণ আনন্দ করেছে। প্রথমবার যেতে চায়নি। তখন কলকাতা থেকে ও নতুন এসেছে। পাড়ার সবার সঙ্গে পরিচয় হয়নি! ঘনিষ্ঠতা তো দূরের কথা! প্রজ্জল ভেবেছিল পিকনিকে গিয়ে চুপচাপ একলা একলা কাটাবার চাইতে বাড়িতে থাকাই ভালো, কিন্তু পারেনি। যেতে হয়েছিল। মামা-মামী এসব ব্যাপারে সবার চাইতে বেশি উৎসাহী। মামীর কাছেই পাড়ার সবাই চাঁদা জমা দিচ্ছিলেন। মামা-মামীর কথা ফেলতে পারেনি। প্রজ্জ্বল নতুন হলেও পিকনিকে গিয়েছিল।

প্রজ্জ্বলের মামা-মামী দুজনেই বড় ভালোমানুষ। মনটা বড় উদার। পোস্টাপিসে সামান্য চাকবি করেন মামা, কিন্তু তবুও প্রজ্জ্বল যখন ইসলামিক হিস্ট্রি নিয়ে এম. এ. পড়বার জন্য দিল্লি জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন নিল, তখন কিছুতেই ওকে হোস্টেলে থাকতে দিলেন না।

'তা হয় না রে মানা। আমি দিল্লিতে থাকতে তুই হোস্টেলে থাকবি, তা কখনোই হতে পারে না।'

মামী বললেন, 'আচ্ছা কয়েক মাস তো থাক। তারপর যদি তোমার অসুবিধে হয় তাহলে তখন হোস্টেলে চলে যেও।'

এরপর আর কি বলবে। হোস্টেলের জন্য ফরম্ ভর্তি করেও জমা দিল না। রামকৃষ্ণপুরমে মামার ফ্ল্যাটে থেকেই জামিয়া মিলিয়াতে পড়তে লাগল।

এ মামা কিন্তু ওর আপন মামা নয়। মা-র মাসতুতো ভাই। তবে আপন মামা না থাকায় এই মামার সঙ্গে প্রজ্জ্বলদের সম্পর্ক বরাবরই বড় নিবিড়। এই মামা যখন কলকাতার সি-টি-ওতে ছিলেন তখন প্রত্যেকবাব প্রজ্জ্বলের মা-র কাছে ভাইফোঁটা নিয়েছেন। দিল্লিতে আসার পরও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। মামা-মামী ছুটিতে কলকাতায় গেলেই দু'একদিন ওদের মানিকতলার বাড়িতে থাকেন, দলবেঁধে সবাইকে নিয়ে স্টারে থিয়েটার দেখান, আর সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পরও প্রজ্জ্বলের বাবা-মার সঙ্গে গল্প করেন।

এখানে এসে নতুন করে মামা-মামীকে ভালোবাসল প্রজ্জ্বল। রামকৃষ্ণপুরমের সেক্টর সিক্স মানেই ডাক-তার বিভাগের সাধারণ কর্মচারীদের আবাসভূমি। ছোট ছোট দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাট। তা হোক। ঐ দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাটেই মামা-মামী সারা পাড়ার সবাইকে টেনে আনেন। গোরাবাবু তো কথায় কথায় বলেন, দাশদার ধর্মশালা থাকতে রিহার্সাল দেবার জায়গা নিয়ে এত আলোচনার কি দরকার? মামী পেটে ধরেছেন একটি মেয়ে কিন্তু সারা পাড়ার সব বাচ্চাদের হাসিমুখে কোলে তুলে নেন। বিশ্বাসের ফুটফুটে দুটো বাচ্চা তো প্রায় সারাদিন মামীর কাছে থাকে। বীণাবৌদির বড় বাচ্চাটা দেড় বছর হতে না হতেই তিনি আবার বাচ্চা হবার জন্য সফদারজং হাসপাতালের তিনতলার কোণার ঘরে আশ্রয় নিলেন। বড় বাচ্চাটা তখন মামীর কাছে বেশ কাটিয়ে দিল তিন সপ্তাহ। উষাবৌদির স্বামী নতুন স্কুটার কিনলেন। রোজ অফিস থেকে ফিরে একবার বৌকে নিয়ে না বেড়াতে বেরুলে তাঁর মন ভরে না। অথচ ছেলেটা স্কুটারের আওয়াজ শুনলেই ভয়ে চীৎকার করতে শুরু করে। কিন্তু তার জন্য তাদের সান্ধ্য অভিসার বন্ধ হল না। মামী তো আছেন। দু'চারদিন বাপ্পাকে রাখার পরই মামী ওর মাকে বললেন, 'হ্যাঁরে উষা, ছেলেটাকে একটা কুমারেশ খাওয়া তো?'

প্রথম প্রথম প্রজ্জ্বল দারুণ অস্বস্তিবোধ করত। এত লোকজন বাচ্চা-কাচ্চার হৈ চৈ তো ও কোনোদিন সহ্য করেনি। কিন্তু আস্তে আস্তে ভালো লাগল। বিশ্বাসদার স্ত্রী চমৎকার ঘুগনি করতে পারেন। বিশ্বাসবৌদি সে ঘুগনি এ বাড়িতে না পাঠিয়ে নিজের স্বামীকেও দেবেন না। গোরাবাবুর মা এই দিল্লিতে এসেও সারা শীতকাল পিঠে-পায়েস না বানিয়ে শান্তি পান না। মামা-মামীর পুণ্যের জোরে প্রজ্জ্বল সারা শীতকাল পিঠে-পায়েস খেয়েছে। শনিবার-রবিবার বিকেলে চায়ের সঙ্গে সিঙাড়া পেলেই প্রজ্জ্বল বুঝত সুনীলদার স্ত্রী তত্ত্ব পাঠিয়েছেন।

এই মামা-মামীর জন্যই প্রথমবার পিকনিকে গিয়েছিল। একদল অপরিচিত মানুষের সঙ্গে গিয়েও মন ভরে গিয়েছিল প্রজ্জ্বলের। তারপর থেকে প্রত্যেকবারই গিয়েছে। মামা-মামীর তাগিদে নয়, নিজের আগ্রহেই গিয়েছে।

এই মায়াবৌদির সঙ্গে তো পিকনিকে গিয়েই ওর প্রথম আলাপ। পিকনিকের কথা শুনতেই প্রজ্জ্বলের মনে অনেক দিনের অনেক মিষ্টি ছবি ফুটে উঠল।

প্রজ্জ্বল খুশি হয়ে বলল, 'এবার কোথায় যাচ্ছ?'

'দাসনায়।'

'দাসনায় আগে পিকনিক হয়নি?'

'না।'

'সবাই যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

প্রজ্জ্বল একটু ভেবে বলল, 'কিন্তু বৌদি, আমি কি শনিবারে যেতে পারব?'

'কেন? সেকেন্ড স্যাটারডে তো সব বন্ধ।'

'তবুও আমাদের মিটিং বোধহয় চলবে।'

'যাই হোক, একটু চেষ্টা কর। তুমি গেলে সবাই খুশি হবে।'

'শুধু তোমরা কেন, আমিও খুব খুশি হব। তাছাড়া এখন তো এই সব সুযোগ পাই না।'

মায়াবৌদি চলে যাবার পর মামাও অফিস রওনা হলেন। মামী তখনও রান্নাঘরে ব্যস্ত। মামী এই একবেলাতেই দু'বেলার রান্না করেন বরাবর। প্রজ্জ্বল বাইরের ঘরে জানালার ধারে বসে দূরের কুতুবমিনার দেখতে পেয়েই ওর মনে পড়ল আগেকার কত কথা, কত স্মৃতি।

সেবার কুতুবমিনারের পিছন দিকের পাহাড়ের উপরে পিকনিক হচ্ছিল। সুনীলবাবু আর গোরাবাবু মাংস রাঁধতে ব্যস্ত। আর সবাই বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ বিশ্বাসদা বললেন, 'জয়া, দু'একটা গান শোনাও তো।' সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ জয়া, গান শোনাও।' এতদিন পর প্রজ্জ্বলের ঠিক মনে নেই, তবে বোধহয় তিন-চারটে গান গেয়েছিল! তার মধ্যে একটা রবীন্দ্রনাথের গান, বাকিগুলো বাংলা সিনেমার গান। সবাই বাহ্‌বা দিলেও প্রজ্জ্বলের ভালো লাগেনি। রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটা পুরো প্যারাগ্রাফ বাদ দিয়েছিল বলে মনে মনে বড় বিরক্ত হয়েছিল। অবাকও হয়েছিল। জয়ার পর একটি ছেলে গান শোনাল। ভাটিয়ালী বোধহয়। তবে স্পষ্ট মনে আছে মণিমালার কথা।

মাংস রাঁধতে রাঁধতে হঠাৎ গোরাবাবু এসে বললেন, 'এই মণিমালা, এবার তুই গান শোনা।'

প্রজ্জ্বল এক কোণায় বসেছিল। এতক্ষণ মণিমালাকে দেখতে পায়নি। এবার দেখল ঐ কোণায় একটা মিষ্টি মেয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'কাকু, আমাকে গাইতে বলবেন না।'

গোরাবাবু তবুও বললেন, 'কেন রে? অন্তত একটা গান তো শোনাবি।'

মামীও বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ একটা গান শোনা। কতদিন তোর গান শুনি না।'

মণিমালা গাইল। প্রজ্জ্বলের স্পষ্ট মনে আছে ও ফাল্গুনীর ''আকাশ আমার ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে'' গেয়েছিল। ঐ একটাই গান গেয়েছিল কিন্তু তাতেই প্রজ্জ্বলের মন ভরেছিল।

একটু পরে একটু ফাঁকায় মামীকে বলেছিল, 'মামী, তোমাদের ঐ জয়াকে অন্তত রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে বারণ করে দিও।'

'কেন রে?'

'পুরো একটা প্যারাগ্রাফ বাদ দিয়ে গেল।'

'তাই নাকি?'

'তবে কি!'

'মণিমালা ঠিক গেয়েছে?'

'হ্যাঁ মামী। মেয়েটি ভারি সুন্দর গেয়েছে।'

খাওয়া-দাওয়ার পর মামী আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ওদের। 'এদিকে শোন মালা।' মালা কাছে এলে বললেন, 'আমাদের ভাগ্নের সঙ্গে আলাপ নেই তো তোর?'

মণিমালা শুধু মাথা নেড়ে জানাল, না।

'আমাদের ভাগ্নে প্রজ্জ্বল। জামিয়া মিলিয়াতে ইসলামিক হিস্ট্রি নিয়ে এম. এ. পড়ছে। তারপর রিসার্চ করবে। তোর গান ওর খুব ভালো লেগেছে।'

মণিমালা লম্বা বিনুনির শেষে রবার ব্যান্ডটার মধ্যে একটা আঙুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে মাথা নীচু করে বলল, 'বোধহয় সুচিত্রা-কণিকার চাইতেও ভালো গেয়েছি, তাই না বড়মাসী?'

প্রজ্জ্বল বলেছিল, 'তা তো কেউ বলেনি। তবে সত্যি আপনি ভালো গেয়েছেন।'

মণিমালা এক মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ধন্যবাদ।'

বেশ লেগেছিল প্রজ্জ্বলের। সহজ সরল ব্যবহার। অথচ তার চারপাশে একটা সলজ্জ আবরণ। মনে হল দু'চোখ দিয়ে যা দেখল, তার চাইতে বোধহয় ওকে বেশি অনুভব করতে হয়। এ যেন ভোরের সূর্যের আলোয় কাঞ্চনজঙঘা দেখা। আনন্দ হলেও মন ভরে না। শতবার শতরূপে দেখেও আশা মেটে না। মিটতে পারে না। একেই বলে মাধুর্য? নারীর মাধুর্য? প্রজ্জ্বল মনে মনে কথা বলে।

মামা-মামীর সংসারে থেকে একদল সাধারণ মানুষের মধ্যেও কেমন যেন একটু অসাধারণত্বের স্বাদ পায় প্রজ্জ্বল। মাসের শেষে সবারই টানাটানি। তবু বড়ি দিয়ে পালঙের তরকারি পাঠিয়ে দেন মণিমালার মা! কলকাতা থেকে এক শিশি কাসুন্দি এলেও ভাগাভাগি হয় সবার মধ্যে। মাস ছয়েক পরে ছুটিতে কলকাতা যাবার আগে মামী প্রজ্জ্বলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে মানা, কলকাতা থেকে ফিরে এসে এখানে আসছিস তো?'

প্রজ্জ্বল পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, 'কেন? তুমি কি আমাকে না তাড়িয়ে শান্তি পাচ্ছ না?'

মামী হাসতে হাসতে বলেছিলেন. 'ঠিক বলেছিস। তোকে আর সহ্য করতে পারছি না।'

পরের বার তুঘলকবাদে পিকনিক করতে গিয়ে প্রজ্জ্বল আর চুপ করে কোণায় বসে থাকেনি। সুনীলবাবুর হুকুম মতো মাংসে নুন দিয়েছে, গোরাবাবুর ফরমায়েশ মতো জল টেনে এনেছে। তারপর গানের আসরে সবার সামনে জয়াকে বলেছে, 'গতবারের মতো পুরো প্যারাগ্রাফ বাদ দিয়ে গাইলে এবার আর সহ্য করছি না।'

জয়া চুপ করে থাকেনি। 'তুমি কি রবিঠাকুরের নাতজামাই যে তোমার কথামতো আমাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হবে?'

মণিমালা বলেছিল, 'মানাদাকে অমন করে চিমটি কাটিস না জয়া। জামিয়া মিলিয়াতে

ইসলামিক হিস্ট্রি নিয়ে এম. এ. পড়তে হলে রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনার্স থাকতে হয়, তা বুঝি জানিস না?'

প্রজ্জ্বল বলেছিল, 'জয়া যে রবীন্দ্রনাথের গান গায় সে রবীন্দ্রনাথ কি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার আন্ডার-সেক্রেটারী?'

জানালার ধারে বসে বসে ঐ দূরের কুতুবমিনার দেখতে দেখতে সে সব দিনের কথা মনে পড়ে প্রজ্জ্বলের। শুধু আজ নয়, কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝে মাঝেও মনে পড়ে সে-সব দিনের কথা। মাঝে মাঝে মনে হয় হঠাৎ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে আই-এ-এস পরীক্ষা না দিলেই ভালো করত। দারোগার স্যালুট না পেলেও বিশ্বাসবৌদির ঘুগনি, সুনীলবৌদির সিঙাড়া, গোরাদার মা-র পিঠে-পায়েস, মণিমালার মার বড়ির তরকারি তো পেত। তাছাড়া দুপুর বারোটার শো'তে 'কমল'-এ সিনেমা দেখে বেরুবার মুখে মণিমালার সঙ্গে তো দেখা হতে পারত!

সত্যি ভারি মজা হয়েছিল। ডঃ মাসুদের ক্লাস না হওয়ায় প্রজ্জ্বল বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ কি মনে হল! ঢুকে পড়ল 'কমল'-এ। শো শেষ হলে বাইরে বেরুতেই মণিমালার সঙ্গে দেখা। দু'জনেই চমকে উঠেছিল। তবুও প্রজ্জ্বল নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, 'আজ বুঝি অনার্স ক্লাস 'কমল-এই' হল?'

'আজ হঠাৎ এসে মনে হল ইসলামিক হিস্ট্রির ক্লাস করব। তাই এসেছিলাম।'

'বয়-ফ্রেন্ড কোথায় পালাল?'

'তোমার গার্ল-ফ্রেন্ডের সঙ্গে গেল।'

প্রজ্জ্বল হঠাৎ বলে ফেলল, 'আমার গার্ল-ফ্রেন্ড তো আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

'আঃ! কেউ শুনে ফেলবে।'

অনেকদিন এসব কথা মনে পড়েনি। মনে পড়ার সুযোগ ছিল না। নতুন জীবনের সম্মান-প্রতিপত্তির জোয়ারে পুরনো দিনের সব স্মৃতি ভেসে গিয়েছিল। অনেকদিন পর দিল্লি এসে আবার যেন টুকরো টুকরো স্মৃতির দ্বীপপুঞ্জগুলো চোখে পড়েছে। ভালো লাগছে।

'কিরে মানা, তুই কি মায়াকে কথা দিলি?' হঠাৎ মামীর কথা শুনে প্রজ্জ্বল ঘুরে বসল।

'পিকনিকে গেলে খুব মজা হবে, তাই না মামী?'

'তা তো হবেই, কিন্তু তুই কি শনিবারে যেতে পারবি?'

'সেটাই তো সন্দেহ। আজ খোঁজ করব। তবে রবিবার হলে নিশ্চয়ই যেতাম।'

'রবিবার হলে যেতে পারবি?'

'প্রোগ্রামটা একটু ওলট-পালট হয়ে গেলেও তা পারব!'

'তাহলে শনিবারের বদলে রবিবার করতে বলব?'

'কিন্তু তাতে তো সবারই মুশকিল হবে।'

'আচ্ছা আমি ওদের বলেই দেখি না কি হয়।'

মিটিং শেষ হবার পর দু'তিনজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে ফিরতে ফিরতে প্রজ্জ্বলের বেশ রাত হয়ে গেল। সামনের ঘরে ঢুকতেই দেখল পাড়ার অনেকেই বসে। গোরাবাবু, সুনীলবাবু, বিশ্বাসবাবু। আরো দু'তিনজন! মামা-মামীও। প্রজ্জ্বলকে দেখেই মামী বললেন, 'জানিস মানা, রবিবারেই পিকনিক হবে।'

'আমার জন্য অনেক ঝামেলা হল তো এদের সবার।'

গোরাবাবু বললেন, 'কি যে বল ভাগ্নে? তুমি গেলে সবাই কত খুশি হবে, তা জান?'

প্রজ্জ্বল হাসতে হাসতে মামীর পাশে বসল। 'মামী কত চাঁদা দিতে হবে?'

'তোর আবার চাঁদা কিসের?'

'তার মানে?'

'তোর চাঁদা আমি দিয়ে দিয়েছি।'

'তা হবে না মামী। বরং তোমাদের চাঁদাও আমি দেব!'

মামা বললেন, 'তুই কি পাগল হয়েছিস মানা?'

প্রজ্জ্বল হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি সাধাসিধে মানুষ বলে মামীর চালাকি ধরতে পারছ না। মামী ভাবছে আমার কাছ থেকে চাঁদা নিলে ভালো শাড়িটা আর বাগাতে পারবে না!'

মামী সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্জ্বলের পিঠে একটা চড় মেরে বললেন, 'তুই কি ভেবেছিস আমি তোর মতো ঘুষখোর আই-এ-এস?'

'কেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছ। বল কত চাঁদা দিতে হবে?'

মধ্যস্থতা করলেন গোরাবাবু। 'না বৌদি, এবার আর তোমরা চাঁদা দেবে না। ভাগ্নেই তোমাদের চাঁদা দেবে। নট ওনলি দ্যাট, তুমি নতুন শাড়ি পরে পিকনিকে যাবে।'

প্রজ্জ্বল আবার হাসে। 'জাজমেন্টে ফাঁক থেকে গেল গোরাদা।'

'কেন? কি ফাঁক থাকল?'

'আমি শাড়ি কিনে দেব ঠিকই, কিন্তু সায়া-ব্লাউজ মামী মামার গ্যাঁড়ামারা টাকা দিয়ে বানাবে।'

মামা হো হো করে হেসে উঠলেন।

রবিবার।

বাইরের ঘরের বেড-কাম-সোফায় উপুড় হয়ে শুয়ে প্রজ্জ্বল তখনও বোধহয় স্বপ্ন দেখছিল। মামী চায়ের কাপ সেন্টার টেবিলে রেখে ডাক দিলেন, 'এই মানা ওঠ! ছ'টা বাজে।'

প্রজ্জ্বল অঘোরে ঘুমুচ্ছে। উঠল না। মামী এবার ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলেন, 'মানা উঠবি না? চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!'

আস্তে আস্তে চোখ মেলল প্রজ্জ্বল। ঘুরে দেখল মামী। 'কি ব্যাপার? ডাকছ নাকি?'

'ওঠ। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, উঠছি; মামা উঠেছেন?'

'হ্যাঁ! ও বাথরুমে।'

'এত ভোরে?'

'সাতটায় বাস ছাড়বে যে!'

'ও তাই নাকি? এখন ক'টা বাজে?'

'সওয়া ছ'টা হবে।'

প্রজ্জ্বল চায়ের কাপ তুলে নিতেই মামী বললেন, 'তোর মামা বেরুলেই বাথরুমে যাবি। দেরি করিস না।'

'না।'

সাতটায় না, বাস ছাড়তে ছাড়তে প্রায় আটটা হল। প্রত্যেকবারই এমন হয়! এর চাইতে আগে হওয়া সম্ভব নয়। বাস ছাড়ার সময় সুনীলবাবু বললেন, 'রওনা হতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। মাংসটা খারাপ না হয়ে যায়।'

গোরাবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? অত রাত্রে কাটা মাংস সারা রাত বরফ দিয়ে রাখার পর কখনও খারাপ হতে পারে?'

প্রায় দু'বছর পর এতগুলো পরিচিত মানুষের মধ্যে নিজেকে পেয়ে প্রজ্জ্বল খুব খুশি।

'মাসিমা চিনতে পারছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনব না কেন?'

'বলুন তো আমি কে?'

'কে আবার। তুমি তো মানা।'

'মানিকদা কেমন আছেন?'

'ভালো। আপনার খবর ভালো তো?'

'এমনি ভালোই, তবে তখনকার মত হৈ-হুল্লোড় করার সুযোগ তো আর পাই না।'

মানিকদা হেসে বললেন, 'এখন আপনি এত বড় হয়ে গিয়েছেন যে সে-সব ফ্রীডম এনজয় করা অসম্ভব।'

প্রজ্জ্বলও হাসে। 'কিন্তু বয়স তো ছাব্বিশ। মন যে মানে না।'

কিছুতেই নিজের জায়গায় বসে থাকতে পারছে না প্রজ্জ্বল। প্রত্যেকটা সীটের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। 'আরে জয়া! কেমন আছ?'

'ভালো। তাহলে চিনতে পেরেছেন?'

'চিনতে পারব না?'

'অনেকে পারে না।'

'আমি তো অনেক না, আমি সামান্য একজন।'

জয়া হাসে। কথা বলে না।

'হাসছ যে?'

'দেখছি এত বড় অফিসার হয়েও কথাবার্তার ধরন বদলায়নি।'

'বদলালে বুঝি খুশি হতে?...আরে মায়াবৌদি! তোমাকেই খুঁজছিলাম!'

'কেন?'

'তুমি পিকনিকে যাচ্ছ অথচ চাঁদাটা তো এখনও দিলে না!'

'এমন ঘুষ খাবার হ্যাবিট হয়েছে যে পিকনিকের চাঁদা পর্যন্ত পকেটে পুরতে শুরু করেছ?'

রিং রোড দিয়ে বাস ছুটে যমুনা ব্রিজ পার হল। মামী বিশ্বাসদার ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বলছেন, 'ঐ দ্যাখ উট।'

প্রজ্জ্বলকে দেখে মামী বললেন, 'কিরে, তুই ঘুরে ঘুরেই বেড়াবি? বসবি না?'

'রোজই তো বসে বসে কাটাই।'

প্রজ্জ্বল আর একটু এগিয়ে যায়। 'কি মণিমালা এখানে লুকিয়ে রয়েছ?'

বড় বড় চোখ দুটো তুলে এক মুহূর্তের জন্য প্রজ্জ্বলকে দেখেই মণিমালা দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল। একটু হাসল। একটু যেন শুকনো হাসি। 'লুকিয়ে রয়েছি কোথায়?'

'এতদিন পর দিল্লি এলাম অথচ একবারও খোঁজখবর নিলে না?'

'আমি জানতাম না আপনি এসেছেন।'

'যাই হোক, আজ কিন্তু অনেক গান শুনব।'

'আমি আর আজকাল গান গাই না।'

'কেন?'

'ভালো লাগে না।'

'না লাগলেও শোনাতে হবে। দাসনায় পৌঁছেই ফাল্গুনীর সেই গানটা শোনাবে।'

'কোন গানটা?'

'সেই যে, "আকাশ আমার ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে"।'

মণিমালা বিস্মিত হয়। 'এখনও মনে আছে ঐ গানটার কথা?'

কখন যে হিন্দন নদী পার হয়ে হাপুরের রাস্তায় বাস প্রায় দাসনার কাছাকাছি এসে গেছে, তা অনেকেই টের পাইনি। হঠাৎ সুনীলবাবু চীৎকার করে উঠলেন, 'ব্যস! ব্যস! ব্রীজকে বাদ ডাইনা টার্ন লেনা।'

ছোট্ট একটা ব্রিজ পার হয়ে বাস ডান দিকে ঘুরল। ছোট খালের পাড় দিয়ে মাইলখানেক যাবার পর একটা গেটের সামনে বাস থামল। দু'তিনজন বাস থেকে নেমে চৌকিদারকে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের অর্ডার দেখাতেই সে গেট খুলে দিল।

ইন্সপেকশন বাংলোটা পুরনো হলেও পরিবেশটা ভারি সুন্দর। সামনে-পেছনে বিরাট লন। সামনের দিকের লনের পাশ দিয়েই ইরিগেশন ক্যানাল ধনুকের মতো বেঁকে ঘুরে গেছে। ক্যানালের জল এক জায়গায় উঁচু থেকে নীচুতে পড়ছে। অনেকটা জলপ্রপাতের মতো। পেছন দিকে লনের শেষ সীমায় দুটি কিচেন। তারপর আমবাগান।

বাস থেকে সমস্ত মালপত্র নামাবার পরই গোরাবাবু আব সুনীলবাবু একটা কিচেন দখল করে নিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইটের উনুন তৈরি হল। তারপর কাঠে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালানো হল। এক উনুনে মুগের ডাল ভাজা শুরু হল আর অন্যটায়

গরম জল চাপানো হল।

পাশের কিচেনে শুরু হল চা-জলখাবারের ব্যবস্থা। কিচেনের খানিকটা দূরে বিরাট লনের মাঝখানে বিরাট বিরাট সতরঞ্চি বিছিয়ে আড্ডা জমেছে মেয়ে পুরুষের। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমবাগানে লুকোচুরি খেলছে। প্রজ্জ্বল গোরাবাবুর পরিচালনায় ও সুনীলবাবুর প্রযোজনায় মাংস মেখে দিয়ে বাইরে গিয়ে দেখল সান্টুবাবুর ক্যারিকেচার দেখতে সবাই মত্ত। প্রজ্জ্বল দাঁড়াল না। মামা মামীর আড়ালে একটা সিগারেট খাবার জন্য ইন্সপেকশন বাংলোয় চলে গেল। সামনের বারান্দায় বিরাট ইজিচেয়ারে এক ভদ্রলোক ঘুমুচ্ছিলেন। ও বারান্দা পার হয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখল মণিমালা একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে রয়েছে।

'কি ব্যাপার? তুমি এখানে একলা একলা কি করছ?'

'কিছু না। এমনি একটু শুয়ে আছি!'

'কেন? শরীর খারাপ নাকি?'

মণিমালা মাথা নেড়ে বলল, 'ওখানে বড় বেশি হৈ-হল্লোড় হচ্ছে বলে চলে এলাম।'

প্রজ্জ্বল একটু অবাক হল। মণিমালা আগে তো এমনি ছিল না। 'আচ্ছা তুমি বিশ্রাম কর। আমি যাই।'

'চলে যাবেন কেন? চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসুন না!'

'আচ্ছা তুমি আমাকে আপনি আপনি বলে কথা বলছ কেন বল তো?'

'কোনো কারণ নেই। এমনিই বলছি।'

'আর আপনি আপনি করবে না, বুঝলে?'

মণিমালা একটু হাসল।

প্রজ্জ্বল খানিকটা দূরে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল। একটা টান দিয়ে মণিমালার দিকে চাইল। 'তুমি আমাকে ঐ গানটা শোনাবে না?'

'সত্যি আজকাল গান গাই না।

'কেন?'

মণিমালা যেন একটু ভাবে। একটুকরো মুহূর্তের জন্য। 'এমনি। ভালো লাগে না।'

'কিন্তু ঐ গানটা যে না শুনলে শান্তি পাচ্ছি না।'

'কেন? কি ব্যাপার বলুন তো?'

'আবার বলুন তো?'

মণিমালা হাসে। বোধহয় একটু জোর করে হাসল। 'আচ্ছা শুনি কি ব্যাপার।'

'কি আর ব্যাপার? তোমার ঐ গানটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল।'

'এতদিন পর্যন্ত মনে আছে?'

'আরো কি কি মনে আছে শুনবে?'

মণিমালা আবার হাসে। বোধহয় অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে ভালোই লাগে।

উত্তরের অপেক্ষা না করে প্রজ্জ্বল বলল, 'কমল'-এ সিনেমা দেখার কথা মনে আছে? তাছাড়া দোলের দিন কি কাণ্ডটাই হয়েছিল?'

বিশেষ কিছুই না। পুরনো দিনের ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা মিষ্টি স্মৃতির টুকরো। তবু

ভাবতে গিয়ে ভালো লাগল মণিমালার। বোধহয় একটু লজ্জাও পেল। মুখ নীচু করে প্রায় আপন মনে বলল, 'এখনও সে-সব মনে আছে দেখছি।'

'তোমার গানের প্রশংসা করতাম বলে জয়া কি ভীষণ হিংসা করত তোমাকে।'

'তাও মনে আছে?'

সিগারেট শেষ হতেই প্রজ্জ্বল বলল, 'গান শোনাবে কখন?'

'আজ না।'

'তবে কবে?'

'পরে।'

'পরে আবার কবে শোনাবে?'

'ঠিক শোনাব।'

'কথা দিচ্ছ?'

'সত্যি শোনাব।'

প্রজ্জ্বল এগিয়ে গিয়েও একটু পিছিয়ে এল, 'তোমার এম. এস-সি'র রেজাল্ট তো বললে না?'

মণিমালা চট করে উত্তর দিতে পারল না। একটু পরে বলল, 'মাঝে পড়াশুনা বন্ধ ছিল। এ-বছর আবার ভর্তি হয়েছি।'

'বন্ধ ছিল কেন?'

মণিমালা হাসল। 'নানা ঝামেলায়'।

'এই বয়সে আবার ঝামেলা কিসের?'

'সবার জীবন কি প্রজ্জ্বলের মতো উজ্জ্বল হয়? নাকি হতে পারে?'

'তাই নাকি?'

প্রজ্জ্বল ইন্সপেকশন বাংলো থেকে বেরিয়ে গেল। সে জানল না মণিমালা তার চলে যাবার পথের দিকে চেয়ে রইল।

ওদিকে তখন দারুণ উত্তেজনা। ডাল নেমে গেছে। মাংস চড়েছে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা শালপাতা গেলাস ধুচ্ছে। পাশের কিচেনে উঁকি দিয়ে দেখল জনতা স্টোভে মায়াবৌদি ছোট্ট কড়ায় কি যেন রাঁধছেন। প্রজ্জ্বল জিজ্ঞাসা করল, আপনি আবার কি করছেন?'

'নিরামিষ রান্না করছি ভাই।'

'ও'!

'কেন, কিছু বলবে?'

'ভাবছিলাম এক কাপ চা পেলে খুব ভালো হত।'

'তরকারিটা নামিয়ে করছি।'

মাঠের মাঝখানে মুক্তাঙ্গনে তখনও চাঞ্চল্য। জয়ার গান হয়ে গেছে। সাণ্টুবাবু এবার মূকাভিনয় দেখাচ্ছেন। আণ্ডা-বাচ্চা থেকে গোরাবাবুর ঐ বুড়ি বিধবা মা পর্যন্ত হাসছেন। বিশ্বাসের ছেলে দুটো দৌড়ে ক্যানালের দিকে যাচ্ছে দেখে মামী তাদের পিছনে ছুটেছেন।

এরই মাঝখানে কিচেন থেকে গোরাবাবু আর সুনীলবাবুর গলা শোনা যাচ্ছে। 'আঃ। আর লঙ্কা দিস'না।'

'পনেরো কিলো মাংসে ঐ লঙ্কায় কি হবে রে? আরো লাগবে।'

'তুই পাগলামি করিস না তো। শেষে বাচ্চাগুলো মুখে তুলতে পারবে না।'

এর মধ্যে সাণ্টুবাবু মূকাভিনয় বন্ধ করে পাশের এক ক্ষেতে গিয়ে আখ খেয়ে এলেন আর আসার সময় একটা ছাগল ধরে এনেছেন। 'গোরাবাবু, এটাকে বেখে দিন। যদি বাইচান্স মাংস কম পড়ে তাহলে এটাকে একটু ঝোলে ডুবিয়ে সার্ভ করতে পারবেন।'

সব চাইতে মজা হল খাওয়ার সময়। যে যেখানে পারল শালপাতা নিয়ে বসে পড়ল। যারা পরিবেশন করল তাদের কষ্ট হল ঠিকই কিন্তু আনন্দ হল অপরিসীম। সবার খাওয়া-দাওয়ার পর হাঁড়িকড়া নিয়ে খেতে বসলেন গোরাবাবু আর মামী। প্রজ্জ্বল ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘোষবৌদি একটা পান খাওয়ালেন। ঘুরতে ঘুরতে গোরাবাবুর মা-র কাছে হাজির হয়ে প্রজ্জ্বল জিজ্ঞাসা করল, 'মাসিমা আপনার খাওয়া হয়েছে?'

'আজ তো অমাবস্যা।'

'তাতে কি হল?'

'আজ তো ভাত-টাত কিছু খাই না বাবা।'

'তবে।'

'আমি, একটু ছানা আর ফল এনেছিলাম। তাতেই আমার হয়ে গেছে।'

প্রজ্জ্বল যেন শেষের কথাগুলো শুনতে পেল না। নিরামিষ রান্না কার জন্য? কাউকে কিছু বলল না কিন্তু মনের মধ্যে প্রশ্নটা বার বার উঁকি দিতে লাগল। মামা-মামীর আড়ালে সিগারেট খাবার জন্য ক্যানালের দিকে এগিয়ে যেতেই মায়া বৌদির সঙ্গে দেখা। প্রশ্নটা আর চেপে রাখতে পারল না।

'আচ্ছা বৌদি, তুমি কার জন্য নিরামিষ রান্না করছিলে?'

'মণিমালার জন্য।'

প্রজ্জ্বল চমকে উঠল, 'মণিমালার জন্য?'

'হ্যাঁ! তুমি জান না কিছু?'

'না তো।'

'ওর বিয়ে তো তুমি দেখে গিয়েছ?'

'না না, আমি তো জানি না ওর বিয়ে হয়েছে!'

'তাই বুঝি?' মায়াবৌদি একটু থেমে বললেন, 'আরে বোলো না ভাই। ছ'মাসের মধ্যে মেয়েটার সর্বনাশ হল।'

'বল কি?'

'হ্যাঁ ভাই। তুমি কিছুই জানতে না?'

'না'।

মায়াবৌদি চলে গেল। প্রজ্জ্বল সিগারেটটা হাতে নিয়ে পাথরের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ খেয়াল হতেই সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ইন্সপেকশন বাংলোয় ঢুকল। বারান্দা পার হয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়েই মণিমালার সঙ্গে

দেখা। একেবারে মুখোমুখি। প্রজ্জ্বল থমকে দাঁড়াল কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারল না। মণিমালাই আগে কথা বলল, 'কি হল? অমন করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

মুখ নীচু করে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে প্রজ্জ্বল তবুও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'কি হল? কথা বলছেন না যে?'

'আমি কিছুই জানতাম না মণিমালা।'

মণিমালা হাসল, 'জেনে আর কি হবে?'

আবার একটু নীরবতা।

'একটু হাতটা দেবে?'

'কেন?'

'দাও না।'

আঁচলটা টেনে নিয়ে মণিমালা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিতেই দু'হাতের মধ্যে ওর হাতটা ধরে বলল, 'আকাশ আমার ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে।'

তাড়াতাড়ি হাতটা টেনে নিয়ে মণিমালা বলল, 'কি পাগলামি করছেন?'

'সময় নেই মণিমালা। কথা দাও।'

'কি কথা দেব?'

'তুমি আমার আকাশ আলোয় আর গানে ভরিয়ে দেবে।'

'তাই কি হয়?'

'হয়।'

'তা হয় না।'

'হয়। নিশ্চয়ই হয়। হতেই হবে। তুমি কথা দিলেই হবে।'

'কিন্তু—'

প্রজ্জ্বল মুহূর্তের জন্য দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা তুলে বলল, 'বোধহয় তোমাকে পাব বলেই এই পিকনিকে এসেছিলাম, তাই না?'

মণিমালা দাঁড়িয়ে রইল। প্রজ্জ্বল ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

'মামী
জয়পুর ফিরে এসেও বার বার মণিমালার কথা মনে পড়ছে।
মন্দির আছে, বিগ্রহ আছে, অথচ শুধু পূজারীর অভাবে ওর
জীবন এমন ভাবে নষ্ট হতে পারে না। আমি আছি।
আমি রইলাম।

তোমাদের স্নেহের মানা।'

সুবর্ণরেখা

শেষ পর্যন্ত সেই অসম্ভবই সম্ভব হল। সঞ্জয় আর চৈতালী স্বপ্নেও ভাবেনি 'কলকাকলি'তে ময়নাকে ভর্তি করা সম্ভব হবে। কে-জি ওয়ান বা টু'তে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করার জন্য কত হাজার হাজার বাবা-মায়েরা যে ধর্না দেন, তার ঠিকঠিকানা নেই। ওখানে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করার চাইতে লটারিতে দু'পাঁচ লাখ টাকা প্রাইজ পাওয়া অনেক সহজ।

'কলকাকলি' স্কুলটি সত্যি ভালো। লেখাপড়া ছাড়াও নাচ-গান-নাটক-ডিবেট-ক্যুইজ সারা বছর ধরে চলছে। এর উপর আছে খেলাধূলার অফুরন্ত সুযোগ। ক্রিকেট-হকি-ফুটবল-বাস্কেটবল-টেনিস-ব্যাডমিন্টন ছাড়াও যোগব্যায়াম। ছোট বড় দুটি অডিটোরিয়াম। কি বিশাল লাইব্রেরি! রিডিং রুমে প্রত্যেকের আলাদা চেয়ার-টেবিল। সব চাইতে বড় কথা, একবার ভর্তি করতে পারলে বারো ক্লাস পর্যন্ত নিশ্চিত।

তবে হ্যাঁ, অসুবিধে একটাই। স্কুলে বাস নেই। তাছাড়া স্কুলটি শহরের এক প্রান্তে। শহরের মধ্যে হলে কি এই বিশাল এলাকা নিয়ে স্কুল হতে পারতো? কলকাতার স্কুল বাড়িগুলো যেন সরকারি ও সওদাগরী অফিসের ঢং'এ তৈরি। প্রাণহীন, বৈশিষ্ট্যহীন, ইট-কাঠ, লোহা-লক্কড় দিয়ে তৈরি একটা জেলখানা। যে কোনো একটা বাড়িতে কিছু ছেলেমেয়েকে কয়েক ঘণ্টা বন্দী রাখলেই কী স্কুল হয়।

সঞ্জয় আর চৈতালী শুধু খুশি না, অত্যন্ত নিশ্চিন্ত।

সঞ্জয় ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে কফি খেতে খেতে বলল, তবে চৈতি, তোমার ঝামেলা বাড়ল। আমি তো সাত সকালে বেরিয়ে যাই। ময়নাকে পৌঁছে দেওয়া, নিয়ে আসা তোমাকেই করতে হবে।

—মেয়েকে ভালো স্কুলে পড়াতে হলে এটুকু কষ্ট তো করতেই হবে।

একটু ভেজা তুলায় স্কিন লোশন মাখিয়ে আলতো করে মুখে দিতে দিতে চৈতালী আবার বলে, গিরিবালা সংসারের কাজকর্ম ঠিকঠাক করতে পারলেও ওকে দিয়ে তো মেয়েকে অত দূরে পাঠাতে পারব না।

সঞ্জয় কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলে, সে তো একশ' বার। তাছাড়া একে ওর বয়স হয়েছে, তার উপর চোখ খারাপ।

সঞ্জয়ের ফ্যাক্টরি বজবজে। আটটার আগেই ওকে ফ্যাক্টরিতে পৌঁছতে হয়। ঠিক পৌনে সাতটায় অফিসের গাড়ি আসে। তারপর গলফ্ ক্লাব আর যোধপুর পার্ক থেকে আরো দুজনকে তুলে নিয়ে সোজা বজবজ! ফ্যাক্টরির ছুটি চারটেয় কিন্তু সাড়ে পাঁচটা-ছ'টার আগে সঞ্জয় ফ্যাক্টরি থেকে বেরুতে পারে না। মোটামুটি সাতটা নাগাদ বাড়ি

ফিরে আসে।

ময়নার স্কুল সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে এগারোটা। চৈতালী ওকে পৌঁছে দিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসে না। ট্রাম-বাস পথঘাটের যা অবস্থা! ঐ সময়টুকু ও স্কুলেই কাটিয়ে দেয়!

প্রথম দিকে চৈতালী লাইব্রেরি বিল্ডিং' এর পেছন দিকে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় একটা গল্পের বই পড়েই ঐ সময়টুকু কাটিয়ে দিত। তবে এখন আর গল্পের বই নিয়ে যাবার দরকার হয় না। ওর মতো অনেক ছেলেমেয়েদেরই মায়েরা ঐ সময়টুকু স্কুলেই কাটিয়ে দেন। তাদের অনেকের সঙ্গেই এখন ওর বন্ধুত্ব। হাজার হোক সবাই প্রায় সমবয়সী। তাই রোজই বেশ আড্ডা হয়। ওদের মধ্যে একমাত্র মলিনাদিরই বয়স বেশি। প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে কিন্তু মেয়েদের আড্ডার আসরে বয়সটা কোনো ব্যাপার না। তাছাড়া ওর মতো আড্ডাবাজ ফাজিল মহিলা সত্যি সুর্লভ। রেখা হাসতে হাসতে বলে, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সবাই আমাকে ফাজিল বলতো কিন্তু তোমার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে দেখছি, আমি ফাজলামির অ-আ ক-খ'ও শিখিনি।

মলিনাদি হাসতে হাসতে বলেন, তোরা তো নেহাতই শিশু। এখন ফ্রয়েড সাহেব এলেও অনেক কিছু শিখিয়ে দিতে পারি।

সত্যিই তাই। ছেলেমেয়েদের চোখ মুখ দেখেই উনি কত কি বুঝতে পারেন। এইতো সেদিন মানসীকে দেখেই বললেন, হ্যাঁরে, কাল স্বামীর সোহাগ পেয়েছিস, তাই না?

মানসী প্রথমে স্বীকার করতে চায়নি কিন্তু মলিনাদির সঙ্গে কী ও পেরে উঠতে পারে? শেষ পর্যন্ত ঠিকই স্বীকার করেছে। আবার একদিন শীলাকে দেখেই উনি বললেন, হ্যাঁরে, কাল বরের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস?

—আমি ঝগড়া করিনি; ও ঝগড়া করেছে।

—ঐ একই ব্যাপার। মলিনাদি একটু চাপা হাসি হেসে বললেন, আমার ঠাকুমা কি বলতেন জানিস?

শীলা বিন্দুমাত্র ভাবাবেগ প্রকাশ না করে ওর দিকে তাকায়।

—ঠাকুমা বলতেন, পুরুষের রাগ বাসী হতে দিতে নেই। রাত্তিরের মধ্যেই সব ঝগড়া-ঝাটি মিটিয়ে ফেলতে হয়। এবার মলিনাদি একটু হেসে শীলাকে বলেন, হ্যাঁরে হতভাগী, রাত্তিরের ঝগড়া মিটিয়ে ফেলার মন্ত্র কি ভুলে গেছিস?

ওর কথায় শীলার মুখেও হাসি ফুটে ওঠে।

নিঃসন্দেহে 'কলকাকলি'র এই নিত্যকার আড্ডার আসরের মধ্যমণি মলিনাদি। এই আড্ডার ব্যাপারে উনি বলেন, দ্যাখ, সব সংসারেরই কিছু না কিছু ঝামেলা বা অশান্তি থাকবেই। এখানে আমরা সেসব নিয়ে একটা কথাও বলব না। এখানে আমরা শুধু প্রাণভরে আড্ডা দেব।

ইন্দ্রানী সঙ্গে সঙ্গে বলে, তোমার আড্ডা মানেই তো শুধু প্রেম আর ভালোবাসার গল্প।

—কে প্রেম করে না বা ভালোবাসে না?

ইন্দ্রানী মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলে, অন্যদের কথা বলতে পারব না, তবে আমি

কোনদিন প্রেম করিনি।

—সব পুরুষের জীবনে প্রেম না এলেও সব মেয়েই প্রেমে পড়ে। মলিনাদি মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, তোর এই সর্বনাশা রূপ দেখে যে কত ছেলে প্রেমে পড়েছে, তার তো ঠিকঠিকানা নেই।

—কেউ আমার প্রেমে পড়েনি।

—তোর রূপ দেখে আমারই তোকে জড়িয়ে শুতে ইচ্ছে করে আর...

মলিনাদির কথায় সবাই হেসে ওঠে।

এবার মলিনাদি গম্ভীর হয়ে বলেন, নে, নে, চটপট বল, কে কে তোকে জড়িয়ে ধরেছে, কে কে তোকে গাছের আড়ালে বা বাড়ির চিলেকোঠায় নিয়ে আদর-টাদর করেছে, কে কে...

—দু একজন শুধু চিঠি লিখেছিল।

—ব্যস?

—হ্যাঁ।

—ওরে বাপু, প্রেম হাঁটে না, দৌড়োয়। শুধু চিঠি লিখে তোর মতো সুন্দরীকে ছেলেরা ছেড়ে দেবে না।

সবাই ওকে সমর্থন জানায়।

সম্মিলিত আক্রমণের মুখে শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রানী পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয় কিন্তু একটি শর্তে—নামধাম বলব না, কেউ জিজ্ঞাসাও করতে পারবে না।

মলিনাদি রুলিং দেন, দ্যাখ ইন্দ্রানী, মোগলাই খানাও বিনা নুনে মুখে রোচে না।

সবার চাপে ইন্দ্রানী আস্তে আস্তে সব কথা বলে—পাশের বাড়ির শেখরদাকে বরাবরই ভালো লাগতো কিন্তু যাদবপুরে পড়ার সময় বিদেশ রায়ের সঙ্গেই আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়।...

—ঘনিষ্ঠতা মানে?

—যতটা ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব।

—তুই তো শুধু বড়লোকের মেয়ে না, একমাত্র সন্তান। তোর পক্ষে তো সব কিছুই সম্ভব ছিল।

ইন্দ্রানী চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলে, তা ঠিক ; কিন্তু নিছক ভয়ের জন্য অনেক সুযোগেরই ষোলআনা ব্যবহার করতে পারিনি।

কে যেন প্রশ্ন করল, এখন আফসোস হয় না?

হাসতে হাসতেই এলা বলল, আমার তো ভীষণ আফসোস হয়।

এক একদিন এক একজনের প্রেমের কাহিনি শুনতে শুনতেই কে-জি সেকশনের ছুটির ঘণ্টা পড়ে। ওরা যে যার ছেলেমেয়ে নিয়ে বাড়ি চলে যান।

একদিন মলিনাদি আসরের শুরুতেই ফতোয়া জারি করলেন, আজ মানসীর পালা।

মানসী এক গাল হাসি হেসে বলল, আমি আর নতুন করে কী বলব? ঐ একই ব্যাপার। একটু হাসি, একটু ইসারা। দু'চারটে চিঠিপত্রের লেনদেন।...

—আর?

—আর দুর্গাপুজোর সময় একটু এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি।

—আর?

—ঐ সুবর্ণরেখার ধারে পাশাপাশি বসে দু'চারটে মনের কথা বলা।

মলিনাদি ঠোঁট উল্টে বললেন, ব্যস। সুবর্ণরেখার ধারে গিয়েও শুধু পাশাপাশি ব‍ে থাকা! অসম্ভব।

চাপা হাসি হেসে মানসী বলল, সত্যি বলছি।

—ন্যাকামি করিস নে মানসী। যে খোকা-খুকু সবার চোখে ধুলো দিয়ে নির্জ সুবর্ণরেখার পাড়ে চলে যায়, তারা শুধু মনের কথা বলার পাত্রপাত্রী হতে পারে না

তিন-চারজন একসঙ্গে বলল, ঠিক বলেছেন।

মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে অনেক কিছু লুকিয়ে রাখে, রাখতে পারে কিন্তু মেয়ের মেয়েদের কাছে হেরে যাবেই। কেউ স্বেচ্ছায় সানন্দে নিজের জীবনের গোপনতম কাহি প্রকাশ করে, কেউ কেউ ঘটনাচক্রে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। হ্যাঁ, মানসীও স্বীকা না করে পাবে নি।—সঞ্জয় ছুটিতে জামশেদপুর এলেই মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে এম পাগলামি করত যে আমি কিছুতেই ঠেকাতে পারতাম না।

চৈতালী বলল, কনগ্রাচুলেশনস্!

রেখা জিজ্ঞেস করল, ওকে বিয়ে করলি না কেন?

—ওর মা আগেই মারা গিয়েছিলেন ; তারপর হঠাৎ ওর বাবাও মারা গেলেন ওদিকে সঞ্জয় যাদবপুর থেকে পাশ করেই গ্লাসগো চলে গেল। তাই আর যোগাযোগ রইল না।

সেদিন রাত্রে কথায় কথায় চৈতালী সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করল, তোমার আ জামশেদপুর যেতে ইচ্ছে করে না?

জামশেদপুর যেতে তেমন ইচ্ছে হয় না কিন্তু সুবর্ণরেখার কথা খুব মনে হয়

—খুব সুন্দর নদী, তাই না?

পৃথিবীতে অনেক সুন্দর নদী আছে কিন্তু যাদবপুরে পড়ার সময় ছুটিতে বাড়ি গেলে শুধু সুবর্ণরেখার ধারে চলে যেতাম। সঞ্জয় চৈতালীর দিকে তাকিয়ে বলে, ওখানে গি যে কি আনন্দ পেতাম, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

চৈতালী চুপ করে থাকে।

একটু পরে সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে, তুমি সুবর্ণরেখা দেখেছ?

—না, না, আমি কী করে দেখব?

চৈতালী কী করে বলবে, বৌদির মেজদার বিয়েতে ঘাটশিলা গিয়ে ছোড়দার মোট সাইকেল চড়ে সুবর্ণরেখার আশেপাশে চলে যেত। ঐ সুবর্ণরেখার পাড়েই তো অবিস্মরণীয় আনন্দের স্বাদ পেয়েছে। সূর্যের তির্যক রশ্মির আলোয় ঐ শাল- ফাঁকে ফাঁকে যে ইতিহাস ছড়িয়ে আছে, তা কী মুখে প্রকাশ করা যায়?

সে স্মৃতি শুধু অনুভবের, শুধু রোমন্থনের।

পাতারহাট

এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ওর সঙ্গে আলাপ হবে, তা ভাবতে পারিনি। নাম শুনতেই চমকে উঠলাম। আমি কোনোকালেই রাজনীতি করিনি, বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। তবে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় দাদা ও দাদার বন্ধুদের প্রয়োজনে ও নির্দেশে রেশন ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রিভলবার পৌঁছে দিয়েছি এখানে ওখানে। আর কংগ্রেস অফিসের কোণায় মণিমেলা কেন্দ্র চালাবার সময় কিছু সর্বত্যাগী কর্মীর সান্নিধ্যে এসে শুনেছি নানা কাহিনি, পড়েছি কিছু বই, জেনেছি বিপ্লবীদের ইতিহাস। তাই তো চমকে উঠেই প্রশ্ন করলাম, আপনিই কী সেই অনাদি ঘোষ যিনি ডুরান্ড সাহেবকে...

কথাটা শেষ করার আগেই উনি হেসে ফেললেন। বললেন, তুমিও সে কাহিনি জানো।

—জানব না?

উনি মাথা নেড়ে বললেন, সেসব কাহিনি আজকাল কেউ মনে রাখে না। মনে রাখার দরকারও নেই।

ডেরাডুন বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল কিন্তু বেশীক্ষণ কথা বলার সুযোগ হল না। কন্ডাক্টর এসে হুইসেল বাজাতেই উনি হরিদ্বারের বাসে উঠলেন। তবে ঠিকানা বিনিময় হল বাস ছাড়ার আগেই। দু'একটা চিঠির আদান-প্রদানও হল কিন্তু তারপর দু'পক্ষই নীরব।

বছর দশেক পার হয়ে গেল।

পাটনা।

জয়প্রকাশ সর্বোদয় বর্জন করে কদমকুঁয়ার বাড়িতে ফিরে এলেও আবার সংবাদপত্রের শিরোনামা। চম্পারণ সত্যাগ্রহ আর বহুকাল আগের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর বিহার আবার সর্বভারতীয় সংবাদ। সম্পাদকের নির্দেশে বিহার সফরের আগে গেছি কদমকুঁয়া। জয়প্রকাশের সঙ্গে দেখা করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সময় ওঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

—আপনি! আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি।

উনি হেসে বললেন, আমি তো মাঝে মাঝেই আসি। তুমি কবে এলে?

—কাল এসেছি।

—ক'দিন থাকবে?

—এখানে দু-তিন দিন আছি। তারপর কয়েকটা জেলা ঘুরব।

—এখানে কোথায় উঠেছ?

—হোটেল পাটলিপুত্রে।

—ঠিক আছে যোগাযোগ করব।

আর কথা হল না। অনাদিবাবু উপরে উঠে গেলেন। আমি বেরিয়ে এলাম।

বিহার সরকারের দু'চারজন মন্ত্রী ও পদস্থ অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য যখন হোটেলে ফিরলাম, তখন দুটো বেজে গেছে। রিসেপসন কাউন্টারে ঘরের চাবি নিতে গিয়েই একটা চিরকুট পেলাম—তোমার সঙ্গে গল্প করার জন্য সন্ধ্যার পর আসব। তুমি সাতটা সাড়ে-সাতটার মধ্যে ফিরে এলে ভালো হয়।—অনাদিদা।

রিসেপসনের সামনে দাঁড়িয়েই দু-তিনবার পড়লাম। লিফট্-এর মধ্যে, ঘরে বসে লাঞ্চ খেতে খেতে মনে পড়ল, এই পাটনা শহরেই এই রকম একটা ছোট্ট চিরকুটের জন্যই অনাদিদা ধরা পড়েছিলেন।

গ্রামের অন্যান্য সবার মত অনাদিও লেখাপড়া শুরু করল ন্যায়রত্নের পাঠশালায়। পাঠশালার গুরুমশাই ন্যায়রত্ন না ; ওর বাবা ছিলেন ন্যায়রত্ন। গুরুমশায়ের বিদ্যার দৌড় ব্যাকরণের মধ্যে। তা হোক। গ্রামের সবাই বলত, ন্যায়রত্নের পাঠশালা। ন্যায়রত্নের পাঠশালা শেষ করে কেউ চলে যেত সদর শহরে ; কেউ বা আত্মীয়স্বজনের আশ্রয়ে অন্যত্র কোথাও। বরিশালের গ্রামের ছেলে অনাদি পিসীমার সঙ্গে চলে এল যশোর। ভর্তি হল সম্মিলনী স্কুলে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অনাদির নাম ছড়িয়ে পড়ল স্কুলের সব শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে। কারণ ছিল। অনাদি শুধু ভালো ছাত্র না, ভালো আবৃত্তি করে। সর্বোপরি কারণ ছিল, ওর মুখের হাসি আর মধুর স্বভাব।

ক্লাশ এইট-নাইনে যখন পড়ে তখন অনাদির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। অংকে তত ভালো না হলেও আর সব বিষয়ে অনাদির সঙ্গে কেউ পেরে ওঠে না। বাংলা লিখত চমৎকার। স্কুলের ম্যাগাজিনে যে ছাত্রের লেখা প্রতিবার ছাপা হত, তার নাম অনাদি ঘোষ। ঐ অল্প বয়সেই ওর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হতেন সবাই। চারিত্রিক মাধুর্যের জন্য সব ছাত্র ভিড় করতে আশেপাশে।

স্কুলের জনপ্রিয়তার ঢেউ পৌঁছেছে শহরের পাড়ায়-পাড়ায়, ঘরে-ঘরে। শহরের বহুজনের সঙ্গেই অনাদির পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা।

গরমের ছুটির দিন দশেক আগে হঠাৎ একদিন স্কুলে আসার পথে লোন অফিসের সামনে অজয়দার সঙ্গে দেখা।

—কিরে অনাদি, কেমন আছিস?

—ভালো। অনাদি হেসে জবাব দেয়। জিজ্ঞেস করে, আপনি কেমন আছেন অজয়দা?

অজয়দা হেসে বলেন, শারীরিক ভালোই আছি কিন্তু মানসিক অবস্থা ভালো না।

উৎকণ্ঠিত অনাদি জানতে চায়, কেন? বাড়িতে কেউ অসুস্থ নাকি?

অজয়দা আবার হাসেন। বলেন, এ দেশে যার বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, সে কী সুখে থাকতে পারে?

কথাটা কেমন বেসুরো লাগল অনাদির। একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়।

অজয়দা আর হাসেন না। হঠাৎ ওঁর উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানা কেমন ম্লান হয়ে যায়। দুঃশ্চিন্তার রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে কপালে। বলেন, কাল রাত্তিরে পুলিশ নিত্যদাকে কোতোয়ালীতে নিয়ে গেলে ডুরান্ড সাহেব গুণে গুণে ওকে একশোবার লাথি মেরেছে

শুনে অনাদির খারাপ লাগে। বলে, তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কারুর কাছে তো শুনলাম না।

—শুনতে চাইলেই শুনতে পাবি।

ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই স্কুলের ফার্স্ট বেল শোন যায়। অজয়দা বললেন, স্কুলে যা। একদিন আসিস।

—নিশ্চয়ই আসব।

স্কুলে বসেও অনাদি সারাদিন ঐ কথাই ভাবে। ইস! নিত্যদার মত সর্বজনশ্রদ্ধেয় মানুষকে ডুরান্ড সাহেব একশোবার লাথি মেরেছে?

গত বছরই ডুরান্ড সাহেব স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় এসেছিল। অনাদি ওকে ঐ একবারই দেখেছে। দেখলেই বোঝা যায়, লোকটা কত দাম্ভিক আর বদমেজাজী। অনাদি ওর ইংরেজি বক্তৃতা ঠিক বুঝতে পারেনি কিন্তু হেড মাস্টারমশাইয়ের তর্জমা শুনেই বুঝেছে, লোকটা ভারতবর্ষের মানুষকে কত ঘেন্না, কত তুচ্ছজ্ঞান করে।

সেদিন বিকেলেই অনাদি অজয়দার ক্লাবে হাজির। পরদিনই দু'আনা দিয়ে জগজ্জননী ক্লাবের সদস্য। গরমের ছুটিতে পড়াশুনার অছিলায় বরিশাল যাওয়া বাতিল করে ব্যায়াম চর্চার আড়ালে অনাদি আরো কত কি চর্চা করে। কত কি পড়ে, শোনে। জানতে পারে কত অজানা কাহিনি। বছর খানেক পরে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। নবজন্ম হল অনাদির।

তারপরের বছর খানেক অন্ধকার। অনাদি স্কুলে যায়। পড়াশুনাও করে, কিন্তু আর কি করে সে খবর বাইরের দুনিয়ার কেউ জানতে পারে না।

সেকেন্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করল অনাদি। নিত্যদার নির্দেশে অনাদি যশোর ছেড়ে চলে গেলে বরিশাল। ভর্তি হল ব্রজমোহন কলেজে।

পুজোর ছুটির ঠিক দুদিন আগে হঠাৎ এক দূত মারফত স্বয়ং ত্রৈলোক্য মহারাজ খবর পাঠালেন, ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে যশোর পিসীমার বাড়ি বেড়াতে যাও। ইঙ্গিত বোঝে অনাদি।

ছুটি হবার পরদিনই স্টীমারে ওঠে অনাদি। প্রথমে খুলনা। তারপর যশোর। পিসীমা খুশি, পিসেমশাই খুশি। খুশি ভাই-বোনেরাও।

গল্পগুজব করে শুতে শুতে অনেক রাত হল। মশারি ঠিক করতে এসে জয়া বলল, রাঙাদা, ঘুমিও না। একটা থেকে সওয়া একটার মধ্যে সুনীলদা আসবে। আমি চলে গেলে দরজায় খিল দিও না। আমিও ঘুমোব না। দরকার হলে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার মাথায় হাত দিলেই উঠে পড়ব।

হ্যাঁ, ঠিক সওয়া একটায় সুনীল এল। মশারির মধ্যে বসে অনেকক্ষণ অনেক কথা বলল ফিসফিস করে।

তারপর?

তারপর যেমন চুপি চুপি এসেছিল, ঠিক তেমনি চুপি চুপি চলে গেল সুনীল। রেখে গেল ছোট একটা বালিশ।

বিছানা ছেড়ে উঠল অনাদিও। ঘর থেকে বেরুল পা টিপে টিপে। বারান্দা পার হয়ে

পিছন দিক দিয়ে ঘুরে বোনেদের ঘরের জানলার সামনে এসে একটু দাঁড়াল। একবার ভালো করে এদিক-ওদিক দেখে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে জয়ার মাথায় একটা টোকা দিতেই ও উঠে বসল। অনাদির মতই পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর কোনো কথা না বলে ঐ অন্ধকার রাত্রে অনাদির হাত ধরে নিয়ে এল উত্তর দিকের বাগানে। চাঁপা গাছের নীচে গর্ত করাই ছিল। অনাদির হাত থেকে ছোট্ট বালিশটা নিয়ে ফেলে দিল ঐ গর্তের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে মিলে মাটি চাপা দিয়ে কিছু ঘাস-পাতা ছড়িয়ে দিল। ওরা দুজনে ফিরে গেল নিজের নিজের ঘরে।

ভোরবেলায় দুজনেরই ঘুম ভাঙল হৈ-চৈ শুনে। পুলিশ। অনাদির পিশেমশাই, এ বাড়ির গৃহকর্তা চন্দ্রবাবু শহরের নামকরা উকিল। দারোগাবাবু তাঁর সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করলেন না। বললেন, আই বি'র রিপোর্ট এই বাড়িতে সুনীল সরকার লুকিয়ে আছে। তাই আপনাদের একটু কষ্ট দেব।

চন্দ্রবাবু বললেন, কাল আমার শালার ছেলে অনাদি এসেছে। তাছাড়া আর কেউ তো...

পুণ্য কাজে দারোগাবাবুর সহযাত্রী আই বি'র কালাচরণবাবু বললেন, সে তো পাড়ার সবাই জানে।

যাই হোক সারা বাড়ি খানাতল্লাসী করে ওঁরা শুধু সুনীলকেই খুঁজলেন না, আরো কিছু খুঁজলেন তন্ন তন্ন করে। বাড়ির মেয়ে-পুরুষ ঝি-চাকর সবাইকে জেরা করলেন, কেউ কিছু রাখতে দিয়েছে কিনা।

সবাই বলল, না, কেউ কিছু রেখে যায় নি। জয়া বলল, শুধু মিত্তির কাকার মেয়ে ছায়া এসে এক কৌটো নাড়ু দিয়ে গেছে রাঙ্গাদার জন্য।

দারোগাবাবু আর কালাচরণবাবু প্রায় একসঙ্গেই চিৎকার করে উঠলেন, কোথায় সে কৌটা?

জয়া না, জয়ার মা না, ঝি এনে দিল সে কৌটো। হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ওঁরা দুজনেই। দুজনেই হতাশ।

জয়া হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কী খুঁজছেন?

কালাচরণবাবু রেগে বললেন, তাতে তোমার কী দরকার?

ঘণ্টা তিনেক ধরে খানাতল্লাসী করেও ও'রা কিছুই পেলেন না। যাবার সময় দারোগাবাবু বলে গেলেন, ডুরান্ড সাহেবের হুকুম মতো এসেছিলাম। কিছু মনে করবেন না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অনাদি আর জয়া।

কিছুক্ষণ পরেই অনাদি সাইকেলে চক্কর দিয়ে আসে সারা লোন অফিস পাড়া। ক্রীং ক্রীং ঘণ্টা বাজিয়ে অজয়দাকে জানিয়ে দেয়, সব ঠিক আছে। জলখাবার দিতে এসে জয়া অনাদিকে বলল, রাঙ্গাদা, খুব সাবধান। সুনীলদা যে আসবে, তা পর্যন্ত ওরা জেনে গেছে।

—হ্যাঁ, তাইতো দেখছি।

—তোমাদের মধ্যে কেউ কিছু...।

—উচিত নয় তবে...। কথাটা শেষ না করেই অনাদি বলে, একটা কাজ করবি?

—বল, কী করতে হবে?

—একটা চিঠি দিচ্ছি। ওটা সুভাষের ঠাকুমাকে দিয়ে বলবি, কালীবাড়ির আরতির সময়

জবাব নিবি।

সন্ধ্যার পর কালীবাড়ির আরতির সময় সুভাষের ঠাকুমার পাশে হাত জোড় করে বসল জয়া। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আরতি চলল। আরতি শেষ। এবার চোখ বুজে প্রণামের সময়। ব্যাস। ঐ সময় ছোট্ট একটা কাগজ এসে গেল জয়ার হাতে।

সকালবেলায় জয়াদের বাড়ি খানাতল্লাসী হবার খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিত্যদা সমস্ত পরিকল্পনাটা অদল-বদল করে জানিয়ে দেন অজয়দাকে। নতুন পরিকল্পনার সব কিছু খবর জয়া এনে দিল অনাদিকে।

দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে। সারা শহরে আনন্দের বন্যা। ঢাক-ঢোল বাজছে চারদিকে। নতুন জামাকাপড় পরে ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে পূজা দেখতে। ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে অফিস-আদালতের অনেকেই গ্রামের বাড়ি গেছেন। ছুটি ডুরাস্ত সাহেবেরও। অফিস না গেলেও বাংলোয় বসে কাজ করেন। পুলিশ অফিসাররা আসেন নানা খবর নিয়ে। ফিরে যান সাহেবের নির্দেশ নিয়ে। তবে সবাই জানে ছুটির দিনে সহেব-মেমসাহেব ঘুমিয়ে থাকেন অনেক বেলা পর্যন্ত। খুব জরুরি কারণ না হলে সাহেব কখনই ভোরে ওঠেন না।

সেদিন মহাষ্টমী।

তখনও অন্ধকার কাটেনি। উষার আলো দেখা দেবে কিছুক্ষণ পর। সূর্য উঠবে আরো পরে। ডুরাস্ত সাহেবের বাংলোর গেটের সামনে কিছু কাগজপত্র নিয়ে দুই দারোগাবাবু হাজির। পাহারাদার কনস্টেবল হেসে বলল, এত ভোরে?

একজন দারোগাবাবু হেসে বললেন, কী করব? বড়কর্তারা যেমন হুকুম দেবেন, আমাদের তো তাই করতে হবে।

কনস্টেবল বলল, আজ তো ছুটি। সাহেব তো উঠবেন অনেক বেলায়।

আমরা বসে থাকব। সাহেব উঠলেই কাগজ সই করিয়ে ছুটব এস পি সাহেবের কাছে।

দারোগাবাবুরা ভিতরে ঢোকেন। কনস্টেবল গেট বন্ধ করে দেয়।

বিরাট এলাকার মাঝখানে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দোতলা বাংলো। চারদিকের লনেই ফুটবল খেলা যায়। গাছপালা দিয়ে ঘেরা সমস্ত এলাকা। সামনের লন পেরিয়ে বাংলোর বারান্দায় পৌঁছতেই দারোগাবাবুদের মিনিট পাঁচেক লাগল। সেখানে খান কয়েক চেয়ার। দারোগাবাবুরা সেখানেই বসলেন। ভালো করে দেখেন চারদিক। না কেউ নেই। ছুটির দিনে এত ভোরে কোনো অর্ডালি-বেয়ারা আসবে না। চাকর-বাকর, খানসামারাও তাদের কোয়ার্টারে।

দারোগাবাবুদের হাতে বেশি সময় নেই। ওঁর দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। পায়চারি করার অছিলায় একবার ঘুরে দেখে নিলেন চারদিকের বারান্দা, সিঁড়ি। একজন সতর্ক পদক্ষেপ ফেলে উপরে উঠলেন। দেখলেন উপরের বারান্দা। না, কেউ নেই। ইশারা করলেন সহকর্মিকে। তিনিও তর তর করে উপরে উঠলেন। ডানদিকে এগিয়ে দেখলেন, ড্রইংরুমের মেঝেয় একজন ঘুমুচ্ছে। দরজা বন্ধই ছিল। একজন আলতো করে সামনের দিকে শিকল তুলে দিলেন! আর একটু এগিয়েই সাহেবের শোবার ঘর। হ্যাঁ, পশ্চিমের জানালা খোলা আছে। মেমসাহেবও নেই। কলকাতায় গেছেন গতকালই। সাহেব বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন

প্রায় অর্ধউলঙ্গ হয়ে।

ইশারা বিনিময় হয় দুই দারোগার মধ্যে। একজন রইলেন সিঁড়িতে, অন্যজন সাহেবের শোবার ঘরের খোলা পশ্চিমের জানালার পাশে। দুজনের হাতেই রিভলবার। রেডি সিঁড়িব দারোগাবাবু বাঁ হাত তুলে ইশারা করতেই—

দুম! দুম! দুম!

ডুরান্ড সাহেবের একটা বিকট আর্তনাদ। দুই দারোগাবাবুর চিৎকার, কে? কে? ছুটে আসে গেটের কনস্টেবল। ঘুম ভেঙে যায় দু-একজন অর্ডালী-বেয়ারার। দারোগাবাবু রিভলবার হাতে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বলেন, ধরো, ধরো, ধরো। কনস্টেবল আর অর্ডালি-বেযারাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলেন, তোমরা পিছন দিকে দেখো, ধরো শালাদের

বিভ্রান্ত কর্মচারীরা এদিকে-ওদিকে দৌড়াদৌড়ি করে। ছুটে যান দারোগা বাবুরাও ছুটতে ছুটতে কত দূরে চলে যান ওঁরা।

ডুরান্ড সাহেবের বাংলোয় পুলিশের কর্তারা পৌঁছবার আগেই অজয়দা আর অনাদিদা জগজ্জননী ক্লাবে ব্যায়ামচর্চা শুরু করে দেন। ওদিকে কনস্টেবল আর অর্ডালি-বেয়ারাদের বক্তব্য শুনেই পুলিশবাহিনী ছুটে যায় ঝিনেদার রাস্তায়।

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টায় যশোর আর ঝিনেদার পুলিশ জন পঞ্চাশেককে গ্রেপ্তার করল অজয়দাকে ধরল দুদিন পর কিন্তু সারাদিন জেরা করে ছেড়ে দিল। বিজয়া দশমীর দুদিন পর অনাদিদা যশোর ছাড়লেন। এলেন কলকাতা। পূজার ছুটি শেষ হবার ঠিক মুখোমুখি ওঁকে বলা হল, চলে যাও বরিশালের পাতারহাট। ওখানকার হিন্দু একাডেমীর হেডমাস্টারমশাইকে বলা আছে। কোনো চিন্তা নেই। তবে হ্যাঁ, ওখানে তুমি অনাদি ঘোষ থাকবে না , হবে বিমল চৌধুরী।

বরিশাল জেলার ঘোলা মহকুমায় মেঘনা নদীর পাড়ে পাতারহাট। সুপারী আর লংকার এত বড় গঞ্জ বোধহয় আর কোথাও নেই। বিমল চৌধুরী পৌঁছতেই হেডমাস্টারমশাই বললেন, হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। তুমি এইট, নাইন, টেন-এ বাংলা পড়াবে। লাইব্রেরির পাশের ঘরেই তুমি থাকবে। কোনো অসুবিধা হবে না।

না, বিমল চৌধুরীর কোনো অসুবিধে হয় নি বরং আনন্দেই কেটেছে দিনগুলো। কো এডুকেশন্যাল স্কুল। হাজার হোক গ্রামের স্কুল। ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স একটু বেশি। নতুন মাস্টারমশাইকে ওরা সবাই ভালোবাসে। প্রায়ই ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি নেমন্তন্ন জুটে যায় যেদিন জোটে না, সেদিনও নিজেকে রান্না করতে হয় না। কোনো না কোনো ছাত্রী খুশি হয়েই রান্না করে দেয় ঝোল-ভাত।

মাস চারেক পরেই একদিন হেডমাস্টারমশাই বললেন, পালাও। আজই রাত্রে পালাও

প্রথমে কলকাতা, সেখান থেকে হাজারিবাগ। তারপর পাটনা। এই পাটনায় আসার দি তিনেক পরেই অনাদিদা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন! একটা বাচ্চা ছেলের হাতে একটা চিরকু দিয়ে পাঠান যতীন ডাক্তারের ডিসপেনসারীতে। উনি তখন রুগী দেখতে গিয়েছিলেন ব টেবিলের উপব চিরকুটটা রেখে চলে আসে ছেলেটি। ওখানেই বসে ছিলেন বিহার পুলিশে এক বাঙালী দারোগাবাবু। ব্যস। পরের দিন ভোরেই অনাদিদাকে ধরল।

সন্ধ্যের পর অনাদিদা হোটেলে এলে বললাম, আপনার চিরকুটটা পেয়েই সবকিছু মনে পড়ল।

অনাদিদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত সব জানলে কেমন করে?

ঐ পাতারহাট হিন্দু একাডেমীর হেডমাস্টারমশায়ের ছেলে আমার বন্ধু। ওদের বাড়িতে সবকিছু শুনেছি।

পাতারহাটের নাম শুনেই উনি একটু আনমনা হয়ে গেলেন। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন পাতারহাটের দিনগুলো সত্যি আনন্দে কেটেছে।

পাটনায় রোজ আমাদের দেখা হয়, গল্প হয়। ঐ দু-তিন দিনের মধ্যেই আমরা এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম যে অনাদিদাও আমার সঙ্গে বিহার ঘুরতে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে হাজারিবাগ, রাঁচি, জামসেদপুর ঘুরে আবার পাটনা। তারপর সমস্তিপুব আর দ্বারভাঙ্গা। সব শেষে গয়া এসে আবিষ্কার করলাম আমরা বন্ধু হয়ে গেছি।

—আচ্ছা অনাদিদা, একটা কথা বলবে?

অনাদিদা হেসে বললেন, তুই যা জানতে চাস, আমি তাই বলব। যেসব কথা কোনোদিন কাউকে বলিনি সেসব কথাও তো তোকে বলেছি।

—দেখো অনাদিদা, তুমি বিখ্যাত বিপ্লবী। তোমার ত্যাগ, তোমার মহত্বের তুলনা হয় না। দেশ স্বাধীন করার জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেছ।...

—ওসব কথা ছেড়ে দে। তুই কী জানতে চাস, তাই বল।

আমি হেসে বললাম, অনাদিদা তুমি তো রক্ত-মাংসের মানুষ। তুমি কী কোনোদিন কাউকে ভালোবাসনি? কোনো মেয়ে কি তোমার জীবনে আসেনি?

সর্বত্যাগী বিপ্লবী অনাদিদা খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ভালোবেসেছি বৈকি।

—কাকে?

—অশ্রুকে। অনাদিদা একটু থামেন। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের চূড়া ছাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি চলে যায় বহুদূরের নীল আকাশে কোলে। বোধহয় রোমন্থন করেন ফেলে আসা স্মৃতি। স্বপ্নভরা দিনগুলির টুকরো টুকরো ঘটনা, কাহিনি।

অনাদিদা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকেন জানালার ধারে। অনেকক্ষণ। আমি একটু অপ্রস্তুত হই। লজ্জা পাই। আস্তে আস্তে উঠে যাই। ওর পাশে দাঁড়াই। ওর পিঠে হাত দিয়ে বলি, চলুন, একটু ঘুরে আসি।

অনাদিদা ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু হাসেন। চোখে জল নেই কিন্তু ছল-ছল করছে। আষাঢ়-শ্রাবণের ঘন কালো মেঘ। যে কোনো মুহূর্তে শুরু হতে পারে বর্ষণ। উনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, না না, বেরুব না। আয়, তোকে অশ্রুর কথা বলি।...

ঘণ্টা বাজতেই অনাদিদা ক্লাশ নাইন থেকে বেরিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে দু-চারজন অনুরাগী ছাত্র। ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বারান্দা দিয়ে এগুতে গিয়ে থমকে দাঁড়ান। ক্লাশ টেনের দরজায় দাঁড়িয়ে অশ্রু কাঁদছে। অনাদিদা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান। জিজ্ঞেস

করেন, কী হল অশ্রু, কাঁদছে কেন?

অশ্রু জবাব দিতে পারে না। জবাব দেয় ওরই এক বান্ধবী। অংক পারেনি বলে সীতানাথ স্যার ওকে খুব বকেছেন।

অনাদিদা হেসে বলেন, আচ্ছা পাগল মেয়ে! এর জন্য কেউ কাঁদে? তুমি স্কুলের পর আমার কাছে এসো ; আমি তোমাকে অংক বুঝিয়ে দেব।

অংক কোনোকালেই অনাদিদার প্রিয় বিষয় নয়। তবে ছাত্র তো ভালো। তার উপর আছে নিষ্ঠা। চেষ্টা করলে শুধু অংক কেন, ক্লাশ নাইন-টেনের ছাত্রদের ফিজিক্স-কেমিস্ট্রীও পড়াতে পারেন। প্রথমে একটু অসুবিধে হলেও শেষ পর্যন্ত অশ্রুকে অংক বুঝিয়ে দিতে পারলেন অনাদিদা। তারপর বললেন, তুমি রোজ ছুটির পর আমার কাছে চলে এসো। আমি তোমাকে অংক বুঝিয়ে দেব। অংকের জন্য তোমাকে আর কোনোদিন চোখের জল ফেলতে হবে না।

অশ্রু মহা খুশি। হাসতে হাসতে বাড়ি যায়।

পরের দিন স্কুল ছুটির পর আবার অশ্রু আসে কিন্তু অনাদিদার ঘরে ঢুকতে বোধহয় লজ্জা পায়। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে, অনাদিদা সঞ্চয়িতার পাতা ওল্টাচ্ছেন। তারপর হঠাৎ আপন মনে আবৃত্তি করেন—

সহস্র দিনের মাঝে
আজিকার এই দিনখানি
হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন।
তুচ্ছতার বেড়া হতে
মুক্তি তারে কে দিয়েছে আনি,
প্রত্যহের ছিঁড়েছে বন্ধন।
প্রাণ-দেবতার হাতে
জয়টিকা পরেছে সে ভালে,
সূর্যতারকার সাথে
স্থান সে পেয়েছে সমকালে—
সৃষ্টির প্রথম বাণী
যে প্রত্যাশা আকাশে জাগালে
তাই এল করিয়া বহন।

শুনে মুগ্ধ হয় অশ্রু। হঠাৎ অনাদিদার চোখ পড়ে—আরে! তুমি দাঁড়িয়ে কেন? এসো. এসো।

সারাদিন স্কুল করেও ক্লান্তি অবসাদের ছাপ থাকলেও ঢাকা পড়ে গেছে তার খুশির স্পর্শে। অনাদিদার এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেন না। পড়াতে শুরু করেন সঙ্গে সঙ্গে। পড়ার শেষে বলেন, আমি তো স্কুলের মধ্যেই সারাদিন থাকি। যখনই দরকার হবে চলে এসো। তাছাড়া ইচ্ছে করলে তুমি সব বিষয়ই আমার কাছে পড়তে পারো।

অশ্রু লজ্জায় খুশিতে কথা বলতে পারে না। মুখ নীচু করে চলে যায়।

ক'টা দিন কেটে গেল।

সেদিন স্কুল ছুটির পর অনাদিদা ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ান। এত পরিপাটি করে কে গোছাল সারা ঘর? মাসখানেক ধরে বিছানায় যে চাদর পাতা ছিল, তা নেই : বিছানায় ধবধবে কাচা চাদর। ঘরের মেঝেয় একটাও সিগারেটের টুকরো নেই ; নেই ছেঁড়া কাগজপত্র। বইপত্র সুন্দর করে সাজান। ঘরের কোণার অস্থায়ী রান্না ঘরটিও সুন্দর করে গোছান। কে গোছাল? লাইব্রেরির বিনোদ? কিন্তু....

অশ্রু এল। সঙ্গে শুধু বইখাতা না ; একটা এ্যাসট্রেও। এ্যাসট্রে টেবিলের ওপর রেখে বলল, স্যার এবার থেকে সিগারেটের ছাই-টাই এর মধ্যেই ফেলবেন। অনাদিদা অবাক। প্রশ্ন করেন, তুমিই কি আমার ঘরদোর গুছিয়েছ?

—কেন স্যার? কিছু ভুল করেছি?

অনাদিদা হেসে ওঠেন। বলেন, কিছু ভুল করো নি কিন্তু কি দরকার ছিল এত পরিশ্রম করার?

—এতে আবার পরিশ্রম কী? অশ্রু একটু থেমে বলে, আপনি ভাবভোলা মানুষ। সারাদিন পড়াশুনা নিয়েই থাকেন। আপনার ঘরদোর তো আমাদেরই ঠিকঠাক করে রাখা উচিত।

ওর কথায় উনি খুশি হন। কিন্তু বলেন, হাতের কাছে কাগজ-কলম আর খানকতক বইপত্তর থাকলে আমি শ্মশানঘাটেও মহানন্দে থাকতে পারি।

আরো ক'টা দিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে অশ্রুর বাবা নিজে এসে অনাদিদাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, বাড়িতে নেমতন্ন করেও খাইয়েছেন দু-দিন। স্কুলের মাস্টারমশাইরা, গ্রামের অন্যান্যরাও মাঝে মাঝে ওঁকে বাড়িতে নিয়ে খাওয়ান কিন্তু যেদিন ওঁকে নিজে রান্না করতে হয়, সেদিনই উনি চোখে সরষে ফুল দেখেন। অশ্রু তা বুঝতে পেরেছে। তাই সে মাঝে মাঝে নিজেই এগিয়ে আসে। অনাদিদার ওজর আপত্তি অগ্রাহ্য করেই ঝোল-ভাত রেঁধে দেয়।

দিন এগিয়ে চলে। মেঘনার পাড়ে পাতারহাটের গঞ্জে এসে ভীড় করে কত দূর দেশের পালতোলা নৌকা। সওদা বোঝাই করে চলে যায় মেঘনা-পদ্মা পেরিয়ে জানা-অজানা, শহরে-নগরে, গ্রামে-গঞ্জে। শরৎ ফুরিয়ে যায়। হৈমন্তিকের গন্ধ আকাশে-বাতাসে। মাঠের আমন ধানে দোলা দেয়।

—শোনো অশ্রু, শুধু স্কুলের পড়াশুনা করলেই হবে না। আরো অনেক কিছু পড়তে হবে।

কনুই-এ ভর দিয়ে হাতের ওপর মুখ রেখে অশ্রু মুগ্ধ হয়ে অনাদিদার কথা শোনে।

অনাদিদা বলেন, দেশে কত কি ঘটছে কিন্তু তোমরা জানতে পারো না, সেসব তোমাকে জানতে হবে।

অনাদিদা ওকে কত বই দেন। অশ্রু পড়ে। রোজ। নিয়মিত।

আর একটা কথা অশ্রু।...

—বলুন স্যার।

—রবীন্দ্রনাথকে খুব ভালো করে পড়তে হবে। পড়তে পড়তে মুখস্থ করতে হবে ওর কবিতা।

এই মাস দেড়েকের মধ্যেই অশ্রু কত বদলে যায়। ওর বাবা-মা খুশি, খুশি শিক্ষকরাও।

সেদিন কি কারণে যেন ফার্স্ট পিরিয়ডের পরই স্কুল ছুটি হয়ে গেল। এক মিনিটে সারা

স্কুলবাড়ি ফাঁকা। টিচার্স কমনরুমে অনাদিদা কয়েকজন শিক্ষকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। একটু পরে ওরাও চলে গেলেন। অনাদিদা আস্তে আস্তে ওঁর ঘরে এলেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই উনি অবাক। কে? অশ্রু? তুমি কাঁদছ? কী হয়েছে তোমার?

অশ্রু কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। দু'চোখ দিয়ে আরো জল গড়িয়ে পড়ে।

অনাদিদা একটু এগিয়ে যান। ওর মাথায় হাত দিয়ে বলেন, বলো অশ্রু, কী হয়েছে তোমার? কেউ বকেছে? কেউ কিছু বলেছে?

অশ্রু তখনও কাঁদে।

এবার অনাদিদার অভিমান হয়, আমাকে বলবে না? আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না?

অশ্রু কাঁদতে কাঁদতে বলে, স্যার, ওরা সব...

আর বলতে পারে না।

অনাদিদা আবার ওর মাথায় হাত দিয়ে বলেন, বলো বলো। লজ্জা কি আমার কাছে?

অশ্রু আর বুকের মধ্যে চেপে রাখতে পারে না। কিছুতেই না। অবোধ শিশুর মত অশ্রু দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অনাদিদাকে। বলে, স্যার, ওরা সবাই আমাকে ঠাট্টা করে।

—কেন?

হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতেই ও বলে, আমি নাকি আপনাকে ভালোবাসি। তাই..

অনাদিদাও দু-হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেন। ওর মাথার উপর নিজের মুখখানা রেখে অনাদিদা বলেন, তার জন্য কাঁদছ কেন? তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?

অশ্রু ওর বুকের মধ্যে মুখখানা লুকিয়ে রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলে, হ্যাঁ স্যার, ভালোবাসি; খুব ভালোবাসি।

—আমি জানি। তাই তো তোমাকেও আমি ভালোবাসি।

—সত্যি স্যার?

—হ্যাঁ অশ্রু, সত্যি তোমাকে ভালোবাসি।

—শুধু আমাকেই ভালোবাসেন স্যার?

—হ্যাঁ, শুধু তোমাকেই ভালোবাসি।

অশ্রু আনন্দে, খুশিতে, উত্তেজনায় পাগলের মত অনাদিদাকে জড়িয়ে ধরে। অনাদিদার লোমশ বুকের উপর মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, আপনি খুব ভালো। আপনার মতো মানুষ হয় না। আপনাকে আমি আরো, আরো অনেক ভালোবাসব।..

গয়ার রেস্ট হাউসে বিছানার ওপর মুখোমুখি বসে অনাদিদার ভালোবাসার কাহিনি শুনছিলাম আর মনে মনে আমি চলে গেছি বহুদূরে। পূর্ব বাংলার বরিশাল জেলার ঘোলা মহাকুমার পাতারহাট। কোনোদিন যাইনি, হয়ত ভবিষ্যতেও কোনোদিন যাব না। কিন্তু চোখের সামনে দেখছিলাম, সেই উদ্দাম, উত্তাল, অনন্তযৌবনা মেঘনাকে। পাতারহাটের গঞ্জ। এঁকে-বেঁকে আলো-ছায়ায় সবুজ শ্যামল ক্যানভাসের ওপর দিয়ে চলে গেছে যে পথ সেটাই ডাইনে গিয়ে পৌঁছে যায় হিন্দু একাডেমীতে। স্কুল বাড়িটাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি লম্বা বারান্দার মাঝামাঝি হেডমাস্টার মশায়ের ঘর, টিচার্স কমনরুম, লাইব্রেরি। তারপরই অনাদিদার ঘর।

ভাবতে গিয়েও একটু হাসি। সর্বত্যাগী বিপ্লবী অনাদিদার ঘর। ভাবভোলা অনাদিদার ঘর। কিন্তু ঘরের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারছি, এই ভাবভোলা বাউন্ডুলে জীবনেও নিশ্চয়ই কোনো অভয়া বা রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছে।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। এই ভাঙাচোরা অন্ধকার ঘরের এক কোণায় একটা টুকরো জ্যোৎস্নার আলো। টুপ-টুপ করে গলে পড়ছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা ঘর। অনাদিদার মুখে। বুকে। প্রাণে।। পাতারহাট গঞ্জের পাশের যমুনার মতই টল টল ঢল ঢল করছে তার যৌবন। রূপসী বাংলার নক্‌সী কাঁথার মাঠ সোজন বাদিয়ার ঘাটে তাকে দেখেছি বার বার বহুবার। দেখেছি আম, জাম, কঁঠাল, অশ্বত্থ, হিজলের বনে, দেখেছি কাশ বনে, ভোরের কুয়াশায়, জোনাকির আলোয়। এরই নাম অশ্রু? আমাকে দেখে এত লজ্জা?

খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনাদিদা বললেন, তখন আমাব ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। আছি আলিপুর জেলে। হঠাৎ একদিন অশ্রু তার স্বামীকে নিয়ে হাজির। ভেবেছিলাম, খুব কাঁদবে কিন্তু না, এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলল না।

অনাদিদা একটু থামেন। একবার বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে বলেন, অশ্রু কি বলল জানিস?

—কী?

—বলল, না, অনাদিদা, তোমার ফাঁসি হতে পারে না। তুমি মরলে যে আমি বিধবা হবো। না, না, তা হতে পারে না। কিছুতেই না।

অনাদিদা থামলেন। আমিও কোনো প্রশ্ন করি না। দুজনেই চুপ করে বসে থাকি। মনের মধ্যে এত কথা, এত স্মৃতি আনাগোনা করে যে কেউই কথা বলতে পারি না।

হঠাৎ বেয়ারা এসে ডাকল, সাব খানা তৈয়ার।

স্বপ্ন ভঙ্গ হল অনাদিদার। বোধহয় আমারও। ওঁর মুখে একটু ম্লান হাসির আভা। বললেন, শুনলি আমার অশ্রুর কথা?

মুখে কিছু বললাম না ; শুধু মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

প্রাইভেট প্রাকটিশ

ডেরাডুন শহরটাকে পিছনে রেখে এগিয়ে যান চাক্রাতার রাস্তা ধরে। ধীরে ধীরে মানুষের ভিড় পাতলা হয়ে আসবে আর দূরের মুসৌরী পাহাড়টা আরো স্পষ্ট মনে হবে। ঐ যে কি একটা সিনেমা হলের কাছাকাছি কংক্রীটের ছোট্ট পুলটা পার হলেই ডেরাডুন শহরটাকে আর দেখা যাবে না।

আরো এগিয়ে যান। বেশি না, দু'এক মাইল এগিয়ে গেলেই দূরের ফরেস্ট অনেকটা কাছে এগিয়ে আসবে। তারপর ছোটোখাটো দুটো-একটা কল-কারখানা পড়বে। দাঁড়াবেন না। আরো একটু এগিয়ে যান। এই মাইলখানেক আর কি! ফাঁকা চাক্রাতা রোডের ওপর ছোটোখাটো দু'চারটে দোকান চোখে পড়বে। চা-পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। একটা দোকান থেকে বিবিধ ভারতীয় পচা হিন্দি গান আপনার কানে আসবে। কিছু লোককে আড্ডা দিতে দেখবেন। তবুও দাঁড়াবেন না।

এ বল্লুপুর পিছনে ফেলে সামান্য কয়েক পা এগিয়ে গেলেই এফ-আর-আই—ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এক নম্বর গেট। খাকি উর্দি পরা রামবাহাদুরকে পাহারা দিতে দেখবেন। যদি প্রাইভেট গাড়ি করে যান, থামতে হবে না। আর যদি ট্যাক্সি বা অটো-রিকশা করে যান, একটু থামুন। রামবাহাদুর একটা হলদে রঙের ছেঁড়া খাতা আর দেড় ইঞ্চি লম্বা একটা পেন্সিল এগিয়ে দেবে। ঐ খাতায় ট্যাক্সি বা অটো-রিকশার নম্বর লিখে একটা দস্তখত দিন।

বল্লুপুরের এই গেট থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে এফ-আর-আই-এর কেন্দ্রবিন্দু। কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের পিছনের ছোট্ট রাস্তাটাকে লাভার্স লেন বলে না? পদ্মপুকুরের ওদিকেও একটা ছোট্ট রাস্তার নাম লাভলক প্লেস। আসলে এফ-আর-আই-এর এই রাস্তাটাই প্রেমিক-প্রেমিকাদের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হওয়া উচিত ছিল। সত্যি কি সুন্দর এই রাস্তাটা! দু'পাশে এফ-আর-এই-এর নিজস্ব রিজার্ভড় ফরেস্ট। ঐ ফরেস্টের মাঝখান দিয়ে পিচের রাস্তাটা লজ্জায় এঁকে বেঁকে পালিয়ে গেছে সেন্ট্রাল বিল্ডিং-এর ওদিকে।

দু'পাশে অত সুন্দর ফরেস্ট যে শুধু কিছু কোকিল ছাড়া আর কেউ থাকতে পারে না। হ্যাঁ, আর আছে কিছু 'বৌ কথা কও' পাখি! এফ-আর-আই-এর এই ছোট্ট নিজস্ব শহর নিউ ফরেস্টে যাঁরা বেশিদিন থাকেন, তাঁরা সাইকেল, মোটর, ট্যাক্সি বা অটো-রিকশা করেই এই রাস্তা দিয়ে চলে যান। এই বিজন-নির্জন বনানীর আকর্ষণ তাঁদের নেই। কোকিলের ডাক বা 'বৌ কথা কও' তাঁদের কানে যায় কিন্তু প্রাণে দোলা দেয় না।

কিন্তু নতুন যাঁরা আসেন তাঁরা বল্লুপুরের গেটে এসে ট্যাক্সি বা অটোরিকশা থেকে নেমে পড়েন। এই বনবীথিকা দিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যান নিউফরেস্টের ঐ বাংলোগুলোর দিকে।

নিউ ফরেস্টের অফিসারের দল সপরিবারে এই রিজার্ভড্ ফরেস্টে আসেন মাঝে মাঝে। বছরে দু'তিনবার। তবে কোকিলের ডাক শুনতে নয়, পিকনিক করতে। 'মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধছায়া নীপকুঞ্জে তলে' বসে বসে লুচি-আলুর দম-চিকেনকারি আর চাটনি খাওয়া হয়। ফরেস্ট এদের কাছে মনের খোরাক নয়, ল্যাবরেটারির উপাদান মাত্র।

ব্যতিক্রম শুধু ডাক্তার।

ডাঃ বোধিসত্ত্ব ব্যানার্জী।

ডাঃ ব্যানার্জী মাঝে মাঝেই আপন মনে ঘুরে বেড়ান এই শ্যামল বনানীর নির্জন পথে পথে। কোকিলের ডাক শোনেন, 'বৌ কথা কও' পাখি খুঁজে বেড়ান গাছের ফাঁকে ফাঁকে, লতাপাতার আড়ালে।

নিউ ফরেস্টের কোনো অফিসারকে দেখলে ডাক্তার লজ্জা পান। ভীষণ লজ্জা পান! নিজের মনকে নিজেই লুকোতে হিমসিম খেয়ে যান। একটু সামলে নিয়ে বলেন, 'কী করব বলুন মিঃ সরকার? নিউ ফরেস্টের যে বাড়িতেই যাই না কেন, সেখানেই একটা না একটা রুগী দেখতে হয়। প্রেসক্রিপশন লিখতে হয়। সব সময় কি ভালো লাগে?'

একটু থেমে, একটু হেসে ডাক্তার বলেন, 'তাইতো মাঝে মাঝে সময় পেলে এদিকে একটু ঘুরতে আসি। এখানে কেউ প্রেসক্রিপশন লিখতে বলে না।'

মিঃ সরকার হো হো করে হেসে উঠে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে যান ওদিকে। মনে মনে ভাবেন, ছোকরা বয়স, তারপর এইতো সেদিন এলো! আরো কিছুদিন থাকলে এসব কবিত্ব কোথায় পালিয়ে যাবে।

ডাক্তারের ভাবতে অবাক লাগে। সত্যি নিউ ফরেস্টের মানুষগুলো যেন কেমন কেমন! নিউ ফরেস্টের মধ্যে এবা কি আশ্চর্যভাবে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়। এত বড় হিমালয়ের কোলে থেকেও এদের জীবন কত সীমাবদ্ধ। সকাল সাড়ে ন'টা আর বিকেল সাড়ে চারটের সাইরেনের পরও এরা মুক্তি পায় না, মুক্তি পেতে পারে না, মুক্তি পেতে জানে না। সন্ধ্যার পর একটু-আধটু মজলিস বসে, কিন্তু সেখানেও ট্রান্সফার -প্রমোশন-ইনক্রিমেন্টের গল্প। অথবা ট্যুরে'র কথা। অথবা পুরনো অফিসারের নিন্দা।

মেয়েরা?

নিউ ফরেস্টে মেয়ে কোথায়? মিঃ মুখার্জীর দু'টি মেয়ে ছাড়া নিউ ফরেস্টে মেয়ে নেই, সবাই বিবাহিতা, সবাই গৃহিণী। সাড়ে সাতটার মধ্যে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে স্বামীকে ব্রেকফাস্ট দিতে দিতেই সকালবেলার মেয়াদ শেষ হয়। তারপর স্বামীকে লাঞ্চ খাইয়ে ছেলে-মেয়েদের তদারক করতে করতেই সাড়ে চারটের সাইরেন বিকট আর্তনাদ করে বেজে ওঠে। স্বামীকে চা দিতে না দিতেই সূর্য নিউ ফরেস্ট থেকে পালিয়ে যায়। তারপর আবার সংসার, চাল-ডাল-আটা-ময়দার কোরাস।

সন্ধ্যার পর একটু মেলামেশা। একটু গল্পগুজব। হয়তো বা একটু হাসি-ঠাট্টা-তামাসা। তারপর নিউ ফরেস্ট ঘুমিয়ে পড়ে। একটি একটি করে বাংলোর আলোগুলো নিভে যায়। ঘুমিয়ে পড়ে সবাই।

সবাই?

না, সবাই না। মিঃ মুখার্জীর ড্রইংরুমে দুটি একটি ব্যাচিলর মৌমাছি মধুর গন্ধে অথবা কিছু খোস গল্প করে অনেক রাত অবধি। আর ফরেস্ট কলেজের হোস্টেলের পাশের বাংলোয় মিঃ পটাশকারের ড্রইংরুমে আলো জ্বলে। তবে বড় আলোটা নয়, ছোট আলোটা। নাইট ল্যাম্পটা। হোয়াইট হর্সের শেষ বিন্দু গলায় ঢেলে দেবার পর নাইট ল্যাম্পটাও আর নজরে পড়ে না।

তারপর নিউ ফরেস্টে ঘুমিয়ে পড়ে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ে?

না। স্বামীর পাশে শুয়ে থাকেন কিন্তু ঘুম আসে না অমিতাবৌদির। দূরের মুসৌরী পাহাড়ের আলোগুলো যেন হাতছানি দিয়ে অমিতাবৌদিকে ডাকে। নিউ ফরেস্টের ঐ বন্দিনী জীবনে ঐ দূরের আলো কত মিষ্টি, কত মনোরম, কত প্রিয়, কত আকর্ষণীয় মনে হয়। দূরের মুসৌরী পাহাড়ের আলোর মালার মতো ডাক্তারের হৃদয়দীপের আলোও যেন অমিতাবৌদিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

ডাক্তার?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাঃ বোধিসত্ত্ব ব্যানার্জী। আমাদের ডাক্তার। নিউ ফরেস্টের মেডিক্যাল অফিসার!

আশ্চর্য হবার কি আছে? অমিতাবৌদি মানুষ। রক্ত-মাংসের মানুষ। আঠারো বছরে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন থেকে আই-এ পাস করার পর স্বামীর হাত ধরে প্রথম যেদিন নিউ ফরেস্টে এসেছিলেন, সেদিন তাঁর চোখে ছিল অনেক আশা, ছিল অনেক স্বপ্ন। মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের সব শিক্ষিতা মেয়েই যেমন স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের। শিক্ষিত-ভদ্র ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে স্বপ্ন দেখবে না? নিশ্চয়ই দেখবে কিন্তু ঐ লাল বেনারসীর মেয়াদ যে কত সীমিত তা ভাবতে পারে না স্বপ্নাতুর ভরা-যৌবনাদের দল। স্বামীর একটু ছোঁয়া, একটু স্পর্শ, একটু আদর, একটু আলিঙ্গন মেয়েদের দেহে বন্যা আনে, মনে স্বপ্ন আনে।

তারপর?

তারপর বিনা-ইঞ্জিনের গ্লাইডারের মতো হঠাৎ আকাশে ভাসতে থাকে, উড়তে থাকে। মাটির পৃথিবী থেকে একটু উপরে গিয়েই পাগল হয় সদ্যবিবাহিতা, সদ্যপ্রস্ফুটিতার দল। কিন্তু বিনা-ইঞ্জিনের গ্লাইডার কতক্ষণ উড়বে? নেমে আসে মাটিতে, মাটির পৃথিবীতে। বারো বছর আগে এম-এস-সি পাস স্বামীর সঙ্গে যেদিন অমিতাবৌদি হাওড়া থেকে ডুন এক্সপ্রেসের কুপেতে চড়েছিলেন, তখন মনে করেছিলেন হাতে স্বর্গ পেলেন।

স্বর্গ?

স্বর্গ বৈকি। বৈঠকখানায় তিনখানা ঘরের বাড়িতে পাঁচ ভাইবোন আর বাবা-মা। মিত্র স্কুলের মাস্টারি আর দুটো টিউশনির পঞ্চাশ টাকার মধ্যে সাতটি প্রাণীর সংসার

চলত। থামত না ঠিক কিন্তু বনগাঁ লোকালের মতো থামতে থামতে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোরকমে চলত। কলকাতার বারো আনা লোকের সংসার যেমন চলে, অমিতাবৌদিদের সংসারও ঠিক তেমনি চলত। পাঁচ-পাঁচটি ভাইবোনকে স্কুল-কলেজে পড়াতেই বাবার জান্ বেরিয়ে যেত।

সখ-আনন্দ? মীর্জাপুরের প্রতিমাদের বাড়ি যাওয়াই ছিল একমাত্র আনন্দ। প্রতিমাদের বাড়ির ছাদে উঠে একটু দূরের আকাশ দেখাই ছিল অমিতাবৌদির নিত্যকার চিত্তবিনোদনের একমাত্র সূত্র। আর কদাচিৎ কখনও এক টাকা চার আনা দিয়ে পূরবীতে সিনেমা দেখা।

ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হবার পর দৃষ্টিটা একটু পালটে গিয়েছিল। মনে রঙ লেগেছিল। দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মঞ্জরী দেখে অমিতাবৌদি নিজেই চমকে উঠেছিল। আশপাশের সবার থেকে নিজেকে একটু স্বতন্ত্র, একটু অনন্যা মনে হয়েছিল।

নিজেকে নিজের ভালো লাগত। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখার সুযোগ কোথায়? তাইতো ঐ সিঁড়ির তলার কলকাতায় স্নান করতে গিয়ে অমিতাবৌদি নিজেকে দেখত। ভালো করে দেখত। সর্বাঙ্গ দেখত। অকারণে হাসি ফুটে উঠত নিজের মুখে।

আমহার্স্ট স্ট্রিট-মীর্জাপুর দিয়ে কলেজে যাবার সময় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছাকাছি প্রায়ই দেখা হত অশোকদার সঙ্গে। ছোটবেলার বন্ধু মিতালীর দাদা অশোক। ইউনিভার্সিটির ছাত্র। অমিতাবৌদির সঙ্গে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তবুও শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে এসে অশোকদার সঙ্গে ঐ দেখাটুকুই ভালো লাগত। তখন যে ভালো লাগার বয়স।

কলেজের অন্য অনেক মেয়ের জীবনে বসন্ত এসেছিল। ওদের বসন্তে ভ্রমর-গুঞ্জনের কথা শুনত অমিতাবৌদি। ভালো লাগত উপন্যাসের নায়িকাদের জীবন-কাহিনি শুনতে। হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে তারও মনে মনে ইচ্ছা হতো নায়িকা হতে। ভালোবাসতে, ভালোবাসা পেতে। বন্ধুর থেকে দূরে গিয়ে অনন্যা হতে।

সুধীরবাবুর সঙ্গে যেদিন ডুন এক্সপ্রেসে চাপল, তখন সে অনন্যা হয়েছিল। দুটি রাত্রের সে সফর যেন অনন্যার অভিষেক হয়েছিল। দেহে, মনে নতুন ঐশ্বর্যের স্বাদে ভরে উঠেছিল অমিতাবৌদির জীবন। জোয়ারের জল যে একদিন সরে যাবে, ভরা নদী যে একদিন শুকিয়ে যাবে, সেদিন অমিতাবৌদি ভাবতে পারেনি। কেউই পারে না।

দিনে দিনে, তিলে তিলে সুধীরবাবু যেন ল্যাবরেটরির মাইক্রোস্কোপের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। সাড়ে ন'টা আর সাড়ে চারটের সাইরেনের মধ্যে মাইক্রোস্কোপের তলায় গাছের 'সেল' পরীক্ষা করতে করতে অমিতাবৌদির মনের 'সেল' দেখতে ভুলে গেলেন। সুখী, সাধ্বী অমিতাবৌদির জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অনন্যা অমিতাবৌদির মৃত্যু হল। রঙিন নিউ ফরেস্ট হারিয়ে গেল। চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল। স্বামীর দায়িত্ব, কর্তব্য, ভালোবাসার ফাঁক দিয়ে কবে, কখন কেমন করে হারিয়ে গেল অমিতাবৌদি নিজেও তা টের পেল না।

সুধীরবাবু কি পালটে গেছেন? বিন্দুমাত্র না। পৃথিবীর অন্য সব স্বামীর মতো তিনিও

ছন্দা পড়াশুনা সেরে ঘুমিয়ে পড়লে অমিতাবৌদিকে কাছে টেনে নেন। আদর করেন, ভালোবাসেন। রাতের অন্ধকার আরো গাঢ় হলে, নিউ ফরেস্ট ঘুমিয়ে পড়লে সুধীরবাবু অমিতাবৌদিকে আরো, আরো অনেক কাছে টেনে নেন। ডুবে যান, হারিয়ে যান অমিতাবৌদির মধ্যে! তাও কি রোজ? সপ্তাহে দু'একদিন। ঐ দু'একদিনই সুধীরবাবু আবার সেই বারো বছর আগের ডুন এক্সপ্রেসের যাত্রী হন।

অমিতাবৌদির ভালো লাগে। বেশ ভালো লাগে। ডুন এক্সপ্রেসের কুপেতে চড়তে তার বড় আনন্দ হয়, বড় তৃপ্তি লাগে। কিন্তু ঐ রাতের অন্ধকারে যখন ডুন এক্সপ্রেস থেমে যায়, যখন একটি সপ্তাহের মতো সিগন্যাল ডাউন না পেয়ে ডুন এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে থাকে, তখন অমিতাবৌদির কানে ঐ সর্বনাশা কোকিলের ডাক ভেসে আসে। হয়তো শ্রদ্ধানন্দ পার্কের মোড়ের অশোকদার কথা মনে পড়ে। হয়তো মনে মনে সন্দেহ হয়, এ কি ভালোবাসা? নাকি কর্তব্য? অভ্যাস? নাকি শুধু প্রয়োজন?

ঠিক বুঝতে পারে না অমিতাবৌদি। ভাবে সবারই কি এক ইতিহাস? সবাই কি শুধু অভ্যাস-কর্তব্য-প্রয়োজনের ত্রি-সীমানার মধ্যে বন্দিনী? এর চাইতে বেশি কি পাওয়া যায় না? এর চাইতে বেশি পাবার কি অধিকার নেই? প্রয়োজন নেই?

অমিতাবৌদি চায় অনন্যা হতে। স্বপ্ন দেখে তার স্পর্শ, তার ভালোবাসা, তার হাসি, তার চোখের দৃষ্টি মাতাল করবে, পাগল করবে তার প্রাণের পুরুষকে। আর আর সেই প্রাণের পুরুষ দায়িত্ব, কর্তব্য, অভ্যাসের দাস হয়ে ডুন এক্সপ্রেসের কুপেতে সফর করবে না।

তবে?

তবে আবার কি? অমিতাবৌদি অনন্যা হবে। অন্তত একটি মানুষের জীবনে সে অনন্যা, অদ্বিতীয়া হবে। শুধু নিদ্রাহীন রাতে নিঃসঙ্গ হয়ে নয়, প্রতি দিন, প্রতি রাত্রে দুজনে মিলে শুনবে কোকিলের ডাক। শুনবে, বৌ কথা কও।

সকালবেলায় দিনের আলোয় অমিতাবৌদির স্বপ্ন হারিয়ে যায়, পালিয়ে যায়। সত্যি? নাকি লুকিয়ে পড়ে?

দুটোর সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সুধীরবাবু লাঞ্চ খেয়ে ল্যাবরেটরিতে গিয়ে তার মাইক্রোস্কোপের ফোকাস ঠিক করতে শুরু করেন। সে লেন্সের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর অসংখ্য সব গাছপালার অন্তরের কথা জানা যায় ; কিন্তু অমিতাবৌদি তখন আউট-অফ-ফোকাস হয়ে যান। ঐ সুন্দর বাংলো বাড়ির বারান্দায় বা লনের পাশে গার্ডেন চেয়ারে বসে সুধীরবাবুর পুলওভার বুনতে বুনতে অমিতাবৌদির আবার মনে পড়ে যায় ফেলে আসা রাতের কথা। স্বপ্নের স্মৃতি। আপন মনে নিজেই হেসে ওঠে পাগলামিরও একটা সীমা থাকা উচিত। তাই না? নিশ্চয়ই। অমিতাবৌদি নিজেই নিজেকে শাসন করেন। হাতের কাঁটা দুটো যেন একটু দ্রুত চলে।

রাত্রে খাবার সময় সুধীরবাবু একটু যেন রেগেই বলে উঠলেন, 'এতদিন ধরে বুকে ব্যথা, বুকে ব্যথা বলছ অথচ ডাক্তার দেখাবে না কেন বলতে পার?'

ছন্দার খাওয়া হয়ে গেছে। সে ভিতরের বেসিনে হাত ধুতে যায়। সুধীরবাবু বাঁ

হাত দিয়ে কাছে টেনে নেন অমিতাবৌদিকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ফিরে যান অতীতে। সেই বারো বছর আগে।

অমিতাবৌদির বেশ ভালো লাগে। মুহূর্তের জন্য তিনি যেন অনন্যা, অদ্বিতীয়া হন! বলেন, 'আঃ ছেড়ে দাও। ছন্দা দেখবে।'

সুধীরবাবু বোধহয় মাইক্রোস্কোপের লেন্সের ভিতর অমিতাবৌদির মনের 'সেল' দেখতে পান। কি যেন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, অমিতাবৌদির দিকে, নিশ্বাসটাও যেন একটু ঘন, একটু গরম হয়। সুধীরবাবু কেমন যেন একটু পাগলামী শুরু করেন।

অমিতাবৌদিব ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে। দেহ মনে পদ্মার মাতলামী দেখা দেয় লুকিয়ে লুকিয়ে। সর্বাঙ্গে যেন শিহরণ দেখা দেয়, কানে ভেসে আসে কোকিলের ডাক।

পবের দিন সকালে অফিস গিয়েই সুধীরবাবু ডাক্তার ব্যানার্জীকে টেলিফোন করলেন, 'ডাক্তার সাহেব, এই মাইক্রোস্কোপ আর ঘরের গিন্নি ঠিক না থাকলে বাঁচব কি করে?'

ডাক্তার হেসে বলে, 'কোনটা ধর্মঘট করল? মাইক্রোস্কোপ না গিন্নি?'

'মাইক্রোস্কোপ হলে কি আর এই সাত সকালে ফোন করতাম? গিন্নি, ডাক্তার গিন্নি। কুইন এলিজাবেথ দি থার্ড!'

'কি হল কি?'

'কি হল তা বুঝলে তো নিজেই চিকিৎসা করতে পারতাম। কিছু কাল ধরেই বলছে বুকে ব্যথা, অথচ চিকিৎসা করবে না।'

'তাহলে আমি আর কি করব?'

সুধীরবাবু এবার রসিকতা করে বলেন, 'ভায়া, সুন্দরী গিন্নির বুকে ব্যথা। সহ্য করতে পারলাম না। কাল অনেক কাণ্ড করে রাজি করিয়েছি।'

ডাক্তার একটু ব্যস্ত ছিল। বলল, 'এক্ষুনি তো পারছি না। লাঞ্চের পর গেলে কি অসুবিধা হবে?'

লাঞ্চে এসে সুধীরবাবু বলে গেলেন, 'ডাক্তার আসবে। সব কথা বোলো, কিছু লুকিয়ে চেপেটেপে রেখো না!'

ডাক্তার এসেছিল। তবে লাঞ্চের পরেই আসতে পারেনি। আসতে আসতে প্রায় চারটে হয়েছিল।

'সুধীরবাবুর জন্য রোজ কাটলেট বানাতে শরীরটাই খারাপ করে ফেললেন?'

অমিতাবৌদি হাসে। অর্ধসমাপ্ত পুলওভারটা ছোট্ট টি-পাই-এর উপর রেখে ভিতরে যান। ড্রইংরুমে।

ডাক্তার বলল, 'শুয়ে পড়ুন। একটু পরীক্ষা করে দেখি কত কাটলেট খাইয়েছেন।'

শোবার ঘরে অমিতাবৌদি শুয়ে পড়েন! ডাক্তার পাশে বসে চেয়ারটা টেনে নিয়ে চুপচাপ দেখেন কিছুক্ষণ।

'বাঁ হাতটা দিন।'

অমিতাবৌদি বাঁ হাত বাড়িয়ে দেন। ডাক্তার ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে পালস্

পরীক্ষা করেন।

অমিতাবৌদি জোরে জোরে নিশ্বাস নেন। বুকটা একটু বেশি ফুলে ফুলে ওঠে। বোধহয় একটু লজ্জা করে। দৃষ্টিটা সরিয়ে ঘুরিয়ে নেন বাইরের দিকে।

ডাক্তার নাড়ী দেখে। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে দৃষ্টিটা আটকে যায়। অমিতাবৌদির হৃদয়-স্পন্দন দেখে ডাক্তার। হয়তো একটু ভালো লাগে, মনে রং লাগে। না, না, ওসব কিছু না। ছাত্র-জীবনে ওসব হতো। আজকাল আবার এসব দুর্বলতা কি? তিনবছর বিয়ের পরও কি এসব দুর্বলতা কারুর থাকে? ডাঃ বোধিসত্ত্ব ব্যানার্জীরও নেই।

কিন্তু তবুও মুহূর্তের জন্য ভালো লেগেছিল ডাক্তারের। অমিতাবৌদির হৃদয়-স্পন্দন দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল, সুধীরবাবু সত্যি ভাগ্যবান।

পালস্ দেখা হয়ে গেল। ডাক্তার অমিতাবৌদির হাতটা নামিয়ে রাখে।

'বুকে ব্যথা করে আপনার?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়? বাঁ দিকে না ডান দিকে?'

'বাঁ দিকে।'

'সব সময় ব্যথা করে?'

'হ্যাঁ, প্রায় সব সময়েই।'

'কম না বেশি?'

'মাঝে মাঝে খুব বেশি ব্যথা করে।'

ডাক্তার স্টেথো বের করে। চেস্টপিস দিয়ে অমিতাবৌদির বুক পরীক্ষা শুরু করে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে। ডাক্তার কেন যেন একটু চিন্তিত হয়। ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে।

'একটু জোরে জোরে নিশ্বাস নিন।'

অমিতাবৌদি জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়। বুকটা ফুলে ফুলে উপরে ওঠে, নীচে নামে।

স্টেথোর চেস্টপিস কখনও প্লুরার পাশে, কখনও ব্রেস্টের পাশে ঘোরাঘুরি করে ডাক্তারের হাতটাও ঘুরে বেড়ায়। একটু এদিক-ওদিক লাগে বৈকি!

অমিতাবৌদির লজ্জা করে। চুপ করে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। শুধু দৃষ্টিটা বাইরে আকাশে ভেসে বেড়ায়। ডাক্তারের স্পর্শে কি মন একটু চঞ্চলা হয়? না না, তা হবে কেন?

ডাক্তার তো পরীক্ষা করবেই।

'ওপাশ ফিরে শোন।'

অমিতাবৌদি ওপাশ ফিরে শোন। ডাক্তার পরীক্ষা করে চলে। ডাক্তারের ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে। কপালে যেন কয়েকটা চিন্তার রেখা দেখা দেয়।

'উপুড় হয়ে শোন তো।'

অমিতাবৌদি উপুড় হয়ে শোন। ডাক্তারের পরীক্ষা এগিয়ে চলে।

পরীক্ষা করতে করতে ডাক্তার বুঝিবা মুহূর্তের জন্য অমিতাবৌদির সর্বাঙ্গের উপর

দিয়ে দৃষ্টিটা বুলিয়ে নেয়। বাঃ বেশ তো!

ডাক্তারের কথায় অমিতাবৌদি আবার চিৎ হয়ে শোন। স্টেথো নামিয়ে রেখে এবাব হাত দিয়ে পরীক্ষা করে। দু'পাশের প্লুরার কাছে দুটো হাত দিয়ে জোর করে চেপে ধরে ডাক্তার।

'খুব জোরে নিশ্বাস নিন।'

খুব জোরে নিশ্বাস নিতে গিয়েই অমিতাবৌদি হঠাৎ বলেন, 'আঃ ভীষণ লাগছে।'

'কোথায়?'

'এইতো বাঁ দিকটার এইখানে।'

ডাক্তার এবার দুটো আঙুল দিয়ে বাঁ দিকের নানা জায়গায় আঘাত করতে থাকে।

'ব্যথা লাগলেই বলবেন।'

ডাক্তার জেনে নেয় কোথায় ব্যথা।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে ডাক্তার বড় যত্ন করে পরীক্ষা করল। বড় ভালো লাগল অমিতাবৌদির।

দুজনে বেরিয়ে এসে বাইরের গার্ডেন চেয়ারে বসে।

'এতদিন আমাকে খবর দেননি কেন? কাটলেট খাওযাতে হবে বলে?'

অমিতাবৌদি একটু হাসেন। বড় সুন্দর হাসি। ঢলে পড়া সূর্যের মতো মিষ্টি আলোয় ভরে যায় মুখখানা। বললেন, 'এমনি।'

'খুব বেশি পরিশ্রম করেন?'

'না, তেমন কি। সাধারণ সংসারে সবাই যেমন করে...।'

'কোনোদিন হঠাৎ কোথাও পড়ে গিয়েছিলেন বা বুকে আঘাত লেগেছিল?'

একটু ভাবেন অমিতাবৌদি। একটু দৃষ্টিটা ঘুবিয়ে একটু ঠোঁটটা কামড়ান মুহূর্তের জন্য। বলেন, 'দিন পনেরো আগে বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'পড়ে গেলেন কীভাবে?'

'সাবান দিয়ে স্নান করছিলাম। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলাম।'

ডাক্তার একটু রসিকতা করেন। 'এখনও সাবান দিযে স্নান করতে পারেন না?'

দুজনেই একটু হাসে।

'বুকে চোট লেগেছিল'?

'ঠিক বুকে কোনো চোট লাগেনি কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন খচ করে উঠেছিল!'

'তারপর থেকেই বুকে ব্যথা তাইতো?'

'হ্যাঁ।'

ডাক্তার আরো খোঁজ-খবর নেয়। 'শরীরের যত্ন করেন না কেন?'

'আর কি যত্ন করব?'

'অনেক দিন ধরে খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো করেন না, তাই না?'

অমিতাবৌদি একটু হাসে। ভাবে খাওয়া-দাওয়া তো রোজই আছে। কিন্তু একলা একলা কি খেতে ভালো লাগে? তাছাড়া কে খোঁজ করে আমার খাওয়া-দাওয়ার? ডাক্তারকে বলেন, 'কেন? খাওয়া-দাওয়া তো ঠিক মতোই করি।'

'কেন লুকোচ্ছেন? এবার আমি যখন নিজে খাইয়ে দেব, তখন দেখবেন মজাটা।'

অমিতাবৌদি ভেতরে চলে যান। একটু পরে এক কাপ কফি আর দুটো ফ্রেঞ্চ টোস্ট নিয়ে আসেন।

'স্বামীকে কাটলেট খাইয়ে তো একটা বুকে ব্যথা করেছেন। এবার আমাকে খাইয়ে আর একটা বুকে ব্যথা করবেন?'

এবার অমিতাবৌদিও একটু রসিকতা করেন! 'স্বামীকে সেবা করে বুকে ব্যথা করেছি, আপনাকে সেবা করে সে ব্যথা সারিয়ে নেব।'

'সে বিশ্বাস আছে আপনার?'

'নিশ্চয়ই। তা নয়তো কি এত খাতির করতাম?'

কফির পেয়ালা, প্লেট নামিয়ে রেখে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করে, 'বুকে ব্যথা হবার পর থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার দেখেছেন?'

'থার্মোমিটার দিইনি, তবে মাঝে মাঝে গাটা গরম মনে হয়।'

'শোবার সময় কোন্ দিকে ফিরে শুতে ভালো লাগে?'

'বাঁ দিকে ফিরে শুলেই যেন একটু ভালো লাগে।'

সাড়ে চারটের সাইরেন বেজে উঠল! কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুধীরবাবু আসেন। অমিতাবৌদি আবার কফি করতে ভেতরে চলে যান।

'কি দেখলেন ডাক্তার?'

'আই থিঙ্ক ইট ইজ এ কেস অফ ড্রাই প্লুরিসি।'

'তাই নাকি?' সুধীরবাবু একটু চিন্তিত হন।

'চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে আপনাকে কয়েকটা কাজ করতে হবে।'

'কি বলুন।'

'নিয়ম হচ্ছে কমপ্লিট রেস্ট ইন বেড। যদি সেটা নিতান্তই অসম্ভব হয় তাহলে অন্তত ওঁকে দিয়ে রান্নাবান্না করানো বন্ধ করতেই হবে।'

সুধীরবাবু যেন একটু স্বস্তি পান। 'সেটা বিশেষ মুশকিলের কিছুই নয়। আমার একটা ছোকরা চাকর আছে। সে মোটামুটি ভালোই রান্না করে।'

'সেকেন্ডলি, বেশ ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কিন্তু খেলে তো? এক কাপ দুধ খেতে বললেই ফাটাফাটি হয়ে যায়।'

'ছেলেমানুষি করলে তো চলবে না। এবার খেতেই হবে।'

অমিতাবৌদি দু' কাপ কফি নিয়ে আসেন।

সুধীববাবু বললেন, 'নিজের কানে ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকে শুনে নাও কি কি করতে হবে।'

অমিতাবৌদি উড়িয়ে দেন কথাটা, 'যা সম্ভব তাই শুনব।'

এবার ডাক্তার মুখ খোলে, 'ওসব ছেলে-মানুষি ছেড়ে দিন।'

পরের দিন অমিতাবৌদির চেস্ট এক্স-রে হলো। রক্তের ডিফারেনসিয়াল কাউন্ট আর ই-এস-আর দেখা হল।

ডাক্তার সুধীববাবুকে জানিয়ে দেয়, 'যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই। লেফ্‌ট প্লুরায় বেশ খানিকটা প্যাচ হয়েছে।'

অমিতাবৌদি শুয়ে পড়লেন বিছানায়। চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল।

কে জানত তখন, এ শুধু প্লুরিসিব চিকিৎসা নয়?

ডাক্তার রোজ সকালের দিকে আসে ড্রাই-হাইড্রো স্ট্রেপটোমাইসিন ইন্‌জেকশন দিতে। কোনদিন দশটা, কোনদিন আবার এগারোটায় আসে।

প্রথমে বুকের মুভমেন্ট পরীক্ষা করেন। তারপর প্যালপেসন দেখেন। হুঁ, এখনও বেশ ঘড়ানি আওয়াজ। ঠিক যেন বেড়ালের মতো। তারপর পারকাসান। আঙুল দিয়ে টোকা মেরে পরীক্ষা করেন। আওয়াজটাও ঠিক একই রকম আছে। তারপর স্টেথো বের করেন। ইয়ার-পিস কানে দিয়ে চেস্ট-পিসটা ঘুরে বেড়ায় অমিতাবৌদিব সারা বুকে।

রোগশয্যায় শুয়ে থেকেও অমিতাবৌদির যেন একটু ভালো লাগে, শরীরে যেন একটু রোমাঞ্চ লাগে। মনে যেন একটু দোলা লাগে। ডাক্তারকেও যেন একটু ভালো লাগে।

ডাক্তার সিরিঞ্জ বের করে। স্পিরিট দিয়ে মুছে নেয়। ইনজেক্‌শন বের করে. ডিসটিল্ড ওয়াটারের ফাইল বের করে। সিরিঞ্জে ইনজেক্‌শন ভরে নেয়।

'নিন, কোন্ হাতে দেব?'

গলা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে ব্লাউজের বোতামগুলো খুলে দেন অমিতাবৌদি। তারপব অর্ধেক ব্লাউজ খুলে ডান হাতটা বের কবে দেন!

ডাক্তাব ডান হাতের উপরের মাংসপেশীতে স্পিরিটের তুলোটা বুলিয়ে নিয়ে ইনজেক্‌শন দেন।

অমিতাবৌদি একবার আর্তনাদ করেন, 'আঃ মরে গেলাম।'

ডাক্তার সিরিঞ্জটা বের করে নিয়ে দু'চাব মিনিট ম্যাসেজ করে দেয়।

অমিতাবৌদির সব ব্যথা সেরে যায়।

'এফ-আর-আই' এর প্রেসিডেন্টের স্ত্রীকে দেখে ফেরার পথে ডাক্তার বাত্রের দিকে আর একবার আসে। সুধীরবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কি গিন্নী ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছেন তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অমিতা সব কথা শুনছে।'

পরের দিন ডাক্তার আসতে পারে না। কম্পাউন্ডার এসে ইনজেকশন দিয়ে যায়। অমিতাবৌদির কেমন যেন একটু বিশ্রী লাগে।

পরের দিন ডাক্তার এলে অমিতাবৌদি জিজ্ঞাসা করেন, 'কাল এলেন না যে?'

'আসবো কেমন করে? শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা করলেন। রাজা দুষ্মন্তের তদারক করতে হয়েছে। সন্ধ্যায় শালাবাবু আর শকুন্তলাকে ট্রেনে চড়িয়ে দিতে হয়েছে।'

অমিতাবৌদি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন, 'তাহলে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কি হবে?'

'মুখার্জী বৌদির ওখানে নন পেয়িং গেস্ট হবার ব্যবস্থা হয়েছে। কাল রাত্রেই ওপেনিং সেরিমনি হল।'

দশদিনে অমিতাবৌদির বুকের ব্যথা বেশ কমে গেল কিন্তু রোজ রোজ ইনজেক্‌শন

নিতে হাতের ব্যথা বেড়ে গেল।

'হাতে না নিলে কোমরে নিন।'

কোমরে? একটু লজ্জা একটু সঙ্কোচ যেন ঘিরে ধরে অমিতাবৌদিকে। একটু এগিয়ে, একটু পিছিয়ে যায়। হাত দুটো ব্যথায় বিষ হয়ে গেছে। না, না কোমরেই ভালো।

অমিতাবৌদির শাড়ির বাঁধন, সায়ার বাঁধন খুলে একটু নীচে নামিয়ে দেন। মুখটা একটু ঘুরিয়ে নেন ওপাশে।

স্পিরিটের তুলোটা বুলোতে বুলোতে যেন ডাক্তারের হাতটা একটু কেঁপে ওঠে, একটু যেন থমকে দাঁড়ায়।

অমিতাবৌদি টের পান। তবে কি ডাক্তারেরও!

ইনজেকশন দেবার পর স্পিরিটের তুলোটা দিয়ে ডাক্তার একটু ম্যাসেজ করে। একটু বেশি সময় ম্যাসেজ করল না? তুলোটা ফেলে দিয়ে এবার হাতের তালু দিয়ে আবো একটু ম্যাসেজ করে ডাক্তার।

অমিতাবৌদির দেহটা একটু দুলে দুলে নড়ে ওঠে।

ডাক্তারের কি একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল?

সিরিঞ্জ খুলতে খুলতে ডাক্তার হঠাৎ প্রশ্ন করে 'কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনার?'

'বারো বছর।'

'বারো বছর? তাহলে খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে আপনাব?'

'আঠাবো বছরে।'

চিকিৎসা এগিয়ে চলে। অমিতাবৌদি আর ডাক্তার এগিয়ে চলে নিয়তির দিকে।

দু'সপ্তাহ হয়ে গেল। দুজনে এখন অনেক সহজ অনেক সরল। রাতের বেলায় দু'জনেই শুয়ে শুয়ে কোকিলের ডাক শোনে।

'আর কতদিন শুয়ে থাকব ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তারবাবু অমিতাবৌদির কপালে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, 'কোন কষ্ট হচ্ছে?'

অমিতাবৌদির দৃষ্টিটা জানালা দিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। অন্যমনস্ক হয়েই একটা হাত ডাক্তারেব হাতের 'পরে চলে যায়।

ডাক্তাব আবার প্রশ্ন করে, 'কোন কষ্ট হচ্ছে?'

অমিতাবৌদি মুখে কিছু বলে না। মাথা নেড়ে বলে, 'না না, কষ্ট হবে কেন?'

ডাক্তার একটু অমিতাবোদির গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। অমিতাবৌদি যেন দেহের বাঁধনটা একটু ঢিলা করে ডাক্তারকে আদর করতে আমন্ত্রণ জানান। দুজনেরই নিশ্বাসটা যেন একটু ঘন হয়।

অমিতাবৌদি দুটো হাত দিয়ে ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরেন।

সন্ধ্যার সময় ডাক্তার ঐ বল্লপুরের যাবার রাস্তায় একলা একলা ঘুরে বেড়ায়। কোকিলের ডাক শোনে, বৌ কথা কও পাখি খুঁজে বেড়ায়।

অমিতাবৌদি লনে গার্ডেন চেয়ারে বসে সুধীরবাবু পুলওভারটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে চায়। পারে না। হাতটা থেমে যায়। কোকিলের ডাক কানে আসে।

তিন সপ্তাহ ধরে রোজ রোজ ইনজেক্‌শান দেওয়া হল, একটা কোর্স শেষ হল, ডাক্তার ও অমিতাবৌদির একটা অধ্যায় শেষ হলো।

টেম্পারেচার আর বুকের ব্যথা চলে গেল। এখন আর রোজ ইনজেক্‌শন নয়, একদিন অন্তর একদিন।

ডাক্তার আসে, নিশ্বাস নেবার সময় বুকের মুভমেন্ট দেখে, প্যালপেসান দেখে, পারকাসান দেখে, স্টেথো দিয়ে অস্‌কালটেশান দেখে, না, না, অনেকটা ভালো, তারপর ডাক্তার ইনজেক্‌শন দেয়। কোনোদিন হাতে, কোনোদিন কোমরে।

তারপর?

তারপরও ডাক্তার থাকে কিছুক্ষণ, অমিতাবৌদির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কখনও বা হাতটা এদিক-ওদিক চলে যায়।

তারপর?

তারপর অমিতাবৌদি ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরে। গালের পাশে চেপে ধরে।

শেষ ইনজেক্‌শন দেবার দিন আরো একধাপ এগিয়েছিল দুজনে। চাকরটা ক্যান্টিনে গিয়েছিল ডিম কিনতে, অমিতাবৌদি ডাক্তারকে বিদায় জানাবার জন্য ড্রইংরুমের দরজা পর্যন্ত এসেছিলেন। ডাক্তার আর পারেনি। কাছে, বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল অমিতাবৌদিকে।

আর?

আর অমিতাবৌদির ঠোঁটে রেখে গিয়েছিল নিজের স্মৃতি।

ডাক্তার মুহূর্তের মধ্যে ঐ ছোট্ট ফিয়েট চড়ে নিউ ফরেস্টের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

অমিতাবৌদি সেরে গেছে। সুধীরবাবু ভীষণ খুশি, ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞ।

অমিতাবৌদি ফিস-ফ্রাই পৌঁছে দেন ডাক্তারের বাংলোয়। ছন্দা লনে থাকে, ফুল দেখে। অমিতাবৌদি চলে যান ভেতরে। ড্রইংরুম পার হয়ে বেডরুমে। টিফিন ক্যারিয়ারটা খালি করে বেরিয়ে আসেন, কিন্তু মন? সে জোয়ারের জলে ভরে যায়।

লরী রোডের মোড়ে পোস্টাপিসের কাছে মিঃ মুখার্জীর মেয়ে খুকু বলে, 'রোজ রোজ তুমি ডাক্তারবাবুকে ফিস-ফ্রাই খাওয়াবে তা চলবে না।'

ঠোঁটটা একটু কামড়ে হাসিমুখে অমিতাবৌদি বলেন, 'কি করব বল? ডাক্তার রোগ সারাল কিন্তু ফি নিল না। তাই খেসারত দিচ্ছি।'

নিউ ফরেস্ট ঘুমিয়ে পড়ে। মিঃ মুখার্জীর ড্রইংরুম থেকে মৌমাছিরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় নেয়। মিঃ পটাশকার হোয়াইট হর্স চড়ে অমরাবতী বেড়াতে যান। সুধীরবাবু ডুন এক্সপ্রেসের কুপেতে চড়ে পাগল হন। তারপর দুন এক্সপ্রেস থেমে যায়।

জেগে থাকে শুধু অমিতাবৌদি। দূরের মুসৌরী পাহাড়ের আলোগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে।

আর?

আর ঐ সর্বনাশা কোকিলের ডাক শোনে শুধু অমিতাবৌদি।

ডাক্তারও বিছানা ছেড়ে উঠে বসে। কিছুতেই ঘুম আসে না।

সিফন জর্জেট

পিয়ন রেজিস্টার্ড পার্সেলের প্যাকেটটা এগিয়ে দিতেই চিত্রিতা মনে মনে একটু চঞ্চল না হয়ে পারল না। পিয়ন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা বন্ধ করে সোজা শোবার ঘরে চলে গেল। প্যাকেটটা খুলল না। খোলার দরকার নেই। মা যখন পাঠিয়েছেন তখন সেই সিফন জর্জেটটাই ভেতরে আছে।

সিফন জর্জেট!

ভাবতে গিয়েই চিত্রিতার একটা ছোট্ট দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল। পড়বেই। এ যে সেই সিফন জর্জেট। স্মৃতির অরণ্যে ছোট্ট একটা হাস্নাহানা। তা হোক। ভারি মিষ্টি গন্ধ। সুন্দর নিটোল একটা স্বপ্ন। মালিন্যমুক্ত একটু ভালো লাগা। অনন্য অনুভূতির ক্ষণিক জোয়ার।

ভেবেছিল স্নান করতে যাবে! চুল ঠিক করে বাথরুমে শাড়িটাড়িও রেখে এসেছে পিয়ন আসার আগে। এখন আর যেতে ইচ্ছা করছে না। কোলের 'পর প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করতে করতে বিছানাতেই বসে রইল। চুপ করে বসে রইলো। কিন্তু মন? সে তো চুপ করে বসে থাকতে জানে না, পারে না। সামান্য একটু হাওয়াতেই সিফন জর্জেট উড়তে থাকে। মনে পড়ে সেদিনের কথা।

সুপার মার্কেটের বাস স্টপে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ব্যানার্জীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চিত্রিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? আপনি এখানে?'

'বাসের জন্য অপেক্ষা করছি।'

'কোথায় যাবেন?'

'কোথায় আবার? সুব্রত পার্কে ফিরব।'

'তা এখানে কেন? আসুন আমার সঙ্গে।'

চিত্রিতার কথামতো ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এগুতেই বাস স্টপের লোকজন সবস দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে রইল। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে। একটু পরেই ব্যানার্জী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

'আমিও বাড়ি ফিরব।'

'এদিকে বুঝি বেড়াতে এসেছিলেন?'

'না, না। গানের ক্লাস করতে এসেছিলাম।'

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট চিত্রিতার মুখের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল, 'সুব্রত পার্ক থেকে কনট প্লেস?'

চিত্রিতাও একটু হাসল। 'হ্যাঁ।'

'এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার ভালো স্কুল আছে বুঝি?'

'দিল্লীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার কোনো ভালো স্কোপ নেই বললেই চলে...'

'তাহলে?'

'আমি গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। ক্লাসিক্যাল শিখছি।'

'হঠাৎ টপ্‌পা—ঠুংরীর প্রেমে পড়লেন?'

চিত্রিতা আবার একটু হাসে। 'মা-র হুকুম তামিল করছি।' মনে মনে ভাবে পরশুদিন রাত্রে যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন ভাবতে পারেনি উনি এত সুন্দর কথা বলতে পারেন।

'আপনার মা বুঝি ক্ল্যাসিক্যালের ভক্ত?'

স্টেটস্‌ম্যানের মোড় পার হয়ে চিত্রিতা জবাব দেয়, 'না, তা নয়। মেনলি গলা ভালো হবে বলেই মা ক্ল্যাসিক্যাল শিখতে বললেন।'

'আপনার গলা যথেষ্ট ভালো। আর ভালো হবার দরকার নেই।'

জনপথের মোড়ে থমকে দাঁড়িয়ে চিত্রিতা হাসিমাখা ফ্লাইট লেফটেন্যান্টের দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'তাই নাকি?'

'অব কোর্স!'

সিফন জর্জেটের প্যাকেটটা পেয়ে সব-কিছু মনে পড়ছে চিত্রিতার। মনে পড়ে মেল ট্রেন মাঝে মাঝে হঠাৎ ছোট্ট স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়লে ভারি ভালো লাগে। অনেক দিন পর্যন্ত ভোলা যায় না স্টেশন মাস্টারের মুখখানা। বার বার মনে পড়ে রেল-কোয়ার্টারের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা স্টেশন মাস্টারের স্ত্রীর বিবর্ণ বিস্মিত মুখের ছবি। বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়ে অনেক সময় বরের চাইতে একজন বরযাত্রীর কথা বেশিদিন মনে থাকে।

•

গ্রুপ ক্যাপ্টেন ঘোষ আর স্কোয়ার্ডন লীডার রায়ের কোয়ার্টার প্রায় পাশাপাশি। গ্রুপ ক্যাপ্টেন কমান্ড হেড কোয়ার্টাসে আর স্কোয়ার্ডন লীডার পালামে পোস্টেড। তা হোক: পরিচয় বহু দিনের। সম্পর্ক নিবিড়। এই গ্রুপ ক্যাপ্টেন যখন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তখন চিত্রিতার জন্ম। চৈতালী যখন খুব ছোট্ট, তখনই রায় কাকুর সঙ্গে মাধুরী মাসীর বিয়ে হয়। আবার মিঠু যখন হয় তখন চিত্রিতারাও আগ্রায়। মিঠু হবার পর মাধুরী মাসীর শরীরটা বেশ খারাপ। মাধুরী মাসী ওর কিছুই দেখাশুনা করতে পারত না। মিঠু চিত্রিতার মার কাছেই থাকত। দিন রাত। তাই তো মিঠু ওকে বড়-মা বলে। মিঠু আজ কত বড় হয়ে গেছে ; তবু বড়-মার কাছে আব্দার করতে সঙ্কোচ নেই।

অনেক কাল পরে আবার দুটি পরিবার দিল্লিতে। সুব্রত পার্কে প্রায় পাশাপাশি কোয়ার্টার। ভারি মজা। চিত্রিতার মা আর মাধুরী মাসী পালামের ফেটে'তে একসঙ্গে স্টল খুলছেন, লুচি-আলুর দম বিক্রি করছেন। আবার রবিবার সকালে দুজনে একসঙ্গে ডিলাইটে সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' দেখছেন। আরো কত কি! দুর্গাপূজার সময় আর কেউ না গেলেও ওঁরা দুজনে ঠিক সারা রাত জেগে শ্রীমতী অপেরার যাত্রা দেখবেনই। চৈতালীকে না হলেও চিত্রিতাকে ওঁরা দলে টানতে চান। বিশেষ করে মাধুরী মাসী। 'কিরে চিত্রা, যাবি নাকি যাত্রা দেখতে?'

'না মাসী, যাত্রা দেখার কথা বোলো না।'

'কেন রে?'

'যাত্রা-টাত্রা আমার ভালো লাগে না।'

'যাত্রা কোনোদিন দেখেছিস?'

'না!'

'তাহলে ভালো লাগবে না কি করে জানলি?'

চিত্রিতা হাসতে হাসতে বলে, 'সাবা রাত ধরে রাজা-রানি ষাঁড়ের মতো চেঁচাবে আর মন্ত্রীরা টিনের তলোয়ার ঘোরাবে, তা আমি সহ্য করতে পারব না।'

ওর কথা শুনে মাধুরী মাসীও হাসে। 'হাজার হোক কলেজ গার্ল তো! গ্রেগরি পেক বা রিচার্ড বার্টনকে না দেখলে ঠিক মন ভরে না তোদের।'

দুই ফ্যামেলির জয়েন্ট সেসন বসলে চিত্রিতার যাত্রা না দেখার কথা উঠবেই। সব কিছু শোনার পর স্কোয়ার্ডন লীডার রায় আবার সঙ্গে সঙ্গে একটা কবিতা তৈরি কবে বলেন,

আমাদের চিত্রা
দেখে না যাত্রা।
খায় শুধু কেক
পছন্দ করে গ্রেগরি পেক!
চুরি করে মটন
ভালোবাসে বার্টন
গাইতে পারে গান
আর আছে অভিমান।

কবিতার প্রত্যেকটি লাইন পর্যন্ত স্পষ্ট মনে পড়েছে চিত্রার। মনে পড়বে না? রক্তরাঙা কৃষ্ণচূড়ার মতো সেসব দিনের স্মৃতি জ্বল জ্বল করছে মনের মধ্যে। রোজ মনে পড়ে না। মনে পড়তে পারে না। নতুন জীবনের জোয়ারে পুরনো স্মৃতিব পলিমাটি পড়ছে। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। স্মৃতির সূর্য মনের আকাশে উঠলেই নতুন পলিমাটিতে ফাটল ধরে। চাপা পড়া সুখ-দুঃখের মিষ্টি মধুব ইতিহাস আবার মুখোমুখি দাঁড়ায়।

জনপথ পার হয়ে এল-আই-সি গ্রাউন্ডের পাশ দিয়ে পার্লামেন্ট স্ট্রিটের দিকে এগুতে এগুতে চিত্রিতা ফ্লাইট লেফটেন্যান্টকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি বুঝি সিনেমা দেখতে গিয়ে টিকিট পেলেন না?'

'মোটেও সিনেমা দেখতে আসিনি। অফিস ছুটির পরই এক বন্ধু জোর করে কফি হাউসে নিয়ে এলো।' একটু থেমে বলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

চিত্রিতা দুষ্টুমি করে জিজ্ঞাসা কবল, 'ভয় করছে? নাকি সন্দেহ হচ্ছে?'

'আমাকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে?'

চিত্রিতা ওকথার কোনো জবাব না দিয়ে বলল, 'আমি আপনাব মতো ভালো ফাইটার পাইলট না হলেও খারাপ ন্যাভিগেটর নই। ঠিক বাড়িতে পৌঁছে দেব।'

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ভারি মজা হল!

'জান মাসি, আজ আর একটু হলেই পালামে হৈ চৈ পড়ে যেত।'

মাধুরী মাসী উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল, 'কেন রে? কি হয়েছিল?'

গ্রুপ ক্যাপ্টেন ঘোষ মেয়ের কথায় অবাক হয়ে স্কোয়ার্ডন লীডার রায়ের দিকে তাকালেন।

চিত্রিতা বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'ফ্লাইং এয়ারক্রাফট্ মিসিং হয কিন্তু আজ এয়ারক্রাফট্ ছাড়াই পাইলট মিসিং হচ্ছিল।'

ওর কথা কেউ বুঝল না। সবাই হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রইল। মাধুরী মাসীই আবার প্রশ্ন করল, 'তার মানে?'

'তোমাদের ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আজ মিসিং হচ্ছিলেন। শুধু আমার মতো ন্যাভিগেটরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ায়...'

চিত্রিতার কথা শেষ হতে দেয়নি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। মিসেস রায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বৌদি শুনেছেন আজকাল কটন প্লেসে বহু ইয়ং মেয়ে ছেলেদের ব্ল্যাকমেল করছে?'

সিফন জর্জেটের প্যাকেটটা নিয়ে চিত্রিতা স্থির হয়ে বসে আছে। কিন্তু বিবর্ণ উদাস মন? ছাব্বিশ নম্বর লেক অ্যাভিনিউ থেকে ছুটে চলে গেছে দিল্লির সুব্রত পার্কে। পালামের রাস্তার ধারে এয়ার ফোর্স অফিসার্স কলোনীতে। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ব্যানার্জী মাত্র এক মাসের টেম্পোরারি ডিউটিতে এয়ার হেড কোয়ার্টার্সে এসেছিল। চিত্রিতা কলকাতায় বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে দিল্লি এসেছে। হাতে অফুরন্ত সময়। শুধু সপ্তাহে তিন দিন গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে যাতায়াত। চৈতালীর সঙ্গে তেঁতুলের আচার চুরি করে খাবার পর বাকি সময়টা মাধুরী মাসীর কাছে কাটায়। ঠিক সেই সময়েই ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এলো মাধুরী মাসীর কাছে। এখানে না এসে উপায় ছিল না ওর। স্কোয়ার্ডন লীডার ভীষণ রেগে যেতেন। তাছাড়া মিঠু তো আছেই। আম্বালায় কাকার স্কুটারে চড়ে ঘুরে না বেড়ালে মিঠু কিছুতেই খেতো না। তাছাড়া ঐ কাকু যে ওকে সুর করে কবিতা শোনাত! মিঠুকে ছেড়ে সেই কাকু দিল্লিতে কোথায় থাকবে?

ভাবতে গিয়েই চিত্রিতা হাসে। বিশেষ কিছুই না। নিছক একটু হাসি-ঠাট্টা গল্প-গুজব। মাঝে মাঝে গান। মাঝে মাঝে মন্তব্য। শরতের আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ। মনটা খুশিতে ভরে যায়।

মাধুরী বৌদি ফ্লাইট লেফটেন্যান্টকে বললেন, 'চিত্রার গান তোমার যখন এত ভালো লাগে তখন কয়েকটা গান টেপে তুলে নিলেই পার।'

'তা হয় না বৌদি।'

চিত্রিতা বলল, 'টেপ করার যোগ্য নয় বলে।'

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট একটু হেসেই গম্ভীর হল। 'ওর গান তোমাদের সবার সামনে শোনার অধিকার থাকলেও লুকিয়ে একা একা শোনার অধিকার আমার নেই।'

মাধুরী বৌদি হঠাৎ বলে ফেললেন, 'কেন, সে অধিকার চাও?'

লজ্জায় চিত্রিতা ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লজ্জা পেয়েছিল ব্যানার্জীও। তাই তো পরের দিন আবার ও সুপার মার্কেটের বাসস্টপে না দাঁড়িয়ে পারেনি। চিত্রিতা

বুঝেছিল ও কিছু বলতে চায়।

'আজও কি কফি হাউসে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ!'

'আজও কি বাসের জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন?'

'না। ন্যাভিগেটরের জন্য।'

'আমার মতো হাতুড়ে ন্যাভিগেটর দিয়ে আপনার মতো কোয়ালিফায়েড পাইলটের কোনো উপকার হবে কি?'

'যেটুকু পথ চিনিয়েছেন তাতেই আমি খুশি। আর ভবিষ্যৎ? সে আমারও হাতে নয়, আপনারও হাতে নয়।'

আরো দু'চারটে টুকটাক কথার পর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বলল, 'কাল রাত্রে যা বলেছিলাম তা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি। মনে কিছু করবেন না।'

চিত্রিতা কিছুক্ষণ মুখ নীচু করে চুপচাপ থাকার পর বলল, 'না না, কিছু মনে করিনি।'

'কিছু মনে না করলেও লজ্জা পেয়েছিলেন, কিন্তু আপনাকে লজ্জা দেবার অধিকারও তো আমার নেই।'

এই পৃথিবীতে প্রায় সবাই নিত্য নতুন অধিকার চায়। দাবি জানায়। অথবা মনে মনে আশা করে। স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ফ্লাইট লেফটেন্যান্টের মতো ক'জন অধিকার ছাড়তে পারে? দাবি করার সুযোগ পেয়েও নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে?

যারা হাত পাতে, দাবি জানায়, তাদের প্রত্যাখ্যান করা যায়। কিন্তু যারা নিজের জন্য কিছু চায় না, দাবি জানায় না, তাদের জন্য অনেকেরই মন ব্যাকুল হয়। হয়তো চিত্রিতারও হয়েছিল। বুঝতে পারেনি। হঠাৎ এতদিন পর মনটা বেদনায় ভরে গেল। পুরনো দিনের হিসেবের খাতা ওল্টাতে গিয়ে চিত্রিতা যেন আবিষ্কার করল ঋণের বোঝা শোধ করা হয়নি।

এখন উপায়?

ছাব্বিশ নম্বর লেক অ্যাভিনিউয়ের দোতলার ফ্ল্যাটের বেডরুমে বসে আর তো সে ঋণ শোধ করা যাবে না। কখনও যায় না। ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। কোনো রাস্তা নেই। ব্যাঙ্কে টাকা থাকলেই কি চেক কাটা যায়? চিত্রিতার সব কিছুই তো ফিক্সড ডিপোজিট আর সেফ ডিপোজিট ভল্টে। সব সম্পদই ওর, কিন্তু চাবিকাঠি তো ওর কাছে নেই। চুরি করতে পারে সে চাবিকাঠি। কিন্তু তবুও তো ঋণের বোঝা নামাবার উপায় নেই। ও নেবে কি সে সম্পদ?

কিছুতেই না। অসম্ভব। কল্পনাতীত।

'কি ব্যাপার? এতদিন পর আবার সুপার মার্কেটের এখানে দাঁড়িয়ে?'

'এয়ার হেড কোয়ার্টার্সের কাজ শেষ হয়ে গেল তাই।'

বড় বেসুরো লাগল চিত্রিতার কানে। কথাটা শেষ করতে দিতেও পারল না।

'হ্যাঁ। এক মাস হয়ে গেল।'

বারাখাম্বা। তারপর পার্লামেন্ট স্ট্রিট।

কথা বলা হল না কারুরই। তবু যেন দুজনেই অনেক কথা শুনেছিল।

'কাল ভোরেই চলে যাচ্ছি।'

'কাল ভোরেই?'

'হ্যাঁ।'

রিগ্যাল সিনেমা, খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবন, আরউইন রোড।

রাস্তা পার না হয়ে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জিজ্ঞাসা করল, 'আজও কি সোজা বাস স্ট্যান্ডে যাব নাকি ডান দিকে ঘুরব।'

'চলুন।'

বেশিক্ষণ নয়, বেশি দূরেও নয়। ইনার সার্কেলে সামান্য সময়ের জন্য দুজনে ঘুরেছিল।

'আপনার জন্য বেশ কাটল ক'টা মাস।'

মুখ নীচু করে চিত্রিতা বলল, 'আমি আর আপনার জন্য কি করলাম?'

'এত গান শোনাবার পরও বলছেন কি আর করলেন?'

'খুব শুনিয়েছি।'

'সত্যিই বলছি খুব ভালো লেগেছে আপনার গান। অনেক দিন মনে থাকবে।'

আবার চুপ করে থাকে দুজনেই। কথা বলতে পারে না।

হঠাৎ একটু থমকে দাঁড়িয়ে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বলল,' একটা অন্যায় অনুরোধ করব?'

'আপনি অন্যায় অনুরোধ করবেন কেন?'

'কেন জানি না তবে করব! করতে ইচ্ছে করছে।'

'আপনাকে হয়তো খুব বেশি চিনি না। তবে যতটুকু চিনেছি তাতে মনে হয় অন্যায় অনুরোধ আপনি করবেন না।'

'সত্যি বলছি অন্যায় অনুরোধ করব। রাখবেন?'

'আচ্ছা বলুন তো।'

'রাখবেন তো?'

চিত্রিতা হাসে, 'আচ্ছা রাখব।'

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সিফন জর্জেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলে ফিরিয়ে দিতে পারে নি। কোনো কথা না বলে হাতে তুলে নিয়েছিল। এমন কি ধন্যবাদ পর্যন্ত জানাতে পারে নি।

'সব কিছুই তো সবাই জানলেন। শুধু এই সিফন জর্জেটের কথাটুকু আমাদের থাক।'

চিত্রিতা জানাতে পারেনি। মাকে বলেছিল, 'গানের ক্লাসের এক বন্ধু দিয়েছে।' সেদিন বাড়ি ফিরেই ওই সিফন জর্জেটটা পরে ছুটে গিয়েছিল মাধুরী মাসীর কাছে। 'মা, মাসীকে শাড়িটা দেখিয়ে আসি।'

স্কোয়ার্ডন লীডার রায় ড্রইংরুমে বসে ফ্লাইট লেফটেন্যান্টের সঙ্গে গল্প করছিলেন। ঝড়ের বেগে চিত্রিতা ড্রইংরুমে ঢুকেই এদিক ওদিক দেখল। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট একবার মুগ্ধ হয়ে দেখল। স্কোয়ার্ডন লীডার কিছু বুঝতে পারলেন না।

'কাকু, মাসী কোথায়?'

'ও বোধহয় মিঠুকে খেতে দিচ্ছে।'

মাসীও চমকে উঠেছিল। 'আঃ! কি লাভলি তোকে দেখাচ্ছে রে!'

মাসী চিত্রিতাকে সঙ্গে নিয়ে ড্রইংরুমে এসে স্কোয়ার্ডন লীডারকে বললেন, 'দেখছ, সিফন জর্জেটটা পরে চিত্রাকে কি দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে।'

স্কোয়ার্ডন লীডার কিছু বলার আগেই ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বলল, 'তাই বলে সিফন জর্জেট পরলে তোমাকে মানাবে না।'

'বেশি রাগালে হাটে হাঁড়ি ভাঙব কিন্তু।'

বিয়ের পর পুরনো শাড়ি কোনো মেয়েই পরে না, ভালো হলেও না। তখন পুরনো জিনিস ভালো হলেও বর্জনীয়। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তা জানে। তবুও চৈতালীকে সিফন জর্জেটটা পরতে দেখে মনে মনে বড় অতৃপ্তি বোধ করল। অসহ্য লাগল। চিত্রিতার চাইতে চৈতালীকে দেখতে আরো ভালো কিন্তু ফ্লাইট লেফটেন্যান্টের চোখে খারাপ লাগল। বড় বেমানান বলে মনে হলো।

হিন্দনে ট্রান্সফার হবার পর প্রত্যেক উইক এন্ডে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সুব্রত পার্কে আসত। হঠাৎ চৈতালীর আসা-যাওয়া বাড়তেই ও আসা বন্ধ করে দিল। কিন্তু কেউ বুঝল না, জানল না। মাধুরী বৌদি টেলিফোন করলেই বলে ভীষণ ব্যস্ত।

তারপর একদিন ব্যানার্জী হঠাৎ নিজেই টেলিফোন করল, 'বৌদি, তোমার ওখানে আমার যে স্যুটটা রয়েছে, ওটা কাচিয়ে রেখো তো।'

'আচ্ছা রাখব।'

'আর ওর পকেটে একটা নতুন ডায়েরি আছে। ওটা কিন্তু একটু সাবধানে রেখো।'

'রাখব কিন্তু তুমি আসছ কবে?'

'সামনের রবিবারেই আসব।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

কল্যাণীয়া চিত্রা,

তোর বিয়ের পর এই প্রথম তোকে চিঠি লিখছি। ভাবতে পারিনি প্রথম চিঠিতেই একটা মারাত্মক খবর দিতে হবে। আজ সকালে হিন্দনে ফ্লাইং অ্যাকসিডেন্টে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মারা গেছে। ঠিক ভাবতে পারছি না কি হয়ে গেল। ওর একটা স্যুট আমার কাছে ছিল। ড্রাই ক্লিন করতে দিয়েছি। রবিবার নিয়ে যাবার কথা। কোটের পকেটে একটা নতুন ডায়েরি ছিল। বলেছিল সাবধানে রাখতে। রেখেছিলাম। এতদিন ডায়েরিটা আলমারিতেই ছিল, কিন্তু আজ ওটা না দেখে পারলাম না। ডায়েরির একটা পাতাতেও কিছু লেখা নেই। গত বছর এপ্রিলে সুপার মার্কেট থেকে কেনা একটা সিফন জর্জেটের ক্যাশ মেমো ছাড়া আর কিছু ঐ ডায়েরিতে নেই। তোকে না লিখে পারলাম না। তুই আমাকে ক্ষমা করিস।

তোর মাধুরী মাসী

প্রথম নায়িকা

কে স্বপ্ন দেখে না?

সবাই স্বপ্ন দেখে। শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে। সব শিশুই স্বপ্ন দেখে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে মেঘের রাজ্য জয় করার দু'দিন পর স্বপ্ন দেখে, রেলগাড়ির ইঞ্জিন চালাবার বা উড়োজাহাজ নিয়ে উড়ে বেড়াবার।

স্বপ্ন বদলে যায় কৈশোরে, বদলে যায় যৌবনে। যৌবনে স্বপ্নের মিছিল আসে। তখন চোখে কত রকমের কত স্বপ্ন। মনে কত আশা।

স্বপ্ন দেখার শেষ নেই প্রৌঢ়ত্বে, বার্ধক্যেও। তখন নাতি-নাতনীকে নিয়ে মানুষ স্বপ্ন দেখে; স্বপ্ন দেখে সুখের সংসার রেখে বিদায় নেবার। হয়তো আরো কত কি।

মনীশও স্বপ্ন দেখেছে। সেই স্কুলে একটু উঁচু ক্লাসে ওঠার পর থেকেই ওর চোখে এক স্বপ্ন। সাহিত্যিক হবে। সেই এক স্বপ্ন বুকে নিয়েই কলেজের দিনগুলো কাটিয়ে এম. এ. পড়তে শুরু করল।

—কী মনীশ, কী নিয়ে পড়ছো?

ডাক্তারবাবুর প্রশ্ন শুনে মনীশ একটু হেসে বলে, বাংলা নিয়ে পড়ছি।

—বাংলা নিয়ে? ডাক্তারবাবু যেন ইলেকট্রিক শক্ পান। ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেন, একি বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের যুগ যে বাংলা নিয়ে এম এ. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই...।

মনীশ আর শুনতে চায় না। বলে, আমি বরাবরই ঠিক করেছিলাম, বাংলা নিয়ে পড়ব।

—তারপর কী করবে?

মনীশ জবাব দেবার আগেই ডাক্তারবাবু বলেন, বাংলায় এম. এ. পাশ করে হয় স্কুলে মাস্টারি, নন হয় কলেজে...। উনি পুরো কথাটা শেষ না করেই একটু থেমে বলেন, তুমি এত ভালো ছেলে হয়েও কেন যে সায়েন্স নিয়ে পড়লে না, তা ভেবে পাই না।

শুভাকাঙ্ক্ষী হলেও ডাক্তারবাবুর কথায় মনীশ দুঃখ পায়। স্বপ্নরাজ্যের রাজপ্রাসাদের একটা পাথর খসে পড়ে। তবে মনে মনেই ডাক্তারবাবুকে জবাব দেয়, সবাই কী ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ার হতে পারে? না কি হওয়া উচিত? সবাই যদি ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ার হয়, তাহলে সমাজ চলবে কী করে? কারা স্কুল-কলেজে পড়াবে? অফিসের কর্মী আসবে কোথা থেকে? কোর্ট-কাছারিতে মামলা-মোকদ্দমা সামলাবে কারা?

ইউনিভার্সিটির ক্লাস শেষ হবার পর মনীশ কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। বইয়ের

দোকানগুলো দেখে আর মনে মনে ভাবে, একদিন নিশ্চয়ই ওর বই দিয়ে এই দোকানগুলো সাজানো হবে। ওর বই পড়ে মুগ্ধ হবে হাজার হাজার পাঠক-পাঠিকা। প্রতিদিন কত চিঠি আসবে ওদের কাছ থেকে।

তারপর?

আমন্ত্রণ আসবে সভা-সমিতি থেকে। ওকে দেখার জন্য উপচে পড়বে ভীড়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওরা ওর কথা শুনবে।

তারপর?

হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ঘিরে ধরবে ওর অটোগ্রাফের জন্য, ছবি তোলার লোভে।

স্বপ্ন দেখতে দেখতে মনীশ একটু হাসে। হাসবে না। সুন্দরী শিক্ষিতা ধনীর দুলালী মনপ্রাণ-দেহ সমর্পণ করতে চাইলে হাসি পাবে না?

তারপর হঠাৎ ঝড় ওঠে। ভেঙে চুরমার হয়ে যায় সব স্বপ্ন। এমন কি পায়ের তলার মাটিও যেন সরে যায়। লেখাপড়া শেষ না করেই মনীশ চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

এখন ওর চোখে নতুন স্বপ্ন—চাকরি চাই! বাঁচতে হবে। বাঁচাতে হবে সদ্য বিধবা মাকে, ভাইবোনকে।

আ

হেমন্ত-বসন্তের মতো গ্রীষ্ম-বর্ষাও তো চিরস্থায়ী নয়। দুপুরের ডাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েই মনীশ আনন্দে খুশিতে চিৎকার করে ওঠে, মা, চাকরি পেয়েছি।

মা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি জানতাম, চাকরি তুই পাবিই। দু'দিন আগে বা দুদিন পরে কিন্তু...

আঁচলের কোণা দিয়ে মুখ চেপে ধরে চাপা কান্না কাঁদতে কাঁদতে উনি বলেন, তোর বাবা তো নিজে মরলেন না, তোর ভবিষ্যৎটাও মেরে গেলেন।

মনীশ ওর মাকে জড়িয়ে একটু হাসতে হাসতে বলে, কে বলল, আমার ভবিষ্যৎ নেই? যারা দুঃখে-কষ্টে অতি সাধারণভাবে জীবন কাটায়, তারাই তো সত্যিকার সাহিত্যিক হয়।

—সারাদিন কেরানিগিরির পর তুই আবার লেখালেখি করবি, তাহলেই হয়েছে!

—হ্যাঁ মা, সারাদিন কেরানিগিরি করার পরই আমি লিখব।

—আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করিস না।

—না মা, আমি তোমাকে ভোলাচ্ছি না ; সত্যি কথাই বলছি।

না, মনীশ মাকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়নি। ডালহৌসী পাড়ার স্টিফেন হাউসের এই অফিসে বসে সারাদিন কলম পিষতে পিষতেও ও স্বপ্ন দেখে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, ডালহৌসী পাড়ার জনারণ্যে হারিয়ে যাবে না কিন্তু তবু ভেসে যায় দায়িত্ব-কর্তব্য আর পরিবেশের চাপে। জোয়ারে।

ওকে বাজার-হাট করতে না হলেও দুই ভাই-বোনের পড়াশুনা দেখতে হয়, দেখাতে হয়। তাছাড়া টুকটাক এখানে-ওখানে যেতেই হয়। বাবা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তো সামাজিক দায়-দায়িত্ব শেষ হয়নি! আজ বুড়ি মাসীর মেয়ের বিয়ে, কাল রাঙা পিসীর

্লের বিয়ে বা বড় মাসীর নাতির অন্নপ্রাশন তো লেগেই আছে। যেমন সময় নষ্ট ্মনি টাকার শ্রাদ্ধ। তবু মুখে হাসি নিয়ে মনীশকে এইসব দায়িত্ব পালন করতে হয়।

অফিসেও একটা না একটা কিছু লেগেই আছে। সামনের মাসে ত্রিদিববাবুর টায়ারমেন্ট। তাই শনিবার তার বিদায় সংবর্ধনা। ও মাসের প্রথম শনিবার ফুলেশ্বরে ্কনিক। পিকনিক থেকে ফিরে আসতে না আসতেই জয়ন্ত মুচকি হেসে একটা কার্ড ্গিয়ে দিল।

খামের উপর প্রজাপতির ছবি দেখেই মনীশ জিজ্ঞেস করে, কার বিয়ে? তোমার?

—না, আমার ছোট বোনের।

—ও! তাই নাকি? এক মুহূর্তের মধ্যে মনীশ ভেবে নেয়, তাহলে এ বিয়েতে না ালেও চলবে।

জয়ন্ত একটু থেমে বলে, ভাই, আমার বাবা নেই। আমিও সব চাইতে বড়। সব যিত্বই আমার। তাই তোমরা সবাই না হলে হয়তো বিপদে পড়ে যাব।

মনীশ সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বলে, কিছু চিন্তা কবো না। তোমার ানের বিয়ে মানে তো আমাদেরও বোনের বিয়ে।

আরো কত কি! আজ এক অসুস্থ সহকর্মীকে হাসপাতালে দেখতে যাবো তো ্গামীকাল পাশের টেবিলের বিকাশবাবুর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি।

প্রচণ্ড কাজের চাপের উপর এসব উপরি পাওনা। সরকারি অফিস না যে এগারটায় ্সে চারটেয় চলে যাও। মাঝে ঘণ্টাখানেক টিফিনের ছুটি। ঠিক সাড়ে ন'টায় অফিস ্তে হয়। সাড়ে পাঁচটায় ছুটির কথা কিন্তু অধিকাংশ দিনই সাড়ে ছ'টাব আগে বেরুতে ্রে না মনীশ।

তবে অফিস থেকে বেরিয়েই মনীশ বাড়ি ফেবে না। আপনমনে ঘুরে বেড়ায় লহৌসী-এসপ্লানেড বা ইডেন গার্ডেনের পাশে, গঙ্গার ধারে। বোমন্থন করে সারাদিনের ্তি।

এইভাবেই দিনগুলো কেটে যায়। শেষ হয় মাসের পর মাস। ঘুরে যায় একটি বছর। টুকটাক পড়াশুনা করলেও মনীশ কিছু লেখার অবকাশ পায়নি গত তিন বছরে। ্াৎ সেদিন রাত্রে খেয়াল হতেই ও চমকে ওঠে।

দিন সাতেক পরে মনীশ অফিস থেকে বেরিয়েই নিজে হাতে জি-পি-ওতে লেখাটা ্াস্ট করে দিল। মনে মনে ঠিক করল, যদি ছাপা হয়, তাহলে লিখবে ; হয়তো এই শেষ।

মনে মনে আশা করেছিল, মাসখানেকের মধ্যেই লেখাই ফেরত আসবে। অথবা...

...অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি, আপনার গল্পটি আগামী কোনো এক সংখ্যায় ্কাশিত হইবে এবং...

ভাবতে গিয়েও মনীশের হাসি পায়। ওর মতো লোকের প্রথম লেখাই যদি ছাপা ্, তাহলে আর কথা ছিল না। তাও আবার সর্বজনপ্রিয় 'স্বদেশ' পত্রিকায়।

লেখাটি অমনোনীত হবার চিঠি যদি কোনো কারণে মার হাতে পড়ে, সেই ভয়ে ্নীশ ছদ্মনামে লিখেছে। অমনোনীত হলে মা দুঃখ পাবেন। তাছাড়া অমনোনীত হবার ্ঠিটি যদি পিওন ভুল করে পাশের বাড়ি বা সামনের বাড়িতে বিলি করে, তাহলে

কে না ওকে উপহাস করবে? খারাপ খবর তো হাওয়ায় উড়ে যায়!

কিন্তু তিন মাস পরও মনোনীত বা অমনোনীত হবার কোনো চিঠি না পেয়ে মর্নী ভাবল, বোধহয় লেখাটি হারিয়ে গেছে। অথবা শত-সহস্র লেখার ভীড়ে লেখাটি চাপা প আছে। একবার ভেবেছিল, 'স্বদেশ' অফিসে গিয়ে খবর নেয় কিন্তু সাহসে কুলোয় নি

প্রতিদিনের কাজকর্ম দায়-দায়িত্বের চাপে মনীশ যখন লেখাটির কথা প্রায় ভুল বসেছিল, তখন একটা অঘটন ঘটে বসল।

ছুটির পর নীচে নামার জন্য লিফট্-এ চড়তেই পেছন দিক থেকে দুটি মেয়ে কথাবার্তা শুনে মনীশ চমকে ওঠে—আমি বলছি, এই স্টিফেন হাউসেরই কেউ এই লেখ লিখেছে।

—তার কোনো মানে নেই। এই বিল্ডিং'এ কী কম বাইরের লোক আসে?

—তা ঠিক কিন্তু এত নিখুঁত ছবি কি বাইরের কেউ লিখতে পারবে?

—যাই হোক লেখাটা চমৎকার। ভদ্রলোকের হাতটি ভারি মিষ্টি।

—আমারও দারুণ লেগেছে কিন্তু এই লেখকের লেখা আর কোথাও পড়েছি বলে মনে হয় না।

—না রে, আমিও কোনোদিন এর লেখা পড়িনি।

মনীশ ওদের কথাবার্তা শুনে উত্তেজনায় ছট্ ফট্ করে কিন্তু চঞ্চলতায় পেছন ফি তাকাতে পারে না।

—কিন্তু কোন মেয়েটিকে নিয়ে লিখেছে বলতো?

—এই বাড়িতে এত মেয়ে কাজ করে যে ঠিক ধরতে পারা মুশকিল।

—থার্ড ফ্লোর থেকে একটি মেয়ে লিফট্-এ ওঠা-নামা করে, তারা চেহারা হা ভাবের সঙ্গে...

অন্য মেয়েটি উত্তর দেবার আগেই লিফট্ নীচে পৌঁছে যায়।

মনীশ প্রায় পাগলের মতো ছুটে গিয়ে এক কপি 'স্বদেশ' হাতে নিয়ে সূচিপত্র দে আনন্দে খুশিতে ঝলমল করে ওঠে। এক কপি না, দু কপি না, চার কপি কাগজ কিন মাসের প্রায় শেষ। তবু মোড়ের মাথার নরেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে কুড়ি টাকার মি কিনে বাড়ি ঢুকল।

—নাও মা, মিষ্টি খাও। মনীশ হাসতে হাসতে বলে, বুলা আর কচিকেও দাও

—তা তো দেব কিন্তু হঠাৎ এত মিষ্টি আনলি কেন?

—ইচ্ছে হল, তাই আনলাম।

—তাই বলে এত মিষ্টি?

মনীশ হাসতে হাসতে বলে, বেশি তর্ক করলে তোমাকে একলা এইসব মিষ্টি খাই ছাড়ব।

পাঁচ-সাতদিন পর ও অফিস থেকে ফিরতেই মা বললেন, হ্যাঁরে, দুপুরের ডা তোর একটা প্যাকেট এসেছে। টেবিলের উপর রেখে দিয়েছি।

—ও! তাই নাকি?

মনীশ দৌড়ে ঘরে যায়। দেখে, দু'কপি পত্রিকা ছাড়াও সম্পাদক ছোট্ট একটা চিঠি ।খেছেন—আপনার লেখাটি ছেপে সত্যি আনন্দ পেয়েছি। পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে ।খাটির প্রশংসা করে কয়েকজন টেলিফোনও করেছেন। যাই হোক দু'-একদিনের মধ্যে কবার দেখা করলে ভালো হয়।

মনীশ আনন্দে খুশিতে বার বার চিঠিটা পড়ে। ইচ্ছে করে তখনই ছুটে যায় 'স্বদেশ' ফিসে কিন্তু না, যায় না। নিজেকে সংযত করে। পাঁচ-সাতদিন পরে যায়।

প্রবীণ সম্পাদক ওকে দেখেই অবাক—তোমার এত অল্প বয়স? আমি তো ভবেছিলাম, অন্তত পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ হবেই।

মনীশ হেসে বলে, আমি গত মাসেই পঁচিশে পড়েছি।

—হ্যাঁ। তাই তো দেখছি। সম্পাদক একটু হেসে বলে, কিন্তু এই বয়সেই তোমার ।খার বেশ মুন্সীয়ানা আছে। তাছাড়া তোমার হাতটি খুব মিষ্টি।

মনীশ শুনে খুশি হয় কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

—তা তুমি কতদিন ধরে গল্প লিখছো?

প্রথম গল্পই আপনাকে পাঠিয়েছি।

—তাই নাকি?

সম্পাদক বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, আশ্চর্য! তোমার প্রথম ।খাই এত ভালো! একটু থেমে উনি বললেন, বিয়াল্লিশ বছর এই কাগজ চালাচ্ছি! নেক লেখক-লেখিকা দেখলাম! সেই অভিজ্ঞতা থেকে তোমাকে বলতে পারি, যদি মি ফাঁকি না দাও, তাহলে তুমি বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক হবেই।

—ফাঁকি দিলে আপনি আমাকে শাসন কববেন!

উনি হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, লেখকের খ্যাতি-যশ হলে কি তিনি ম্পাদকদের পরোয়া করেন?

ওর কথা শুনে মনীশ অবাক হয়। বলে, আশা করি আমি কোনোদিনই আপনার তামতকে উপেক্ষা করব না।

—আচ্ছা ওসব বাদ দাও। এবার কাজের কথায় আসি।

মনীশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়।

সম্পাদক প্রশ্ন করেন, তোমার কী উপন্যাস লেখার কোনো পরিকল্পনা আছে?

মনীশ একটু হেসে বলে, আমার দু'টো উপন্যাস লেখা আছে কিন্তু ভয়ে কাউকে ঠাইনি।

—কীসের ভয়?

—যদি কেউ না পড়েই ফেলে দেন।

সম্পাদক একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, আমি যে সব লেখাই পড়ি, তার প্রমাণ তা পেয়েছ।

মনীশ একটু হেসে বলে, সে তো একশ বার।

—কালই দু'টো উপন্যাস আমাকে দিয়ে যাও। আমি পড়ে দেখি।

—ঠিক আছে; আমি কালই নিয়ে আসব।

—হ্যাঁ আর একটা কথা।

—বলুন।

—তুমি কি বিশেষ কোনো কারণে ছদ্মনামে লিখেছ?

মনীশ আবার একটু হেসে বলে, ভয়ে ভয়েই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছি।

—তুমি নিজের নামেই লেখো। ছদ্মনাম কী দরকার?

—তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

সম্পাদক বলেন, হ্যাঁ, সেই ভালো, ছদ্মনাম ব্যবহার করে অযথা লেখক আর পাঠকে মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে লাভ কী?

মনীশ স্বপ্নেও ভাবেনি, স্টিফেন হাউসের এক অখ্যাত অফিসের কেরানিগিরি কর জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠ পাঠিকামহলে এক আলোড়ন সৃষ্টি করবে। চারদিকে খুশির বন্যা। মনীশ খুশি ; মনী মা খুশি; খুশি ওর দুই ভাইবোন। খুশি ওর প্রত্যেকেটি সহকর্মী। গর্বিতও।

জয়ন্ত ওর ছোটবোনের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বলে, ঐ যে বিয়ের দিন যে পরিবেশন করেছিল, সেই তো মনীশ ব্যানার্জী।

ঘরের সবাই বলেন, তাই নাকি?

জয়ন্ত গর্বের হাসি হেসে বলে, হ্যাঁ। ও তো আমার ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড।

হেড ক্লার্ক গিরীশবাবু সবার সামনেই বলেন, সারাজীবন এই স্টিফেন হাউ কেরানিগিরি করছি বলে দুনিয়ার সবাই ঘেন্না করতো কিন্তু মনীশের দয়ায় এখন বাজা আমাদের প্রেস্টিজ বেড়ে গেছে।

মনীশ বলে, গিরীশদা, প্লীজ ঐ দয়া-টয়া বলবেন না।

—সে না হয় নাই বললাম কিন্তু তুমি যে আমাদের প্রেস্টিজ বাড়িয়ে দিয়েছ, বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই।

পিছন দিক থেকে শ্যামল আর অজিত প্রায় এক সঙ্গেই বলে, ঠিক বলেছেন গিরীশদ

কোম্পানির মালিক মিঃ চৌধুরী শুধু এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট শিপিং-ফ্রেট এল-সি লা লোকসান ছাড়া কোনোদিন কোনো কথা বলেননি। তাছাড়া গিরীশদার মতো প্রবী কর্মীও ওর মুখে কোনোদিন হাসি দেখেননি। সেই মিঃ চৌধুরী নিজের চেম্বারে ঢোক আগে এক গাল হাসি হেসে মনীশদাকে বলেন, আমার স্ত্রী আর দুই মেয়ে তো তোম রীতিমত ভক্ত হয়ে উঠেছে। একদিন তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবো।

মনীশ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, হ্যাঁ স্যার, নিশ্চয়ই যাবো।

চৌধুরী সাহেব নিজের চেম্বারে ঢুকে যেতেই গিরীশদা মুচকি হেসে বলেন, দেখ তো মনীশ, তোমার জন্য বড় সাহেবের মনোভাবও কেমন বদলে গেছে। আগে উ এ ঘর দিয়ে যাবার সময় আমাদের কারুর মুখের দিকেও চেয়ে দেখতেন না।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বলে, এ আর কী দেখছেন গিরীশদা। এর পর দেখবে বড়সাহেব মনীশের পাশের চেয়ারে বসে আপনাদের সবার সঙ্গে চা খাচ্ছেন।

—তা হতেই পারে। গিরীশদা কাজ করতে করতেই বলেন।

স্টিফেন হাউসের অন্যান্য অনেক অফিসের লোকজন মাঝে মাঝেই এ ঘরে ঢুকে ব

যান, মনীশবাবু, লেখাটা দারুণ হচ্ছে। মনীশ একটু হেসে বলে, ধন্যবাদ। লিফট্'এ ওঠা-নামার সময় অনেক মেয়ে-পুরুষই ওকে দেখে জিজ্ঞেস করে, ভালো আছেন তো? দু'চারজন মহিলা তো নিজেদের খুশি চেপে রাখতে পারেন না। ওকে দেখলেই বলেন, আমরা কিন্তু আপনার দারুণ ভক্ত হয়ে উঠেছি। মনীশ শুধু একটু হাসে কিন্তু এত মানুষের এত অভিনন্দন সত্ত্বেও যেন ওর মন ভরে না। এই স্টিফেন হাউসের যে মেয়েটিকে নিয়ে ও গল্প লিখে সাহিত্য জগতে প্রবেশাধিকার পেল, সে তো কোনোদিন কিছু বলল না ; এখনও মাঝে মাঝে লিফট্'এ ওঠানামার সময় দেখা হয় কিন্তু একবার দু'চোখ তুলেও তাকায় না। মনীশ মনে মনে ভাবে, ও কী জানে না আমি ওকে নিয়েই লিখেছি? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? ঐ মেয়েটি ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই সার্কুলার রেলের কামরায় দেখা হয়নি। নাকি ঐ মেয়েটি গল্প উপন্যাস পড়ে না? না, না, তা কখনই নয়। যদি সাহিত্য-টাহিত্য বিষয়ে কোনো আগ্রহই না থাকতো, তাহলে কী ওকে বইমেলায় দু'তিনদিন দেখি?

যাই হোক যত দিন যায়, তত ওর খ্যাতি ছড়ায়। বুলা বলে, জানো দাদা, আমাদের স্কুলের চার-পাঁচজন মিসরা তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য পাগল। কচি বলে, আমাদের লাইব্রেরিয়ান স্যার বলছিলেন, কী একটা ফাংশানে তোমাকে নিয়ে যাবেন।

মনীশ কিছু বলে না কিন্তু শুনে খুশি হয়।

ওর মা হাসতে হাসতে বলেন, তুই লিখছিস বলে কিছু কিছু মেয়ে তো আমার সঙ্গেই গল্প করতে আসে।

মনীশ হাসে।

—আজকাল আমি পথঘাটে বেরুলেই কিছু কিছু লোককে বলতে শুনি, ঐ যে মনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা যাচ্ছেন। উনি এক গাল হাসি হেসে বলেন, শুনে যে কি ভালো লাগে, তা বলতে পারব না।

'স্টিফেন হাউস' উপন্যাসটি শেষ হবার আগে থেকেই নানা পত্র-পত্রিকা থেকে লেখার অনুরোধ আসে। মনীশ সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে লেখে, চাকরি-বাকরি করে লেখার খুব বেশি সময় পাই না। সেইজন্য এখনই লেখা দিতে পারছি না কিন্তু ভবিষ্যতে সুযোগ মতো নিশ্চয়ই লেখা পাঠাবো। ঐ চিঠি পাবার পরও দু'চারটি পত্রিকার লোকজন বাড়িতে এসে হাজির হয়। অনুরোধ উপরোধ করে। ফিস ফিস করে বলে, দরকার হলে টাকাটা অ্যাডভান্সও দিতে পারি।

মনীশ বলে, না, না, তার দরকার হবে না। লেখা ছাপা হলেই টাকা দেবেন।

'স্বদেশ' সম্পাদকও মহা খুশি। উনি সবার সামনেই বলেন, মনীশের উপন্যাসের জন্য কাগজের ডিমান্ড এত বাড়বে, তা আমি ভাবতে পারিনি।

মনীশ জিজ্ঞেস করে, অন্য উপন্যাসটি কবে ছাপবেন?

—পূজা সংখ্যায়। উনি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অন্য কোনো পূজা সংখ্যায় লিখবে?

—কয়েকটা কাগজের থেকে বার বার বলছে কিন্তু আমি এখনই আর লিখতে চাই না।

—ভেরি গুড! সম্পাদক টেবিলের উপর জোরে একটা ঘুঁষি মেরেই বলেন, তাহলে দেখো আমি কী করি।

সত্যি, একজন নতুন লেখককে নিয়ে যে কোনো পত্রিকা এত হৈ চৈ করতে পারে, তা মনীশ কল্পনাও করতে পারেনি। মনীশের ছবি দিয়ে পোস্টার, মনীশের ছবি দিয়ে কলকাতার সব দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন। এর উপর সিনেমার স্লাইড আর রেডিও'তে বিজ্ঞাপন। পূজা সংখ্যা বেরুবার আগেই এমন অবস্থা দাঁড়ালো যেন মনীশ প্রায় ফিল্মের হিরো! পথেঘাটে ট্রামে-বাসে সবাই অবাক হয়ে ওকে দেখে। বাসের নিত্য সহযাত্রী বৃদ্ধরা বলেন, আরে, তুমি যে এত বড় লেখক, তা তো আমরা জানতামই না। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ওকে কাছাকাছি পেলেই অটোগ্রাফ চায়। বুলা আর কচি বলে, দাদা, তোমার জন্য স্কুলে আমাদের কী খাতির, তা ভাবতে পারবে না।

সব চাইতে মজা হয় স্টিফেন হাউসে। লিফট্'-এ ওঠার জন্য মনীশ লাইনে দাঁড়ালেই সবাই হৈ হৈ করে ওঠেন, আরে, আপনি আবার লাইনে দাঁড়াচ্ছেন কেন? যান উঠে যান।

দু' পাঁচ মিনিট লাইনে দাঁড়াতে কী আর এমন কষ্ট! আপনারা উঠুন।

কে কার কথা শোনে? সবাই প্রায় জোর করে ওকে লিফট্'এ ঢুকিয়ে দেয়।

আর চৌধুরী সাহেব?

উনি এখন রোজই মনীশের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব না করে নিজের চেম্বারে ঢোকেন না। তাছাড়া পুজোর ছুটির পর প্রথম অফিসে এসেই চৌধুরী সাহেব সবার সঙ্গে কোলাকুলির পর্ব শেষ করেই বললেন, গিরীশবাবু, আমি আপনাদের সবাইকে জানিয়ে একটা কথা বলতে চাই।

—হ্যাঁ স্যার বলুন।

—মনীশ ব্যানার্জীর জন্য আমরা সবাই গর্বিত, সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই।

গিরীশবাবু বললেন, সে তো একশ' বার।

—তাই বলছিলাম, আপনারা যদি আপত্তি না করেন, তাহলে আমি মনীশকে দু'শ টাকা স্পেশাল ইন্‌ক্রিমেন্ট দিতে চাই।

ঘর ভর্তি সবাই হাততালি দিয়ে ওকে সমর্থন জানালেন।

এবার মনীশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, এই আমার প্রথম চাকরি। আপনি তাড়িয়ে না দিলে বোধহয় আমি কোনোদিনই এ চাকরি ছাড়ব না।'

চৌধুরী সাহেব দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে বলেন, আরে, ছি, ছি! আপনাকে তাড়াব? আপনাকে তাড়ালে আমাকে আর এই স্টিফেন হাউসে ঢুকতে হচ্ছে না।

ওর কথায় সবাই হাসেন।

মনীশ বলে, স্যার, আমি এখন লিখেও কিছু আয় করতে শুরু করেছি। আপনি কাইন্ডলি শুধু আমাকে ইনক্রিমেন্ট দেবেন না।

—কিন্তু এ তো স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট! বছরের শেষে তো সবারই নর্ম্যাল ইনক্রিমেন্ট হবে।

—স্যার, আপনি সবাইকে দশ টাকা করে দিলেও...

চৌধুরী সাহেব ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, ঠিক আছে, আমি সবাইকে পঞ্চাশ টাকা করে স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট দিচ্ছি কিন্তু আপনাকে ঐ দু'শ টাকা।

—কিন্তু স্যার...

সবাই হাততালি দিয়ে চৌধুরী সাহেবের ঘোষণাকে অভিনন্দন জানালেন।

মনীশের চোখে হঠাৎ পৃথিবীর রঙ বদলে গেল। চারদিকে শুধু আলো আর আলো। ডালহৌসীর জনারণ্যে এমন যে আশাহীন অন্ধকারময় কেরানিগিরির জগৎ, সেখানেও আলো ছড়িয়ে পড়ল। হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে কর্মক্ষেত্রের ভেতরে ও বাইরে, অপরিচিতের অজানা মহলেও স্বীকৃতি আর ভালোবাসা। বাবার মৃত্যুর পর যারা একবারও এদিকে পা বাড়াননি, তারাও হঠাৎ এক বাক্স মিষ্টি হাতে নিয়ে আসতে শুরু করলেন—বিশ্বাস করুন বৌদি, আমি ভাবতেও পারিনি, আমাদের মনীশদাই এত পপুলার লেখক। খবরের কাগজ দেখে দীপা বলল, এ তো আমাদেরই মনীশদা।

মনীশের মা একটু শুকনো হাসি হেসে বলেন, সত্যই তো আপনারা জানবেন কী করে? দীপা কলেজে পড়ে বলেই এসব খবর ওরাই রাখে।

প্রলয়বাবু এক গাল হাসি হেসে বলেন, এক রবিবাব দীপাকে নিয়ে আসব। ও মনীশের সঙ্গে দেখা করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিয়ে আসবেন।

সন্ধের পর বাড়ি ফিরতেই ওর মা হাসতে হাসতে বলেন, হ্যাঁরে, তুই এবার থেকে আমাকে মাইনে দিবি।

—কী ব্যাপার? তোমাকে হঠাৎ মাইনে দেব কেন। মনীশও হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে।

—সারাদিন তোর সেক্রেটারিগিরি করছি আর মাইনে দিবি না? উনি একটু থেমে বলেন, তোর জন্য রোজ আমাকে কত লোকের সঙ্গে বক বক করতে হয় জানিস?

মনীশ ওর মার পাশে বসে জিজ্ঞেস করে, আজ আবার কে এসেছিল?

—তোর বাবার এক পুরনো সহকর্মী প্রলয় চ্যাটার্জী এসে তোর প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেয়ের গুণকীর্তন করলেন ঘণ্টাখানেক ধরে।

—হঠাৎ এত বছর পর!

—ঠিক জানি না ; হয়তো ওর মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার মতলব।

—বাঃ। চমৎকার।

মনীশের মা বলে যান, উনি থাকতে থাকতেই বুলার স্কুলের দুই দিদিমণি এসে হাজির।

—কেন?

—ওদের স্কুলের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় তোকে প্রধান বিচারক হতে হবে।

—আমি কি শম্ভু মিত্তির যে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিচারক হব?

—সে আমি জানি না কিন্তু আমি কথা দিয়েছি, তুই যাবি।

—কথা দিয়ে দিয়েছ?

—হ্যাঁরে; না দিয়ে পারলাম না। উনি একটু থেমে বলেন, এ ছাড়া ইন্দ্রানী তার দুই বন্ধুকে নিয়ে এসেছিল।

—ইন্দ্রানী আবার কে?

ওর মা একটু হেসে বলেন, ও তোর ভক্ত হিসেবেই প্রথম আসে কিন্তু এখন তো

আমারই ভক্ত হয়ে উঠেছে। উনি একটু থেমে বলেন, আজকাল তো অনেক ছেলেমেয়ে আসা-যাওয়া করে কিন্তু ইন্দ্রানীর মতো কেউ না।

বুলা দৌড়ে এসে বলে, আমাদের স্কুলের ক্লাস টেন' এর একটা মেয়ে তোমা দারুণ ভক্ত। সে তোমার একটা ছবি চেয়েছে।

—আমি কোথায় ছবি পাবো?

—না, না, দাদা, প্লীজ।

এইভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে বছর ঘুরে যায়।

মনীশের খ্যাতি যশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থও আসে পত্র-পত্রিকা প্রকাশকদের কাছ থেকে দুঃশ্চিন্তা অভাব-অনটন এখন অতীত স্মৃতি মাত্র। তবে এখন মনীশের ব্যস্ততার শেষ নেই সকালবেলায় উঠেই লিখতে বসে। এরই মধ্যে পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশকদের লোকজন এসে কথাবার্তা বলে। তারপর খেয়েদেয়েই অফিস দৌড়য়! অফিসেও নানাজন আসে দেখাসাক্ষা করতে। অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফেরে না কোনোদিনই। ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা পত্র পত্রিকার অফিসে যেতে হয় মাঝে মাঝেই। অথবা আপনমনে ঘুরে বেড়ায় এখানে ওখানে কখনও কখনও পুরনো বন্ধু-বান্ধব বা অফিসের সহকর্মীদের পাল্লায় পড়ে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফেরে। একটু কিছু খেতে খেতেই মা-ভাইবোনের সঙ্গে গল্পগুজব হাসিঠাট্টা করে আবার লিখতে বসে। কত রাত পর্যন্ত লেখে, তার ঠিকঠিকানা নেই।

মাঝরাতে ঘুম ভাঙলেই মা ওকে বকুনি দেন, হ্যাঁরে, দেড়টা বেজে গেল। শিগগি শুয়ে পড়। একটা অসুখ-বিসুখ না হলে বুঝি...

—হ্যাঁ মা, এখুনি উঠছি।

এইভাবেই আরো প্রায় বছরখানেক কাটার পর ওর মা একদিন বললেন, তুই এত বড় বড় ডাক্তার দেখালি কিন্তু তবু তো আমার প্রেসারটা কিছুতেই কমছে না। অর্ধেক সময়েই মাথা তুলতে পারি না। তাই তোকে একটা কথা বলতাম।

মনীশ বলে, হ্যাঁ, মা, বলো।

—কিন্তু কথাটা তোকে মনে রাখতে হবে।

—তোমার কোন কথাটা আমি রাখি না?

—না, তা বলছি না, তবে...

—তবে আবার কী?

এবার ওর মা বলেন, তুই যে নিজে দেখেশুনে কোনো মেয়েকে ঘরে আনবি, এমন সম্ভাবনা তো দেখছি না।

মনীশ একটু হেসে বলে, তুমি কি বিয়ের কথা বলবে?

—বিয়ের কথা মানে? ওর মা একবার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি একটি মেয়েকে পছন্দ করেছি। ওর মা আর বড় ভাইকে কথাও দিয়েছি।

মনীশ মার কথা শুনে যেন গাছ থেকে পড়ে। বলে, একেবারে কথা দিয়ে দিয়েছ

—হ্যাঁ। উনি একটু থেমে বলেন, মেয়েটি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-প্রতিমা। অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করে একটা প্রাইভেট ফার্মে এগারশ টাকা মাইনের চাকরি করছে! সুতরাং অপছন্দ হবার কোনো কারণ নেই।

উনি একটু থেমে বলেন, তাছাড়া তোর বয়স তো দিন দিন কমছে না। বিয়ে করার বয়স বহু দিন হয়ে গেছে।

হঠাৎ বিয়ের কথা শুনে মনীশ সঙ্গে সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারে না।

মনীশ কিছু বলবার আগেই উনি আবার বলেন, মেয়েটিকে বুলা কচিরও ভালো লেগেছে। সামনের রবিবার তোকে মেয়ে দেখাতে নিয়ে যাব।

তার আর দরকার নেই। শুধু এইটুকুই বলেই মনীশ নিজের ঘরে চলে যায়। আর মনে মনে ঠিক করে, স্টিফেন হাউসের যে মেয়েটিকে নিয়ে ও প্রথম গল্প লিখে সাহিত্য জগতের স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকার পেয়েছে, তার সঙ্গে একটু কথা বলবে।

কিন্তু হা ভগবান! দিনের পর দিন স্টিফেন হাউসের ঘরে ঘরে উঁকি দিয়েও মনীশ সেই প্রথমা নায়িকার দেখা পায় না। ওদিকে ওর মা যথারীতি এগিয়ে যান।

মনীশ মনের মধ্যে একটা অসহ্য জ্বালা বোধ করে কিন্তু কাউকে কিছু প্রকাশ করে না। কিন্তু সময় তো দাঁড়িয়ে থাকে না। সে তার আপন গতিতে এগিয়ে যায়। এরই মধ্যে ওর মা ছেলেকে বার বার অনুরোধ করেন, চল না বাবা, একবার মেয়েটাকে দেখতে।

—বলছি তো তার দরকার নেই।

—আমার মন বলছে, আমি ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিন্তু তবু নেমন্তন্নর কার্ডগুলো ছাড়ার আগে তুই মেয়েটাকে না দেখালে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।

—না, না, আমি কোথাও যাব না।

দিন তিনেক পর মনীশ অফিস বেরুবার সময় ওর মা বললেন, হ্যাঁরে, আজ তিনটের সময় ডাঃ ঘোষ আসবেন। তোকে থাকতে বলেছেন। তুই কি তখন আসতে পারবি?

—উনি ঠিক আসবেন?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে এসে যাবো।

মনীশ ট্যাক্সি নিয়ে ঠিক আড়াইটের মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ির দরজায় পা দিয়েই মাকে জিজ্ঞেস করে ডাঃ ঘোষ আসেননি তো?

—না না। উনি একটু থেমে বলেন, তুই তোর ঘরে যা ; আমি চা নিয়ে আসছি।

—ঠিক আছে।

মনীশ তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরে পা দিয়েই সেই স্টিফেন হাউসের প্রথমা নায়িকাকে দেখে চমকে ওঠে। আমতা আমতা করে বলে, আ-প-নি?

মা আসতে বলেছিলেন।

—মা আসতে বলেছিলেন?

ও শুধু মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

পেছন দিক থেকে মনীশের মা ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁরে আমি কি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি?

আনন্দে খুশিতে মনীশ দু'হাত দিয়ে মাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলল, তুমি কী করে আমার মনের কথা জানতে পারলে?

...ওরে, আমি যে তোর মা!

দাড়ি

জয়ন্ত ট্রেন থেকে নেমেই মাকে জড়িয়ে ধরল, প্রণাম করল।

মা ওর চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে বললেন, হ্যাঁরে, এক গাল দাড়ি রেখেছিস কেন?

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বলল, আমাদের হোস্টেলের সবাই দাড়ি রেখেছে।

এবার জয়ন্ত ওর কাকাকে প্রণাম করতেই বিজয়বাবু ওর বৌদিকে বললেন, জয় আর এখন কচি বাচ্চা নেই। ও এখন আই-আই-টির ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র।

জয়ন্তর মা বললেন, তাই বলে এক গাল দাড়ি রাখবে? এবার ছেলের দিকে ফিরে বললেন, কাল সকালেই দাড়ি কেটে ফেলবি।

হাওড়া থেকে হরিনাভি অনেক দূর। হাওড়া ব্রীজ পার হয়ে বড়বাজারের পাশ দিয়ে ব্রেবোর্ন রোড ধরে এগিয়ে ডালহৌসি-এসপ্লানেড পিছনে ফেলে পার্ক স্ট্রিট-ক্যামাক স্ট্রিট—সার্কুলার রোড, গুরসদয় দত্ত রোড ঘুরে আমীর আলি এভিন্যু ধরে বেশ খানিকটা যাবার পর গড়িয়াহাটের মোড়।

দীর্ঘ পথ। একে চব্বিশ ঘণ্টা রেলে চড়ে এসেছে, তার উপর বাক্স-বিছানা-বইপত্তর আছে বলেই ট্যাক্সিতে যেতে হয়। যেতে যেতে অনেক কথা হয়!

মা অনুযোগের সুরে বলেন, হ্যাঁরে জয়, তুই ঠিকমতো চিঠি দিস না কেন বল তো?

—প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই তো চিঠি দিই।

মা প্রতিবাদ করেন, কোনো মাসে দুটোর বেশি চিঠি দিস না।

—তোমাকে না দিলেও বাবাকে বা কেয়াকে তো দিই।

—ওদের চিঠি দেওয়া—না দেওয়া একই ব্যাপার।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, ও কথা বলছ কেন মা?

মা কিছু বলার আগেই বিজয়বাবু বললেন, ভালো কথা জয়, সামনের বুধবার চন্দনের বিয়ে।

জয়ন্ত আনন্দে ট্যাক্সির মধ্যেই লাফ দিয়ে ওঠে, পরশুই চন্দনদার বিয়ে!

—হ্যাঁ। তোর জন্য ওরা সবাই হাঁ করে বসে আছে।

—কোথায় কার সঙ্গে চন্দনদার বিয়ে হচ্ছে?

এবার জয়ন্তর মা বলেন, কেয়া বলছিল মেয়েটা খুব ভালো।

জয়ন্ত প্রশ্ন করে, কেয়া চেনে নাকি?

—ওদের লেডি ব্রেবোর্নেই তো পড়তো।

—কেয়ার সঙ্গেই পড়তো?

—না, এক বছরের সিনিয়ার ; তবে কেয়ার সঙ্গে খুব ভাব।

জয়ন্ত আবার প্রশ্ন করে, কি নাম মেয়েটির?

—রূপশ্রী।

জয়ন্ত হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে, মেয়েটি বুঝি খুব সুন্দরী?

—হ্যাঁ।

বিজয়বাবু বললেন, খুব ভালো গান গাইতে পারে।

জয়ন্ত এবার দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রায় আপনমনে বলল, তাহলে ছুটিটা ভালোই কাটবে।

গড়িয়াহাট ব্রীজ পেছনে ফেলে যাদবপুর পার হয়ে গড়িয়ার দিকে এগুতেই জয়ন্ত যেন চোখের সামনে হরিনাভি দেখতে পায়। মনে পড়ে কত টুকরো টুকরো স্মৃতি, আনন্দের ইতিহাস। স্কুলের কথা, ফুটবল ম্যাচের কাহিনি, হেডমাস্টার মশায়ের কাছে বকুনি, চন্দনদাদের বাড়িতে তাস খেলা, দোলের দিন কেয়ার হাতের আবীর নিয়ে কৃষ্ণার সারা মুখে মাখিয়ে দেওয়া। মনে পড়ছে অনীতার বিয়েতে পাল্লা দিয়ে মোল্লার চকের দই খাওয়া, রুমা হায়ার সেকেন্ডারিতে স্ট্যান্ড করার পর সারা হরিনাভিতে উৎসব আর আনন্দের কথা। আরো কত কি মনে পড়ছে ওর।

ট্যাক্সিটা খুব জোরে মোড় ঘুরতেই মা বললেন, এসে গেছি।

সামনে গোলাপী রঙয়ের স্কুলবাড়ি দেখেই জয়ন্ত যেন আর স্থির থাকতে পারে না। এখানকার প্রত্যেকটা গাছপালা-ধুলোবালির সঙ্গেও ওর আত্মীয়তা। মিত্তির পাড়ার চেহারা অনেক বদলে গেছে। নতুন ছোট ছোট বাড়িতে মাঠ ভরে গেছে। তা হোক। তবু সবকিছু ওর আপন, পরিচিত মনে হয়।

জয়ন্ত ট্যাক্সি থেকে নামতেই কেয়া আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে উঠল ; খুশির হাসিতে হাসতে হাসতে গোপালবাবু এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন।

কেয়া ওর দাদার দাড়িতে হাত দিয়ে বলল, তুই দিল্লিতে থাকিস বলে সত্যি সত্যি সর্দারজী হয়ে গেলি?

বাসন মাজতে মাজতে পুঁটির মা বেরিয়ে এসেছে। হাসতে হাসতে বলে, হ্যাঁরে, এমন সুন্দর মুখখানা দাড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছিস কেন?

জয়ন্ত মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলল, বউ দাড়ি রাখতে বলেছে।

দূর হতভাগা! পুঁটির মা আর দাঁড়ায় না, বাসন মাজতে চলে যায়।

ওর কথায় সবাই হাসেন। হাসি থামতে না থামতেই কৃষ্ণা প্রায় দৌড়তে দৌড়তে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। এক মুহূর্তের জন্য জয়ন্তকে দেখেই কেয়ার দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, একটু পরে জয়ন্তদাকে পাঠিয়ে দিস। দাদা ডাকছে।

কেয়া কিছু বলার আগেই জয়ন্ত বলল, চন্দনদাকে বল আমি চা খেয়েই আসছি।

কৃষ্ণা দাঁড়াল না। যেমন ছুটে এসেছিল, তেমনি ছুটে চলে গেল।

চায়ের কাপটা জয়ন্তর হাতে তুলে দিতে দিতে কেয়া বলল, জানিস দাদা, চন্দনদার বিয়েতে আমাদের ব্রেবোর্নের অনেক মেয়ে আসবে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করল, অনেক মানে?

অনেক মানে ইন্দিরা আসবে, শিবানী আসবে, মিতা-রিতা আসবে...

কেয়াকেআর এগুতে না দিয়ে জয়ন্ত একটু চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলল, চন্দনদার বিয়েতেই যদি এতগুলো মেয়ে আসে, তাহলে দেবু যেদিন টোপর মাথায় দিয়ে এ বাড়িতে আসবে, সেদিন তো তোদের কলেজে আর কোনো মেয়ে থাকবে না।

'দাদা' বলে খুব জোরে একটা চীৎকার করেই কেয়া লজ্জায় ঘর থেকে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে গেল।

দুটো দিন কোথা দিয়ে কিভাবে চলে গেল তা ওরা কেউ জানতেও পারলেন না।

বুধবার সকাল থেকে চন্দনদের বাড়িতে চীৎকার-চেঁচামেচি, হৈ-হুল্লোড়, হাসি-ঠাট্টা, দৌড়াদৌড়ি-হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে। শুধু চন্দন ছাড়া সবাই ব্যস্ত। জয়ন্তর এক মিনিটের ফুরসত নেই। প্রায় দৌড়ে যাবার পথে চন্দনের মাকে তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করল, কী হল বড়মা?

উনি একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, কি আর হবে। তোর জ্যাঠার হুকুম তামিল করতে করতেই মরে গেলাম।

চন্দনের মা আর দাঁড়ালেন না। কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। জয়ন্ত উপরে যাবার জন্য সিঁড়িতে পা দিতেই হঠাৎ পেছন থেকে কৃষ্ণা ডাকল, জয়ন্তদা, একটু শুনে যাও।

জয়ন্ত পিছন ফিরতেই কৃষ্ণা ওকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, এই এক গাল দাড়ি নিয়ে তুমি বরযাত্রী যাবে না।

জয়ন্ত দাড়িতে হাত দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল, কেন?

কৃষ্ণা আগের মতোই গম্ভীর হয়ে বলল, কেন আবার? আমার ভালো লাগছে না।

—কিন্তু...

জয়ন্তকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কৃষ্ণা বলল, তর্ক না করে যা বলছি শোন।

জয়ন্ত নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

সময় যেন হাওয়ায় উড়ে যায়। চন্দন টোপর মাথায় দিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছে। চারদিকে ভীড়। উত্তেজনা। হঠাৎ জয়ন্তকে পাশে দেখে চন্দন হাসতে হাসতে বলল, এমন সুন্দর দাড়ি কেটে ফেললি?

জয়ন্ত গম্ভীর হয়ে বেশ জোরেই বলল, কি আর করব? বউয়ের কথা তো না শুনে পারি না।

ওর কথায় সবাই হো হো হাসেন।

শাঁখ বাজছে, উলুধ্বনি হচ্ছে, বরণ-আশীর্বাদের পালা চলছে। হঠাৎ কৃষ্ণা জয়ন্তর কানে কানে বলল, তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে।

জয়ন্ত হাসে।

কৃষ্ণা আবার ফিস্ ফিস্ করে বলে, বিয়েবাড়িতে মেয়েদের সঙ্গে বেশি ফাজলামি করবে না।

জয়ন্ত গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল, করব না?

কৃষ্ণা বেশ জোরের সঙ্গে বলল, না।

নিরুদ্দেশ

—আপনিও স্যান্ড ডিউন দেখতে এসেছেন?

ভদ্রলোকের প্রশ্ন শুনে মেয়েটি একটু অবাক হয়। বোধহয় একটু বিরক্তও হয়। রাজস্থানের পশ্চিম প্রত্যন্তের জৈসালমেঢ় জেলার প্রায় পশ্চিম প্রান্তদেশের এই বালির পাহাড়ে! এখানেও আবার একজন বাঙালি! মেয়েটি জবাব দেয়, হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।

—আমার নাম সুদীপ্ত ব্যানার্জী। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি। আপনাকে টুরিস্ট লজ'এ দেখেছি বলেই...

—কিন্তু আমি যে বাঙালি, তা জানলেন কী করে?

সুদীপ্ত একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, গুনগুন করে অতুল প্রসাদের 'কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে' না গাইলে হয়তো জানতে আরো দু'একদিন...

মেয়েটি একটু হেসে বলে, আমি আমার কটেজের মধ্যে পাগলের মতো যা তা সুরে গুনগুন করছিলাম কিন্তু আপনি তা শুনলেন কী করে?

—আপনার কটেজের জানালাগুলো খোলা ছিল ; তাছাড়া আমি তো আপনার পাশের কটেজেই আছি।

—তাই বলুন।

অহেতুক বেশি আগ্রহ না দেখাবার জন্যই সুদীপ্ত বললেন, যাই, একটু ঘুরে-ফিরে দেখি।

--হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখুন!

এমন অবিশ্বাস্য দিগন্ত বিস্তৃত বালির পাহাড় দেখে সুদীপ্ত অবাক হয়। মুগ্ধ হয় বিদায়ী সূর্যের আলোয় এই বালুকাময় সাম্রাজ্যের বিস্ময়কর রূপ দেখে বেশ কিছুক্ষণ দেশি-বিদেশি টুরিস্টদের ভীড়ে মিলেমিশে ঘুরে বেড়াবার পর উটের পিঠে চড়েও অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক চক্কর দেয়। তারপর জীপ গাড়িগুলোর কাছে উটের পিঠ থেকে নামতেই আবার ওদের দেখা।

সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করে, উটের পিঠে চড়ে ঘুরলেন না?

—দু'দিন উটের পিঠে চড়ে ঘুরেছি। তাছাড়া আজ শাড়ি পরে এসেছি বলে...

—এর আগে আরো দু'দিন এখানে এসেছেন?

—আসব না? প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনা দেখার জন্যই যে এখানে এসেছি।

—বাঃ! খুব সুন্দর কথা বলেছেন। আপনি কী লিটারেচারের ছাত্রী?

—না, না, আমি হিস্ট্রি নিয়ে পড়াশুনা করেছি।

এবার সুদীপ্ত একটু হেসে বলেন, আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানতে পারিনি।

—সরি! আমার নাম অলকানন্দা সরকার।

উটের পিঠে চড়ে টুরিস্টদের ঘোরাঘুরি পর্ব শেষ হয়েছে। দেশি-বিদেশি সব টুরিস্টদের মুখেই স্যান্ড ডিউনের বৈশিষ্ট্য আর সৌন্দর্যের আলোচনা। শহরে ফিরে যাবার জন্য জীপ গাড়িগুলির ড্রাইভাররা হর্ন দিতে শুরু করতেই অলকানন্দা বলে, হর্ন দিচ্ছে : যাই।

সূর্যদেব ঢলে পড়তে না পড়তেই গাড়িগুলো এই বালির সাম্রাজ্য থেকে পালাবার জন্য শহরের দিকে রওনা হয়। অন্ধকার নামলে এই মরুভূমির দেশে পথভ্রষ্ট দিগভ্রষ্ট হয়ে নিরুদ্দেশ হবার সম্ভাবনা ষোল আনা। টুরিস্ট লজ'এ ফিরতে আটটা বেজে গেল।

কটেজে ঢুকেই সুদীপ্ত ক্লান্তিতে নেয়ারের খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে। একটু পরে একটা সিগারেট ধরায়। চোখের সামনে শুধু অলকানন্দার বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর উজ্জ্বল মুখখানাই দেখতে পায়। নানা কথা ভাবে। আপনমনে একটু হাসে। সিগারেট টানতেও যেন ভুলে যায়। একটু পরে এ্যাসট্রেতে সিগারেটটা ফেলে দেয়।

এইভাবে আরো কিছুক্ষণ কেটে যায়। তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়েই লাফ দিয়ে ওঠে। বাথরুমে যায়। স্নান করে। প্রায় দৌড়ে ডাইনিং হল'এ খেতে যায়। দু'চারজনকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকতে দেখলেও অলকানন্দাকে দেখতে পায় না।

খাওয়া-দাওয়ার পর সামনের লন'এ অনেককে গল্পগুজব করতে দেখে সুদীপ্ত একটু এদিক-ওদিক পায়চারি করে, কিন্তু না, সেখানেও অলকানন্দাকে দেখতে পায় না। সুদীপ্ত নিজের কটেজের দিকে এগিয়ে যায়।

—একি! একলা একলা এখানে বসে আছেন? আবছা আলোয় কটেজের বাইরে অলকানন্দাকে দেখেই সুদীপ্ত প্রশ্ন করে।

—খেয়েদেখে উঠেই তো শোবার অভ্যেস নেই, তাই...

—কিন্তু একলা কেন? আপনার বাড়ির অন্যান্যরা...

সুদীপ্তকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই অলকানন্দা বলে, আমি একলাই এসেছি।

—একলা?

অলকানন্দা একটু হেসে বলে, কেন, একলা বেড়াতে বেরুনো কী অন্যায়?

—না, না, অন্যায় কেন হবে!

—তবে?

—সাধারণত আপনার বয়সী মেয়েদের তো বাবা-মায়েরা একলা একলা বেরুতে দেন না। তাছাড়া..

—তাছাড়া মেয়েদেরও তো একলা একলা বিশেষ বেরুতে দেখেন না, তাই তো?

—হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন।

অলকানন্দা একটি হেসে বলে, আপনিও তো একলা বেরিয়েছেন, তাই না?

—হ্যাঁ, আমিও একলাই এসেছি।

এবার অলকানন্দা বলে, যদি এখুনি ঘুমুতে না যান তাহলে আপনার কটেজ থেকে একটা চেয়ার এনে বসুন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আনছি।

ুদীপ্ত নিজের কটেজ থেকে চেয়ার এনে বসতেই অলকানন্দা জিজ্ঞেস করে, আপনি ়লকাতায় থাকেন?

-হ্যাঁ; আপনি?

-হ্যাঁ, আমিও কলকাতার বাসিন্দা।

-আপনি নিশ্চয়ই বাবা-মায়ের খুব আদুরে?

-অলকানন্দা একটু হেসে জিজ্ঞেস করে, কেন বলুন তো?

-এই আপনি একলা একলা বেরিয়েছেন, তাই জিজ্ঞেস করলাম।

-আমার বাবা নেই।

-নেই?

-না। মুহূর্তের জন্য একটু থেমে ও বলে, তবে বাবা আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। আমাকে অসম্ভব ভালোবাসেন।

ুদীপ্ত সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রশ্ন করতে পারে না। একটু পরে প্রশ্ন করে, আপনি নিশ্চয়ই শুনা করছেন?

মাবছা আলোতেও সুদীপ্ত দেখে, অলকানন্দা একটু ভাবে, একটু হাসে। তারপর বলে, শুনা করছি, তাও বলা যায়, আবার করছি না, তাও বলতে পারি।

-তার মানে?—

কানন্দা একটু স্পষ্ট করেই হেসে বলে, কোনোমতে এম. এ. ডিগ্রী জোগাড় করে া ফেলোশিপও পেয়েছি কিন্তু পড়াশুনা বিশেষ কিছু করছি না।

-ফেলোশিপ মানে ইউ-জি-সি'র ফেলোশিপ?

-হ্যাঁ।

প্ত হাসতে হাসতেই বলে, আপনি তো দারুণ খারাপ ছাত্রী!

র কথা শুনে অলকানন্দা না হেসে পারে না। তারপর হাসতে হাসতেই বলে, এমন দেখাচ্ছেন যেন আপনি হায়ার-সেকেন্ডারিও পাশ করেননি!

-প্রায় সেইরকম। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করে, মাকে সঙ্গে আনলেন না কেন?

র মুখ থেকে কথাটা বের হতে না হতেই অলকানন্দা বলে, আমি যেভাবে এসেছি াবে তো মাকে আনা যায় না।

-আপনি কি উইদাউট রিজার্ভেশনেই ট্রেনে চড়ে পড়েছেন যে মাকে...

-না, তা না।

-আপনারা মা কি ছোট ছোট ভাইবোনদের দেখাশুনার জন্যই...

-আমার আর কোনো ভাইবোন নেই।

-তাহলে মাকে একলা রেখে এলেন কেন? তিনিও তো একটু ঘুরে-ফিরে গেলে...

মাকে একলা রেখে আসিনি ; মা আমার এক মামার কাছে আছেন।

তাহলে ভালোই করেছেন। সুদীপ্ত মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ভাই-এর কাছে ক'দিন তাঁরও নিশ্চয়ই ভালো লাগছে।

না, না, মা বেড়াতে যাননি। বাবা মারা যাবার পর থেকেই আমি আর মা ঐ মামার থাকি।

—ও!

—আপনার ঘুম পাচ্ছে না?

—কেন? আপনার ঘুম পাচ্ছে?

—এত তাড়াতাড়ি আমার ঘুম আসে না। আমি আর মা রোজ একটা-দেড়টা পর্যন্ত করি।

—আচ্ছা।

অলকানন্দা একটু হেসে বলে, রাত্তিরের ঐ গল্পগুজবটুকু না করে আমরা ঘুমুতেই না। মা আমার নট ওনলি বেস্ট ফ্রেন্ড, শী ইজ অলসো মাই ওনলি ফ্রেন্ড।

ওর কথাটা শুনে সুদীপ্ত খুশির হাসি হেসে বলে, ইউ আর নট ওনলি এ ব্রিলিয়ান্ট স্টু বাট অলসো এ ভেরি গুড ডটার!

—কিন্তু মা আমার চাইতেও হাজার গুণ ভালো।

—আপনার মা নিশ্চয়ই খুব ভালো কিন্তু আপনার মতো মেয়েও তো আজকাল দু

অলকানন্দা সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে বলে, যে মেয়ে বাড়িতে কাউকে কিছু না চলে আসে, সেরকম মেয়ে নিশ্চয়ই দুর্লভ!

চোখ দুটো বড় বড় করে সুদীপ্ত বলে, কী আশ্চর্য! আপনি কাউকে না বলেই এসেছেন? আপনার মা কি রকম চিন্তা করছেন, ভাবুন তো!

বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে ও বলে, মা যাতে চিন্তা না করে, সে ব্যবস্থা করে এ তবে মামা-মামীকে কিছু জানাইনি।

—কিন্তু...

সুদীপ্ত কথাটা শেষ করে না।

—কিন্তু কী?

—যদি মামা-মামী থানা-পুলিশ করেন?

—আমি কী চুরি-ডাকাতি-খুন করে পালিয়েছি যে মামা-মামী থানা-পুলিশ কর অলকানন্দা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

সুদীপ্ত বলে, না, তা না, কিন্তু বাড়ি থেকে ছেলেমেয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলে তো লোকজন থানা-পুলিশ করেন।

—জানি।

—তাহলে?

—তাহলে কী?

—যদি আপনার মামা থানায় রিপোর্ট করেন, তাহলে তো পুলিশ আপনাকে ধরে যেতে পারে।

অলকানন্দা অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে, সুদীপ্তবাবু, আমি কচি বাচ্চা না চব্বিশ বছরের একজন যুবতী। তাছাড়া আমি সুস্থ স্বাভাবিক। আমি আমার ইচ্ছা ঘোরাঘুরি, কাজকর্ম বিয়ে-থা সবকিছুই করতে পারি। মামা-মামী তো দূরের কথা, পুলি সে ব্যাপারে কিছু করার অধিকার নেই।

সুদীপ্ত একটু হেসে বলে, তা ঠিক কিন্তু তবুও বলছি, পুলিশ আপনাকে ধরে

আপনার মামা-মামী বা মা'র কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

অলকানন্দাও হেসে বলে, সামান্য পুলিশের কথা তো বাদই দিচ্ছি ; নাগরিক হিসাবে আমার মৌলিক অধিকারে নাক গলাবার অধিকার প্রাইম মিনিস্টারেরও নেই।

—যদি আজ রাত্তিরেই পুলিশ আপনাকে ধরতে আসে?

—যে পুলিশ অফিসার ধরতে আসবেন, তাঁর কপালে অশেষ দুঃখ আছে।

ওর কথা শুনে সুদীপ্ত হো হো করে হাসে। তারপর বলে, আপনি তো দারুণ মেয়ে!

—হ্যাঁ সুদীপ্তবাবু, সত্যি আমি দারুণ মেয়ে। আমি মানুষকে ভালোবাসতে জানি কিন্তু ভয় করতে শিখিনি।

দু'এক মিনিট দু'জনেই চুপচাপ। তারপর অলকানন্দই আবার কথা বলে, আমার কথা তো অনেক শুনলেন। এবার আপনার কথা বলুন।

—আমার কথা আর কী শুনবেন? আমি অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন।

—চোদ্দ আনা বাঙালিই তো মধ্যবিত্ত ; সেজন্য দুঃখ বা আক্ষেপ করার কি আছে?

—না, না, দুঃখ করছি না ; আমি এতই সাধারণ যে বলার কিছু নেই।

—আপনি সাধারণ কি অসাধারণ, সে বিচার তো অন্যেরা করবেন।

—তা ঠিক।

—বলুন। লেখাপড়া কোথায় করেছেন?

—লেখাপড়ায় তো আপনার মতো ভালো ছিলাম না, তাই কি শুনবেন?

—আঃ, আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই। বলুন, কোন কলেজে পড়েছেন?

—সেন্ট জেভিয়ার্সে।

—কীসে অনার্স ছিল?

—আমি অনার্স নিয়ে পড়েছি, তা কী করে ভাবলেন?

—আবার তর্ক করছেন? বলুন, কীসে অনার্স ছিল।

—ইংরেজিতে।

—এম. এ. পড়লেন কোথায়? কলকাতায় না যাদবপুরে?

—কলকাতায়।

—কবে পাশ করেছেন?

—সেকি আজকের কথা? আমি যখন পাশ করি, তখন স্যার আশুতোষ ভাইস-চ্যান্সেলার।

অলকানন্দা চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলে, আপনি যে আশুতোষের আমলের মানুষ তা তো আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি। কোন কলেজে পড়াচ্ছেন, তাই বলুন।

—এত ভালো রেজাল্ট করেছিলাম যে কলেজে পড়াবার স্বপ্ন দেখারও সাহস হয়নি।

—তাহলে কী করছেন?

—সে কথা জিজ্ঞেস করে আর লজ্জা দেবেন না।

—কেন? আপনি কি চুরি করছেন যে বলতে লজ্জা হচ্ছে?

—না, চুরি করছি না ঠিকই কিন্তু যা করছি, সেটাও খুব গৌরবের নয়।

অলকানন্দা সঙ্গে সঙ্গে বলে, আপনার বড্ড ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স! আপনি যদি

এম. এ. পাশ করে দারোয়ানের চাকরিও করেন, তাহলে তো দেশের নেতাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। আপনি লজ্জা পাবেন কেন?

সুদীপ্ত ঐ প্রসঙ্গে কোনো জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, শুতে যান, অনেক রাত হয়েছে।

অলকানন্দাও উঠে দাঁড়িয়ে বলে শুতে যাচ্ছি কিন্তু কাল সকালে আবার ঝগড়া করতে হবে। এখানে ক'দিন থাকবেন?

—আপনি যে ক'দিন থাকবেন, আমিও সেই ক'দিন থাকব।

—আমি যদি কালই এখান থেকে চলে যাই?

—আপনার আপত্তি না থাকলে আমিও আপনার সঙ্গে অন্য কোথাও যেতে পারি।

—কলকাতা ফেরার তাড়া নেই?

—তাড়াতাড়ি ফিরলেই ভালো হয় ; তবে একটু দেরি হলেও অসুবিধে নেই।

—আচ্ছা গুড নাইট! কাল সকালে আবার কথা হবে।

—গুড নাইট!

পরের দিন সকালে সুদীপ্ত ব্রেকফাস্টের জন্য ডাইনিং হল'এ ঢুকতেই কোণার দিকে একটা টেবিল থেকে অলকানন্দা ইশারায় ডাকল।

সুদীপ্ত সামনের চেয়ারে বসতেই অলকানন্দা বলল, কাল রাত্তিরে বোধহয় আমার কথাবার্তায় আপনি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই না?

সুদীপ্ত একটু হেসে বলে, না, না, অসন্তুষ্ট হবো কেন? বরং আপনার স্পষ্ট কথাবার্তা খুব ভালো লেগেছে।

অলকানন্দাও একটু হেসে বলে, আমি একটু স্পষ্ট কথাবার্তা বললেও মেয়েটা খুব খারাপ না।

সুদীপ্ত চাপা হাসি হেসে বলে, আমাকে পেটের দায়ে অনেক বিচিত্র ধরনের মানুষ ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। আপনি যে খারাপ না, তা আমি অনেক আগেই বুঝেছি।

বেয়ারা খাবারের অর্ডার নিয়ে চলে যেতেই অলকানন্দা জিজ্ঞেস করে, আপনি কোথায় চাকরি করেন?

মুহূর্তের মধ্যে একটু চিন্তা-ভাবনা করেই ও জবাব দেয়, পুলিশ।

—পুলিশে?

—হ্যাঁ।

—পুলিশেই যদি চাকরি করবেন, তাহলে এম. এ. পড়লেন কেন?

—এম. এ. পরীক্ষা শুরু হবার ঠিক তিন দিন আগে মা মারা গেলেন। তাই রেজাল্ট বিশেষ ভালো হল না। তাছাড়া একটা চাকরি পাওয়া খুবই জরুরী ছিল।

বেয়ারা খাবার দিয়ে যায় কিন্তু খাওয়া শুরু না করেই অলকানন্দা জিজ্ঞেস করে, আপনার মা'র কী হয়েছিল?

—ক্যান্সার। সুদীপ্ত একটু থেমে বলে, বাবা রিটায়ার করার ঠিক দু'বছর আগে মা'র ক্যান্সার ধরা পড়ে। ন'বছর রোগ যন্ত্রণা ভোগ করে মা মারা গেলেন কিন্তু মা'র চিকিৎসার

জন্য বাবা দেনার দায়ে ভিখারী হয়ে গেলেন। তাই...।

—ইস্! কী দুঃখের কথা!

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। তারপর আস্তে আস্তে খেতে শুরু করে।

খেতে খেতে অলকানন্দা জিজ্ঞাসা করে, আপনার বাবা কী করতেন?

—স্কুলে মাস্টারি করতেন।

—স্কুল থেকে রিটায়ার করার পর কোনো কোচিং-টোচিং..

সুদীপ্ত একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, মা মারা যাবার দেড় বছরের মধ্যেই বাবা চলে যান।

—মাই গড!

আবার কিছুক্ষণ নীরবতার পর অলকানন্দা জিজ্ঞেস করে, আপনারা ক'ভাই বোন?

সুদীপ্ত একটু হেসে বলে, আমার ঠাকুর্দা বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন। বাবারও কোনো ভাইবোন ছিল না। তবে আমার এক দিদি আছে কিন্তু বিশেষ যোগাযোগ নেই।

—কেন?

প্রশ্ন করেই অলকানন্দা লজ্জিত হয় কিন্তু আরো কিছু বলতে যাবার আগেই সুদীপ্ত বলে, দিদির রূপ দেখেই জামাইবাবু ওকে বিয়ে করেন। কিন্তু বড্ড অহঙ্কারী। তাছাড়া ওরা মালেশিয়ায় থাকে।

—আপনার জামাইবাবু কী খুব বড়লোকের বাড়ির ছেলে?

কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে সুদীপ্ত বলে, খুব বড়লোকের বাড়ির ছেলে না হলেও যথেষ্ট সচ্ছল পরিবারের। তাছাড়া জামাইবাবু ডাক্তার।

—সো হোয়াট!

দু'জনেরই কফি খাওয়া শেষ কিন্তু তবু দুজনেই চুপ করে বসে থাকে।

একটু পরে অলকানন্দা জিজ্ঞেস করে, বিয়ে করেছেন?

সুদীপ্ত একটু হেসে বলে, দেনা শোধ না করেই টোপর মাথায় দেব?

—তাহলে আপনি একেবারেই একলা?

—না, আমার বড় মাসী আমার কাছে থাকেন। ও একটু থেমে বলে, আমার বড় মাসী আমার মা'র বিয়ের আগেই বিধবা হন। আমার জন্ম হবার পর থেকেই বড়মাসী আমাদের কাছে আছেন।

ডাইনিং হল থেকে বেরুতে বেরুতেই অলকানন্দা বলে, তাহলে তো আপনারা মাসীরও অনেক বয়স হয়েছে!

—হ্যাঁ। সুদীপ্ত একটু হেসে বলে, তবে বুড়ি বলে, আমার ছেলেকে না দেখে মরতে পারবে না।

ওর কথা শুনে অলকানন্দাও একটু হাসে।

শহরের এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে ওরা সালিম সিং কী হাভেলী পৌঁছে যায়। তারপর খান থেকে চলে যায় পাঁটোও কী হাভেলী। সব শেষে নাথমলজী কী হাভেলী। ইতিমধ্যে রোদ্দুর অসহ্য মনে হতেই ওরা 'টুরিস্ট লজ'-এর দিকে পা বাড়ায়।

—ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছেন? অলকানন্দা হাঁটতে হাঁটতেই সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

—ছুটি নিয়ে আসিনি; কাজে এসেছি।
—কলকাতার পুলিশে কাজ করেন ; এখানে আবার কী কাজ?
—আপনিই তো আমাকে টেনে এনেছেন।
অলকানন্দা থমকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমি আপনাকে টেনে এনেছি?
সুদীপ্ত চাপা হাসি হাসতে হাসতে শুধু মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।
—তার মানে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কী ব্যাপার বলুন তো!
সত্যি শুনতে চান?
—নিশ্চয়ই।
টুরিস্ট লজ'এ গিয়ে সব বলছি।

*　　*　　*

বড়বাবু সব শোনার পর বললেন, দেখুন, যদি কোনো গ্রোন-আপ ছেলেমেয়ে—আই মীন অ্যাডাল্ট স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে কোথাও চলে যায়, তাহলে সেটা কোনো বে-আইনী হয় না।...
ওর কথার মাঝখানেই দীপুবাবু বলেন, কিন্তু হঠাৎ কোনো বিশেষ কারণে যদি...
বড়বাবু একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, আপনারা তো আপনাদের কথা বলছেন। এবার আমাকে কিছু বলতে দিন।
বিনয়বাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি বলুন।
বড়বাবুর আবার শুরু করেন, মিঃ ঘোষ, আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, আপনার ভাগ্নীব চিঠি থেকে স্পষ্ট যে তাকে কেউ কিডন্যাপ করেনি বা...
—সে তো একশ'বার স্বীকার করব।
—তাকে কেউ ভয় দেখিয়ে নিয়ে গেছে, তাও নয়।
বিনয়বাবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানান।
বড়বাবু বিনয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। তাই আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, গ্রোন-আপ ও শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা সাধারণত তিনটি কারণে বাড়ি থেকে পালায়।
উনি লাইটার জেলে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, নাম্বার ওয়ান—প্রেমঘটিত কোনো...
দীপুবাবু ওর কথার মাঝখানেই বলেন, না, ওর ওসব কোনো ব্যাপার ছিল না।
বড়বাবু এবার গলা চড়িয়ে বলেন, উড ইউ প্লীজ স্টপ! তাছাড়া মশাই, আপনি হচ্ছেন মেয়েটির মামার দূর সম্পর্কের শালা। এ ব্যাপারে আপনাকে বকবক করার অধিকার কে দিল?
বিনয়বাবু শালাবাবুকে বলেন, এই দীপু, কেন কথার মাঝখানে বকবক করছো। এবার উনি বড়বাবুকে বলেন, প্লীজ আপনি বলুন।
বড়বাবু সিগাবেটে একটা টান দিয়ে বলেন, প্রেম-ট্রেম ছাড়া হয় পারিবারিক কারণে, না হয় নিজেব মতো নিজের কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্যই শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বাড়ি

্কে হঠাৎ কোথাও চলে যায়।

এবার উনি একটু হেসে বলেন, এসব ব্যাপারে আমরা পুলিশের লোক হয়ে কি করতে বলুন?

বিনয়বাবু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তা ঠিক কিন্তু মেয়েটা হঠাৎ বাড়ি থেকে ল গেল। আপনারা যদি সাহায্য না করেন তাহলে আমরা কোথায় যাই!

বড়বাবু কোনো মন্তব্য না করে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে এ্যাশট্রে'তে ফেলে দেন।

বিনয়বাবু আবার বলেন, খবরের কাগজে তো হরদম দেখি, ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেল লিশ তাদের খুঁজে বের করে।

বড়বাবু টেবিলে একটু ঘুষি মেরে বলেন, ইয়েস দ্যাটস রাইট। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ল গেলে বা হারিয়ে গেলে তারা নানা ধরনের ক্রিমিন্যালদের হাতে পড়তে পারে বলেই...

—তা ঠিক।

বড়বাবু এক গাল হাসি হেসে বলেন, চোর-ডাকাত, খুনি-টুনি ধরাই আমাদের কাজ। লমেয়ে হারিয়ে-টারিয়ে গেলে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি, এ্যাজ এ সোস্যাল সার্ভিস।

বিনয়বাবু বললেন, সবই বুঝতে পারছি কিন্তু আপনারা যদি সাহায্য না করেন, তাহলে আমরা কোথায় যাই?

বড়বাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই সাহায্য করব ; তবে আমাদের লিমিটেনশনটাও বুঝবেন। আমাদের কাজ বা দায়িত্ব অনুপাতে লোকজন অত্যন্ত কম। তার উপর এই কলকাতা শহরে রোজ একটা না একটা পলিটিক্যাল ঝামেলা লেগেই আছে। এ ছাড়া ভি-আই-পি'দের জন্য স্পেশ্যাল ডিউটি ছাড়া আজকাল সব কেষ্ট-বিষ্টুদের বিয়েবাড়িতেও আমাদের দু-তিনজন কনস্টেবল পাঠাতে হয়।

বিনয়বাবু একটু হেসে বললেন, তা যা বলেছেন।

বড়বাবু আর কোনো কথা না বলে কলিং বেল টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন কনস্টেবল ঘরে ঢুকতেই বললেন, শ্রীনাথ বা সুদীপ্ত আছে?

কনস্টেবলের উত্তরের অপেক্ষা না করেই উনি বললেন, ওদের একজনকে আসতে বলো।

একজন তরুণ সাব-ইন্সপেক্টর ঘরে পা দিতেই বড়বাবু বললেন, সুদীপ্ত, এদের কেসটার একটা জি. ডি. করে নাও তো।

সাব ইন্সপেক্টর বিনয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, আসুন আমার সঙ্গে।

দিন তিনেক পরের কথা! বেলা সওয়া দশটা সাড়ে দশটা হবে। বেল বাজতেই একজন ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন।

—আমি থানা থেকে আসছি।

মিসেস ঘোষ বললেন, ভেতরে আসুন।

ড্রইংরুমে দু'এক পা এগিয়েই সাব-ইন্সপেক্টর সুদীপ্ত ব্যানার্জী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি অলকানন্দা দেবীর কে?

মামী। মিসেস ঘোষ এইটুকু বলেই বললেন, আপনি বসুন। আমি দরজাটা বন্ধ কা দিই।

সাব-ইন্সপেক্টর ব্যানার্জী সোফায় বসতে না বসতেই মিসেস ঘোষ বাইরের দিকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, চা খাবেন? নাকি কফি?

—ওসব কিছুর দরকার নেই।

মিসেস ঘোষ একটু হেসে বললেন, কফি খেতে আপত্তি নেই তো?

—না, আপত্তি নেই তবে...

মিসেস ঘোষ একবার ভেতরে গিয়েই আবার ড্রইংরুমে ফিরে আসতেই সাব-ইন্সপেক্টর ব্যানার্জী বললেন, আপনি বসুন। অলকানন্দা দেবীর চলে যাবার ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব!

মিসেস ঘোষ সামনের সোফায় বসতেই সাব-ইন্সপেক্টর ব্যানার্জী জিজ্ঞেস করলেন, অলকানন্দা দেবী আর তার মা কতদিন আপনাদের এখানে আছেন?

—অনেক বছর। মেজদি বিধবা হবার বছরখানেক পর থেকেই।

—মেজদি মানে অলকানন্দা দেবীর মা?

—হ্যাঁ।

—সে কত বছর আগেকার কথা?

—অলকা যখন ক্লাস সেভেন'এ পড়ে, তখন থেকেই ওরা আমাদের কাছে আছে

—অলকানন্দা দেবীর কী আরো মামা-মামী আছেন?

মিসেস ঘোষ একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলে, থাকবে না কেন? কিন্তু নিজের নিজের সংসার সামলে কে আর এইসব দায়িত্ব নিতে চায় বলুন?

—আপনারা এই দায়িত্ব নিলেন কেন?

—আমরা এই দায়িত্ব না নিলে ওঁরা তো ভীষণ বিপদে পড়তেন।

কাজের মেয়েটি দু'কাপ কফি দিয়ে যেতেই মিসেস ঘোষ বললেন, নিন, কফি খেয়ে নিন।

—হ্যাঁ, ঠিক আছে। কফির কাপে চুমুক না দিয়েই সাব-ইন্সপেক্টর ব্যানার্জী জিজ্ঞেস করেন, অলকানন্দা দেবীর বাবা কী করতেন?

—রেলে চাকরি করতেন।

—কী পোস্টে?

—তা বলতে পারব না।

—অলকানন্দা দেবীর মা নিশ্চয়ই পেনসন পান?

—হ্যাঁ, পান।

—মাসে মাসে কত টাকা পান তা জানেন কী?

মিসেস ঘোষ হাসতে হাসতেই মাথা নেড়ে বলে, আমি ওসবের খবর রাখি না।

—অলকানন্দা দেবীর মা পেনসনের টাকা দিয়ে কী করেন বলতে পারেন?

প্রশ্নটা শুনে মিসেস ঘোষ মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেও তা প্রকাশ না করে বলেন, অলকা বাড়ি থেকে চলে যাবার সঙ্গে এসব নিছক পারিবারিক ব্যাপারের কী যোগাযোগ,

তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

সাব-ইনসপেক্টর ব্যানার্জী অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে বলেন, তার চলে যাবার সঙ্গে তো পারিবারিক ব্যাপারের সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। তাই ও কথা জানতে চেয়েছি।

—হ্যাঁ, পেনসনের কিছু টাকা মেজদি ওঁর ভাইকে দেন।

—ধন্যবাদ। সাব-ইন্সপেক্টর এবার প্রশ্ন করেন, আচ্ছা মিসেস ঘোষ, অলকানন্দা দেবীর সঙ্গে কি কোনো ছেলের ভাব-ভালোবাসা ছিল?

মিসেস ঘোষ একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, এ প্রশ্নের জবাব কি দেব, ভেবে পাচ্ছি না। অলকার বয়স হয়েছে, সুন্দরী শিক্ষিতা। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়েছে, তখন অনেক ছেলের সঙ্গেই ভাবটাব আছে কিন্তু কাউকে ভালোবাসে কিনা, তা কি আমার জানা সম্ভব?

উনি মুহূর্তের জন্য একটু থেমে বলেন, অলকা আবার বেশ স্বাধীনচেতা ও একগুঁয়ে। ও অদ্ভুত কিছু করলেও আমি অন্তত অবাক হবো না।

—ওঁর অমতে কী বাড়ি থেকে বিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে?

—না, না, কোনোদিন না।

—অলকানন্দা দেবীর মা বাড়িতে আছেন তো?

—হ্যাঁ, আছেন।

—তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলব।

মিসেস ঘোষ বাড়ির ভেতরে চলে যান। দু'এক মিনিট পরই শীলাদেবীকে নিয়ে ড্রইংরুমে এসেই সাব-ইন্সপেক্টরকে বলেন, ইনিই অলকার মা।

সাব-ইন্সপেক্টর ব্যানার্জী দু'হাত জোড় করে নমস্কার করাব সঙ্গে সঙ্গেই অলকার মাও দু'হাত জোড় করে নমস্কার করেন।

সাব-ইন্সপেক্টর ব্যানার্জী অত্যন্ত সসম্ভ্রমে বললেন, আপনার মেয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছে। নিশ্চয়ই আপনার মন খুব খারাপ। তবু আপনাকে একটু বিরক্ত করব। দয়া করে কিছু মনে করবেন না।

শীলাদেবী মাথায় আঁচলটা একটু টেনেই বললেন, আপনি তো আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন। আপনার উপর কী আমি রাগ করতে পারি?

মিসেস ঘোষ পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর বললেন, প্লীজ, আপনি এ ঘরে থাকবেন না। আর যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দেবেন।

ওর কথা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মিসেস ঘোষ বললেন, আপনারা কথা বলুন। আমি পাশের বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।

মিসেস ঘোষকে ওভাবে চলে যেতে দেখে সাব-ইন্সপেক্টর একটু চাপা হাসি হাসেন। তারপর শীলাদেবীর দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি আপনার ছেলেব মতো। আপনি যদি বিশ্বাস করে আমাকে সব কিছু খোলাখুলি বলেন, তাহলে খুব ভালো হয়।

উনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, নিশ্চয়ই আপনি আমার ছেলের মতো। আপনাকে কোনো কিছু বলতেই আমার আপত্তি নেই।

—দেখুন, আপনার ভাই'এর কাছ থেকে জেনেছি, আপনার মেয়ে বরাবর খুব ভালো

রেজাল্ট করেছেন এবং এক কথায় অত্যন্ত ভালো মেয়ে।...

শীলাদেবী একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে আমার মেয়ে সত্যি খুব ভালো। আপনি ওর স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির বন্ধু-বান্ধব অধ্যাপকদের কাছে জিজ্ঞেস করলেও জানতে পারবেন...

সাব-ইন্সপেক্টর ব্যানার্জী একটু হেসে বলেন, সন্তানকে মায়ের চাইতে বেশি ভালো করে তো কেউ চিনতে-জানতে পারে না। আপনি যখন প্রাণ খুলে তাকে ভালো বলছেন, তখন তিনি যে সত্যি ভালো, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

সাব-ইন্সপেক্টর একটু থেমে প্রশ্ন করেন, আপনারা অন্য কোথাও না থেকে এই ভাইয়ের কাছে কেন আছেন?

—আমার এই ভাই যখন বছরখানেকের, তখন মা খুব অসুস্থ হন। ওকে আমিই খাইয়ে-দাইয়ে স্নান করিয়ে দিতাম। ও আমার কাছে ছাড়া কারুর কাছে ঘুমোতেও পারতো না।

শীলাদেবী এক নিঃশ্বাসে বলে যান, আমিও যেমন এই ভাইকে ভালোবাসি, এই ভাইও আমাকে প্রায় মায়ের মতোই সম্মান করে, ভালোবাসে।

—আপনারাই ভাইয়ের স্ত্রী বলছিলেন, আপনি পেনসনের কিছু টাকা ভাইকে দেন।

—আমি পেনসনের পুরো টাকাই ভাই-বউকে দিয়ে দিই।

—পুরো টাকা মানে কত টাকা?

—এখন আমি মাসে মাসে চোদ্দশ' পঁয়ত্রিশ টাকা পাই। আগে কম পেতাম।

—আপনারা বা আপনার মেয়ের জন্য কিছুই রাখেন না?

—আমার স্বামীর গ্র্যাচুইটি-প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তো ব্যাঙ্কে জমা আছে। দরকার হলে সেখান থেকে কিছু তুলে নিই।

—আপনার মেয়ের পড়াশুনার খরচ?

—ওর পড়াশুনার জন্য তো বিশেষ খরচ করতেই হল না। স্কলারশিপের টাকাতেই—

—আপনার ভাইয়ের কাছে জেনেছি, আপনাব মেয়ে তো ইউ.জি.সি. ফেলোশিপও পেয়েছেন।

—হ্যাঁ।

—এবার বলুন, আপনার মেয়ে কি কোনো ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চেয়েছে?

—না। ও প্রেম-টেম করার মধ্যে নেই।

—উনি বিয়ে করবেন না?

—করবে না কেন?

—আপনারা কি বিয়ের চেষ্টা করেছেন?

শীলাদেবী একটু চুপ করে থাকার পর বলেন, তাহলে আপনাকে খোলাখুলি একটা কথা বলি।

—হ্যাঁ বলুন।

—আমার ভাই-বউয়ের পিসতুতো ভাই দীপু আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য পাগল। এ ব্যাপারে আমার ভাই-বউও খুব উৎসাহী কিন্তু ঐ অশিক্ষিত ভালগার ছেলেটাকে আমার মেয়ে সহ্য করতে পারে না।

এবার সাব-ইন্সপেক্টর সোজাসুজি প্রশ্ন করেন, ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই কি আপনার মেয়ে এ বাড়ি থেকে চলে গেছেন?

—খুব সম্ভব তাই, কিন্তু আমাকে সে কথা বলেনি।

—আপনাকে কী বলে গিয়েছেন?

—বলেছে, কিছুদিন ঘুরে-ফিরে বেড়াবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে রিসার্চের কাজও করবে। তাছাড়া একটা চাকরি-বাকরি জোগাড় করারও চেষ্টা করবে।

—উনি মামা-মামীকে বলে গেলেন না কেন?

—ওর মামী আর দীপু কিছুতেই ওকে যেতে দিত না।

—আর মামা?

—আমার ভাই খুবই শান্তিপ্রিয় মানুষ। ও স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক-ঝগড়া কবা একেবারেই পছন্দ করে না।

—আপনার মেয়ের সঙ্গে টাকাকড়ি আছে তো?

—ফেলোশিপের বেশ কয়েক হাজার টাকা ওর কাছে আছে।

—আপনার মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে না?

—না। তেমন কিছু না।

—কেন?

—আমি জানি, আমার মেয়ে কোনো অন্যায় কাজ করবে না।

—কিন্তু কোনো বিপদ-আপদে তো পড়তে পারেন?

—বিপদ-আপদ ঘটার ভয় থাকলে কী মেয়েকে এভাবে লেখাপড়া করাতে পারতাম? বিপদ-আপদ কী এই কলকাতা শহরে ঘটতে পারে না?

শীলাদেবীর কথা শুনে সাব-ইন্সপেক্টর ব্যানার্জী একটু খুশির হাসি হেসে বলেন, আপনার মেয়ে কোথায় গিয়েছেন বলে আপনার মনে হয়?

—ঠিক বলতে পারব না ; তবে আমার ধারণা, ও উদয়পুরে গিয়ে প্রফেসর চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করার পর হয়তো রাজস্থানেই ঘুরে ফিরে বেড়াবে।

—প্রফেসর চ্যাটার্জীর কাছে কেন যেতে পারেন?

প্রেসিডেন্সিতে প্রফেসর চ্যাটার্জীর কাছে ও পড়েছে। আমার মেয়েকে উনি নিজের মেয়ের মতোই স্নেহ করেন আর আমার মেয়েও ওকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করে।

—প্রফেসর চ্যাটার্জী এখন উদয়পুরে আছেন?

—হ্যাঁ, উনি ওখানে ডীন।

—ও!

সাব-ইন্সপেক্টর ব্যানার্জী মুহূর্তের জন্য একটু ভেবে জিজ্ঞেস করেন, আপনার মেয়ে কী আর কারুর সঙ্গে গিয়েছেন।

—না, বাবা, তা বলতে পারব না। মাথার ঘোমটা আবার একটু টেনে নিয়ে বলেন, আমি কোনো ব্যাপারেই মেয়ের কাছে খুব বেশি কিছু জানতে চাই না।

—কেন? সাব-ইন্সপেক্টর একটু অবাক হয়েই জানতে চান।

উনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, যেটুকু আমার জানার প্রয়োজন, তা সে নিজেই জানিয়ে

দেয়। এবার একটু থেমে বলেন, হাজার হোক মেয়ে বড় হয়েছে, লেখাপড় শিখেছে ; তার ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পর্কে কী আমার খুব বেশি কৌতূহল থাকা উচিত

সাব-ইন্সপেক্টর কলম বন্ধ করে পকেটে রেখেই কাগজপত্র গুছিয়ে নেবার পর বলেন আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। মাফ করবেন।

—না, বাবা, কী আর কষ্ট! বরং আমার মেয়ের জন্য আপনাকেই কষ্ট করে আসত হল।

—এ তো আমাদের দৈনন্দিন কাজ।

সাব-ইন্সপেক্টর দু'হাত জোড় করে নমস্কার করার পর দরজার বাইরে পা দিয়ে বললেন, আপনার ভাইকে বলবেন, আপনার মেয়ের কয়েকটা ছবি নিয়ে আমার সঙ্গে এক যোগাযোগ করতে।

—হ্যাঁ, বলব কিন্তু আমার মেয়ের তো বিশেষ ছবি-টবি নেই।

—যে ছবি আছে, তাই পাঠাবেন।

* * *

বিনয়বাবু পরের দিন অফিস থেকে ফেরার পথে থানায় গিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর সুদীং ব্যানার্জীর টেবিলের সামনে দাঁড়াতেই উনি জিজ্ঞেস করলেন, ছবি এনেছেন?

বিনয়বাবু সামনের চেয়ারে বসে ব্রীফকেস্ খুলতে খুলতেই বলেন, ইদানীংকালে তে ওর কোনো ছবি তোলা হয় নি, তাই যা ছিল, তাই নিয়ে এসেছি।

—কই, দেখি।

বিনয়বাবু ওর হাতে দুটি ছবি দিতেই উনি এক ঝলক দেখেই বলেন, এ ছবি তো অনেক দিন আগের।

—হ্যাঁ, ও তখন স্কুলের সেভেন-এইটে পড়ে।

—এ ছবি দেখে তো ওকে এখন আইডেনটিফাই করা যাবে না।

—কিন্তু আমাদের বাড়িতে তো ওর আর কোনো ছবি নেই।

বন্ধু-বান্ধব বা আপনাদের সঙ্গে তোলা কোনো গ্রুপ ফটোও নেই?

—বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ছবি-টবি তুলেছে কিনা তা তো বলতে পারবো না ; তবে আমাদে কাছে ওর কোনো ছবি নেই।

সাব-ইন্সপেক্টর ব্যানার্জী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রায় আপনমনেই বলেন, তাহলে তো মুশকিল হলো।

একটু চুপ করে থাকার পর বিনয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, আমার ভাগ্নীকে খুঁজে বে করার ব্যাপারে কী একটু এগিয়েছেন?

—তেমন কিছু না।

—বেশ ক'দিন হয়ে গেল, তাই...

বিনয়বাবু কথাটা শেষ করেন না।

—আজ আমি ও-সি'র সঙ্গে কথা বলব। দেখি, উনি কি বলেন।

—আমি কী কাল একবার আসব?

—একবার টেলিফোন করবেন। যদি কিছু খবর থাকে, তাহলে আপনাকে জানিয়ে দেব

একটা লম্বা টানা দীর্ঘশ্বাস ফেলার পর অলকানন্দা আপনমনে একটু হাসে। মনে মনে ঃ যেন ভাবে। তারপর স্বগতোক্তি করে, জল তাহলে অনেক দূর গড়িয়েছে।

সুদীপ্ত কোনো কথা বলে না। চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দু'এক মিনিট পর অলকানন্দা সুদীপ্তর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে থেকে একটু চাপা াসি হেসে বলে, যদি আমি আপনার সঙ্গে না ফিরে যাই?

সুদীপ্ত কোনো ভাবাবেগ প্রকাশ না করে বলে, আমার বিশ্বাস, আপনি আমার সঙ্গে লকাতা ফিরবেন।

—যদি না যাই?

—আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার উপায় আছে কিন্তু আমি তা চাই না।

—গায়ের জোরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান?

সুদীপ্ত মাথা নেড়ে বলে, না, কখনই না।

—তাহলে?

—আমার স্থির বিশ্বাস, আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন।

—কিন্তু কেন আমি আপনার অনুরোধ রাখব?

—বোধহয় আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

—শুভাকাঙ্ক্ষী? ঠোঁটের কোণায় চাপা কৌতুকের হাসি হেসে অলকানন্দা বলে, লিশের চাকরি করতে গিয়ে যেসব চোর-ডাকাত-খুনীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়, াদের সবারই কী আপনি শুভাকাঙ্ক্ষী?

সুদীপ্ত বিন্দুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ না করে বলে, অভাব-অনটনের জন্য পুলিশের চাকরি িয়েছি বলে কি আমার সব মনুষ্যত্ব চলে গেছে?

ও মুহূর্তের জন্য থেমে আবার বলে, আপনি যত বিদ্রূপই করুন, তবু বলছি, আমি াপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

অলকানন্দা সঙ্গে সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারে না। বরং ওকে বিদ্রূপ করার জন্য, পমান করার জন্য মনে মনে দুঃখ পায়। ও একটু সলজ্জ দৃষ্টিতে সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে লে, আপনি কী করে পুলিশে চাকরি করছেন?

—কেন বলুন তো? একটু অবাক হয়ে সুদীপ্ত পাল্টা প্রশ্ন করে।

—আপনার মতো ভদ্র ছেলের পক্ষে পুলিশের চাকরি করা সম্ভব?

সুদীপ্ত একটু হেসে বলে, তিন বছর তো চাকরি করছি। তারপর একটু থেমে বলে, াপনি একটা ভালো চাকরি দিলেই পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিতে পারি।

—ভালো চাকরি মানে?

—এখনও তিরিশ-বত্রিশ হাজার টাকা দেনা আছে। ঐ দেনাটা শোধ করার পর হয়তো াজেই আমি চাকরিটা ছেড়ে দেব।

—কেন?

—পুলিশের চাকরিতে যেমন পরিশ্রম, তেমনি ঝামেলা। তাছাড়া এ কাজ করে একটুও নের আনন্দ পাই না।

—কী ধরনের চাকরি আপনার পছন্দ?

—আমার বাবা সারাজীবন স্কুল মাস্টারি করেছেন বলে ওঁর স্বপ্ন ছিল, আমি কলে৻ পড়াব, কিন্তু তা তো আর সম্ভব না। যে কাজে একটু বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার হয়, আমি সে ধরনের যে কোনো চাকরি পেলেই খুশি।

—সে ধরনের চাকরির চেষ্টা করেছেন?

সুদীপ্ত মাথা নেড়ে বলল, না।

—কেন?

—মা'র অসুখের দেনাগুলো শোধ না করা পর্যন্ত নতুন কিছু করার উৎসাহবোধ ক না। এবার ও একটু থেমে বলল, আমার কথা বাদ দিন। আপনি মামা-মামীকে কিছু জানিয়ে হঠাৎ উধাও হলেন কেন?

—মামা-মামীর ওখানে আর ভালো লাগছে না।

—কিন্তু আপনার মামাকে তো বেশ ভালো মানুষ মনে হয়।

—মামা সত্যি ভালো মানুষ কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন। তাছাড়া যে কোনো কারণেই হোক, মা আমাকে সহ্য করতে পারে না।

—সে তো খুব স্বাভাবিক। সুদীপ্ত হাসতে হাসতেই বলে।

অলকানন্দা অবাক হয়ে বলে, স্বাভাবিক কেন?

—আপনি মামীর চাইতে অনেক বেশি শিক্ষিতা, অনেক বেশি সুন্দরী। সুতরাং...

—সুতরাং উনি মামী হয়েও আমাকে হিংসা করবেন?

সুদীপ্ত আবার একটু হাসতে হাসতেই বলে, শুনেছি, অনেক মা নিজের মেয়েকেও এক বিশেষ বয়সে ঠিক সহ্য করতে পারেন না।

অলকানন্দা একটু হেসে বলে, আমার এক বন্ধুও বলতো, ওর মা ওকে সহ্য কর৻ পারেন না।

—বাই দ্য ওয়ে, দীপুবাবুকে দেখলাম, আপনার ব্যাপারে খুব উৎসাহী।

—হি ইজ এ স্কাউন্ড্রেল!

এবার সুদীপ্ত বলে, আচ্ছা, দীপুবাবু কী আপনাকে বিয়ে করতে চায়?

—শুধু দীপুবাবুর না, আমার মামীরও তাই ইচ্ছা।

—ওর উপর এত রাগের কারণ?

—ঐ অশিক্ষিত রুচিহীন, লোভী মানুষটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। বিয়ে করা ৻ দূরের কথা, ওকে দেখলেই আমার সারা শরীর জ্বলে যায়।

একবার বুক বরে নিশ্বাস নিয়ে অলকানন্দা আবার বলে, ঘটনাচক্রে আপনি আমাদে অনেক কথাই জেনেছেন। তাইতো আপনাকে বলতে আমার দ্বিধা নেই যে ঐ দীপু আ মামীর জন্যই আমি চলে এসেছি। গত চার-পাঁচ বছর ধরে ওরা দু'জনে আমাকে যে বিরক্ত করছে, তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।

—এ ব্যাপারে আমাকে কেউ কিছু না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি।

—দেখুন সুদীপ্তবাবু, আমার বারো বছর বয়সের সময় বাবা মারা যান কিন্তু তিনি আমা৻ বা মাকে পথের ভিখারী করে যাননি। মামী আর দীপু খুব ভালো করেই জানেন, বাবা

গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ট ফ্যান্ড ইন্সিওরেন্সের একটি পয়সাও মা নষ্ট করেননি। সব ব্যাঙ্কে জমা আছে।

—স্কুল-কলেজে পড়াশুনার খরচ...

সুদীপ্ত প্রশ্নটা শেষ করার আগেই অলকানন্দা বলে, আমার এক পিসী আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। তিনিই আমার স্কুল-কলেজের সব খরচ দিতেন।

—ও!

—আমার ঐ পিসীর কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি। পিসী-পিসেমশাই দু'জনেই আমাকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। পিসী মারা যাবার পর পিসেমশাই ওঁর সব গহনাপত্তর আমাকে দিয়ে দেন।

—পিসেমশাই কোথায় থাকেন?

--উনিও বছর-খানেক হ'ল মারা গিয়েছেন।

—উনি কী করতেন?

—মার্টিন বার্নে সাধারণ কেরানি ছিলেন। অলকানন্দা একটু থেমে বলে, পিসীর গহনাপত্তর যেমন আমাকে দিয়েছেন, তেমনি নিজের সব টাকাকড়ি রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালে দিয়ে গেছেন।

একটু পর সুদীপ্ত একটু চাপা হাসি হেসে বলে, মোটকথা আপনি বেশ বড়লোক। সুতরাং আপনাকে বিয়ে করার ব্যাপারে দীপুবাবুর উৎসাহের যথেষ্ট কারণ আছে।

—আপনিও কী দীপুর সাপোর্টার হয়ে গেলেন? হাসতে হাসতে অলকানন্দা প্রশ্ন করে।

হাসতে হাসতেই সুদীপ্ত জবাব দেয়, অমন গুণী মানুষের সাপোর্টার হবার অধিকার আমার আছে?

হাসি থামলে সুদীপ্ত বলে, এবার বলুন, আপনি কী আমার অনুরোধ রাখবেন?

--আপনিই বলুন না আমার কী করা উচিত।

—আপনাকে পরামর্শ দেবার অধিকার কি আমার আছে?

—ওসব অধিকার-টধিকারের কথা বাদ দিন। আমি যখন আপনার পরামর্শ চাইছি, আপনার তো দ্বিধা করার কারণ নেই।

সুদীপ্ত ওর দিকে তাকিয়ে বলে, দেখুন, আপনার আসল সমস্যা সমাধানের দুটি উপায় আছে। আপনি একটা চাকরি জোগাড় করে মাকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে পারেন অথবা এমন কাউকে আপনাকে বিয়ে করতে হবে, যেখানে আপনার মা সসম্মানে থাকতে পারেন।

অলকানন্দা চুপ করে ওর কথা শোনে।

সুদীপ্ত আবার বলে, হঠাৎ মামা-মামীর সংসার থেকে উধাও হয়ে তো আপনার আসল সমস্যার সমাধান হয়নি, হবেও না।

—ঠিক বলেছেন। অলকানন্দা গম্ভীর হয়ে বলে।

কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। সুদীপ্ত হাতের ঘড়ি দিকে তাকিয়েই বলে, চলুন, খেয়ে আসি। এর পর আর খাবার পাবো না।

—হ্যাঁ চলুন।

খাওয়া-দাওয়ার পর কটেজের দিকে যেতে যেতে অলকানন্দা সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে

জিজ্ঞেস করে, দিবানিদ্রার অভ্যাস আছে নাকি?

সুদীপ্ত একটু হেসে বলে, পুলিশের চাকরি করার দৌলতে দিবানিদ্রা তো দূরের কথা, রাত্তিরে ঘুমোবার অভ্যাসও প্রায় চলে গেছে।

অলকানন্দা ওর কটেজের দরজা খুলতে খুলতে বলে, তাহলে ভিতরে আসুন ; গল্প করা যাবে।

—আপনি বিশ্রাম করবেন না?

—সারা দিনরাত্তিরই তো বিশ্রাম করছি। অলকানন্দা ঘরের মধ্যে পা বাড়িয়েই বলে, আসুন, আসুন।

সুদীপ্ত ওর পিছন পিছন ঘরে ঢুকেই একবার ঘরের চারদিকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিতেই বেড সাইড টেবিলের ছবিটা দেখেই জিজ্ঞেস করল, আপনার বাবার ছবি?

—হ্যাঁ।

—বাঃ! ভারী সুন্দর দেখতে ছিলেন তো!

অলকানন্দা ওকে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলে, বাবা সত্যি খুব সুপুরুষ ছিলেন।

সুদীপ্ত চেয়ারে বসেই বলে, আপনাব মা কিন্তু খুব স্নিগ্ধ শান্ত মানুষ।

উল্টো দিকের চেয়ারে বসেই অলকানন্দা বলে, মা সত্যি খুব স্নিগ্ধ শান্ত প্রকৃতির মানুষ।

সুদীপ্ত পকেট থেকে সিগারেট-দেশলাই বের করে বলে, ঘরের মধ্যে সিগারেট খেলে কি আপনার অসুবিধে হবে?

অলকানন্দা একটু হেসে বলে, সিগারেট কেন, আপনি ড্রিঙ্ক করলেও আমার আপত্তি নেই।

সুদীপ্ত সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিয়েই বলে, আপনার মামা কি রেগুলার ড্রিঙ্ক করেন?

—না, না, আমার মামার ওসব নেশা-টেশা নেই। তবে আমার প্রিয়তম অধ্যাপক নিয়মিত ড্রিঙ্ক করেন।

—আপনি কী প্রফেসর চ্যাটার্জীর কথা বলছেন?

—হ্যাঁ।

—আপনাব সামনেই উনি ড্রিঙ্ক করতেন?

—উনি লুকিয়ে-চুরিয়ে ড্রিঙ্ক করেন না। ওর স্ত্রী বা মেয়ে ছাড়াও আমিও কতদিন ওঁর গেলাসে হুইস্কী ঢেলে দিয়েছি।

—আচ্ছা!

অলকানন্দা বলে, ড্রিঙ্ক করলেই যে মানুষ মাতাল বা খারাপ হয় না, তা ওঁকে দেখেই বুঝেছি।

—তা ঠিক।

—আপনি ড্রিঙ্ক করেন?

—না।

—কেন? ভয় করে, নাকি অপছন্দ করেন?

সুদীপ্ত বলে হাজার হোক স্কুল মাস্টারের ছেলে। একটু দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকা তো খুবই

ভাবিক। ঐসব সখ-আনন্দের জন্য খরচ করার ক্ষমতাও আমার নেই।

অলকানন্দা হাসতে হাসতে বলে, আপনি নিছকই একটা ভালো মানুষ।

সুদীপ্ত হাসতে হাসতে জবাব দেয়, যাক, বড় মাসী ছাড়া আরো একজনকে পেলাম যে আমাকে ভালো মনে করে।

—বড় মাসী ছাড়া আর কেউ আপনাকে ভালো বলে না?

—না। প্রায় সবার ধারণা আমি বোকা মানুষ।

—এ ধারণার কারণ?

—যে পুলিশ অফিসার ঘুষ নেয় না, পরের পয়সায় মদ খায় না, বা কলগার্লদের ভয় দেখিয়ে তাদের সঙ্গে স্ফূর্তি করে না, সে বোকা না?

কথাটা শুনে অলকানন্দার মুখখানা গম্ভীর হয়ে যায়। একবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, হতভাগারা তো জানে না, অসৎ বা চরিত্রহীন হবার চাইতে বোকা হওয়া অনেক সম্মানের।

সুদীপ্ত একটু হেসে বলে. আমার কথা বাদ দিন। বলুন, কবে কলকাতা যাবেন?

—এখন কলকাতা ফিরে যাবো?

—হ্যাঁ, তাই বোধহয় ভালো।

—তারপর?

—চাকরি নিয়ে অন্য কোথাও চলে যান বা বিয়ে করে স্বামীর ঘর করুন। তাছাড়া ইউ-জি-সি'র ফেলোশিপ পাওয়াও তো একটা চাকরির সমান।

—তা বলতে পারেন। সত্যি, আজকাল ওরা বেশ ভালো টাকা দেয়।

—কালকের টিকিট কাটতে বলে দেব?

অলকানন্দা অবাক হয়ে বলে, কাকে টিকিট কাটতে বলবেন?

—একজন বুড়ো কনস্টেবলও আমার সঙ্গে এখানে এসেছে।

—হা ভগবান! আপনি আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য একজন কনস্টেবলকেও সঙ্গে এনেছেন? অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েই অলকানন্দা কথাগুলো বলে।

সুদীপ্ত অত্যন্ত ধীর স্থির ভাবে জবাব দেয়, আপনি ছেলে হলে আমি একলাই আসতে পারতাম।

—আমি মেয়ে বলে একজন কনস্টেবলকে সঙ্গে আনতে হবে?

—হ্যাঁ। সুদীপ্ত একটু হেসে বলে, একলা এসে আমি যদি মাঝপথে আপনার সঙ্গে কোনোরকম খারাপ কিছু...

—বুঝেছি।

মিনিট খানেক চুপ করে থাকার পর সুদীপ্ত বলে, একটা কথা বলব?

—বলুন।

—এখান থেকে একটা ট্রেনে যোধপুর যেতে হবে; সেখান থেকে আরেকটা ট্রেনে দিল্লি। তারপর দিল্লি থেকে কলকাতা যেতে হবে।

—জানি।

—আমি কনস্টেবলকে কাল সকালেই দিল্লি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও আমাদের জন্য শনিবারের রাজধানী এক্সপ্রেসের দুটো টিকিট কেটে রাখুক।

—আর ঐ সিপাহী মহারাজ কী করবে?

—ও রবিবার সকালে কালকা মেল'এ রওনা হবে।

—তা হতে পারে, কিন্তু...

—কিন্তু কী?

—যোধপুর উদরপুর বা জয়পুরে কয়েকদিন না কাটিয়েই চলে যাব?

—ওসব জায়গা তো পালিয়ে যাচ্ছে না, পরে আসবেন।

অলকানন্দা দু'এক মিনিট ভাবনা-চিন্তা করে বলে, ঠিক আছে, কিন্তু একটি শর্ত

—বলুন কি শর্ত।

—আপনার সঙ্গে আমি বাড়িতে ফিরব না। হাওড়া স্টেশন থেকে আমি একলাই যাবো। আপনি পরের দিন আমার খবর নিতে আমাদের বাড়ি আসবেন।

—তাই হবে।

বেশ কয়েকদিন পর মাকে কাছে পেয়ে অলকানন্দা ছোট্ট বাচ্চার মতো ওকে জ শুয়ে কত কথা, কত আলোচনা করে।

—আচ্ছা মা, মামা পুলিশে খবর দিল কেন?

—দীপুই তো জোর জুলুম করে ওকে পুলিশের ওখানে নিয়ে গেল। শীলাদেবী থেমে বলেন, তবে যে পুলিশ অফিসারটি বাড়িতে এসেছিল তাকে দেখে আমার মন গেছে।

—কেন?

—ছেলেটাকে যেমন সুন্দর দেখতে, সেইরকম ভদ্র-সভ্য ব্যবহার। ওকে দেখ ভালোবাসতে ইচ্ছে কববে।

অন্ধকারে মুখ টিপে হাসতে হাসতে অলকানন্দা বলে, তাই নাকি?

শীলাদেবী মেয়ের মাথায় হাত দিতে দিতে বলেন, সত্যি বলছি, ঐ রকম একটা জ হলে বড় ভালো হত।

—দারোগাবাবুকে তোমার এতই ভালো লাগল যে জামাই করতে ইচ্ছে কবছে?

শীলাদেবী একটু গম্ভীর হয়ে বলেন, দারোগা বলে ঠাট্টা করছিস কেন? দারোগার মানুষ না?

উনি মুহূর্তের জন্য একটু থেমে বলেন, ছেলেটিকে দেখলেই বোঝা যায়, অত্যন্ত পরিবারের ছেলে। তাছাড়া কথাবার্তা শুনতে বুঝেছি, লেখাপড়াও যথেষ্ট করেছে। ত হলে কি আমার এমনি এমনি জামাই করতে ইচ্ছে করল?

অলকানন্দা দুহাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, সত্যি তুমি জামাই করতে চাও?

—আমার মন তো তাই চাইছে।

মার মুখের উপর মুখ নিয়ে অলকানন্দা খুব চাপা গলায় বলে, মা, আমারও তাই ই

শীলাদেবী মেয়ের কপালে একবার চুমু খেয়েই দু'হাত জোড় করে কপালে ঠে বললেন, ঠাকুর! সবই তোমার ইচ্ছা।

বর্ধমান লোক্যাল

া আশ্চর্য! ঐ লোকটা আজকেও আবার আমার কামরায় উঠেছে? লোকটার মতলব কী?

অদিতি মুহূর্তের জন্য লোকটাকে একবার দেখে নিয়েই দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। মনে মনে লে, থাক, থাক, আর ভদ্দরলোকের ভান করতে হবে না। লোক্যাল ট্রেনে বা ট্রামে-বাসে 'একটা পত্র-পত্রিকা পড়লেই ভদ্দরলোক হওয়া যায় না। ওসব আমার খুব জানা আছে।

হাজার হোক, রাত আটটা কুড়ির লোক্যাল। অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই ট্রেন ছুটছে। ানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। তবু অদিতি কয়েক মিনিট জানলা য়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কামরার মধ্যে দৃষ্টি ঘুরিযে নিয়েই অদিতি মনে মনে বলে, না, না, জানলা দিয়ে বাইরের কে তাকিয়ে থাকা ঠিক নয়। আমাকে অন্যমনস্ক দেখে লোকটা যদি হঠাৎ আমার মুখ পে ধরে?

ও লুকিয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেই ঠিক করে, একটু সতর্ক থাকতে হবে। যদি াকটা সত্যি কোনো বদ মতলবে এগিয়ে আসে, তাহলে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে াকটাকে জুতাপেটা করতে হবে।

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েও অদিতি যেন হোঁচট খায়।

কিন্তু...

যদি জুতাপেটা করার সুযোগ না পায়? তার আগেই ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে ট্রেন স্টেশনে াকার মুখে লাফিয়ে পড়ে?

তাহলে কী করা যাবে?

তবু ভালো, অন্য কোনো ক্ষতি তো করল না।

আচ্ছা যদি লোকটা ছুরি বেব করে? যদি গলার কাছে ছুরি ধরে হাতের কঙ্কন আর ঘড়িটা লে দিতে বলে?

সঙ্গে সঙ্গে অদিতির কত ঘটনা মনে পড়ে যায়।

এই তো মাস তিনেক আগেকার কথা। বোধহয় এই আটটা কুড়ির ট্রেনেই শেফালীদি য়েকে নিয়ে চন্দননগর যাচ্ছিলেন। বর্ধমানের পর দু'তিনটে স্টেশন পার হতেই একটা দ্রঘরের ছেলে হঠাৎ শেফালীর মুখের সামনে ছুরি ধরে বলল, চটপট আপনার ঘড়ি আর লার হার-টার খুলে দিন।

ছেলেটার কাণ্ড দেখে শেফালীদি ভয়ে আতঙ্কে কিছু বলতে গিয়েও মুখ দিয়ে কিছু শব্দ র করতে পারেন না।

ছেলেটা খ্যাপা কুকুরের মতো হুঙ্কার দিয়ে শেফালীদির মেয়েকে বলল, কী রে ছুঁ
গায়ে হাত না দিলে কি খুলতে পারছিস না?

আঠারো বছরের মেয়েটা ভয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠতেই শেফালীদি আর এ
মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে নিজের ঘড়ি আর হার খুলতে-খুলতেই মেয়েকে বললেন, নে (
চটপট খুলে দে।

ছেলেটা সবকিছু পকেটে পুরে অন্ধকারের মধ্যেই পরের স্টেশনে নেমে গেল। কামব
যে তিন-চারজন লোক ছিল, তারা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করল না।

শেফালীদি বলছিলেন, তোমরা ভাবতে পারবে না ছেলেটাকে দেখতে কি সুন্দর। অত
ভদ্রঘরের ছেলে না হলে অত সুন্দর দেখতে হতে পারে না।

আবার অদিতি মুহূর্তের জন্য লোকটাকে দেখে নিয়েই মনে মনে বলে, এই হতভাগা
দেখতেও বেশ সুন্দর। যেমন গায়ের রঙ, সেইরকমই চোখ-মুখ। দেখে তো মনে হয়, উনি
অত্যন্ত ভদ্রঘরের ছেলে কিন্তু দেখতে সুন্দর হলেই কী স্বভাব-চরিত্রও ভালো হয়?

অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যেও ও একটু চাপা হাসি হাসে।

ওরে বাপু, তোমার মতলব কী আমি বুঝতে পারিনি? যদি অত সাধুই হবে, তাহ
ঠিক পর পর দু'সপ্তাহ আমার কামরাতেই উঠবে কেন? এত বড় টেনে আর কোথাও উঠ
না কেন?

দৃষ্টিটা কামরার চারপাশে ঘুরিয়ে নিতেই অদিতি দেখে, সেই দুটো লোক, এখনও ব্য
মাথায় দিয়ে ঘুমুচ্ছে। ভগবান জানেন, ওরা কোথায় যাবে। তবে দেখে মনে হয়, বোধহ
সারাদিন পরিশ্রম করে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েই ঘুমুচ্ছে। নির্ঘাৎ ছোটখাটো ব্যবসাদার। এই ধরনে
রাত্রের ট্রেনে নিশ্চয়ই নিয়মিত যাতায়াত করে। তা না হলে অত নিশ্চিন্তে কি ঘুমানো যায়

হঠাৎ ট্রেনটা থামতেই ও জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। হা ভগবান! এতক্ষ
দেবীপুর এলো? আমি তো ভেবেছিলাম, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে ব্যান্ডেল আসবে। একজ
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এই কামরায় উঠলেন। যাক, তাও ভালো।

একবার মনে হল, ওদের জিজ্ঞেস করি, আপনারা কোথায় যাবেন? না, না, কী দরকার
ঐ হতভাগা ঠিক মনে করবে, আমি ভয় পেয়েছি। ওকে কিছুতেই বুঝতে দেব না, আ
একটু চিন্তিত, আতঙ্কিত।

কী আশ্চর্য! ঐ বুড়ো-বুড়ি পরের স্টেশন বৈঁচিতেই নেমে গেল? আহাহা! কী দরক
ছিল এই পাঁচ-সাত মিনিটের জন্য এই কামরায় ওঠার?

রাগে দুঃখে দুশ্চিন্তায় অদিতি যেন নিজের উপরই রাগ করে। খেয়ালই করে না, কখ
কোথায় ট্রেন থামছে।

হঠাৎ অল্পবয়সী এক দম্পতি কামরায় উঠতেই অদিতির খেয়াল হল, পাণ্ডুয়া ছাড়ল

এদের পোশাক-পরিচ্ছদ হাব-ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে, এরা গ্রাম-গঞ্জের লোক ন
নিশ্চয়ই কলকাতায় থাকে। বোধহয় কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে নেমন্তন্ন খে
ফিরছে। যাক, ভালোই হল। লোকটার বদ মতলব থাকলেও ওদের সামনে বোধহয় কি
করতে সাহস হবে না।

কিন্তু...

ছুরি দেখে যদি ওরাও ভয় পায়?

তবে ওরা দু'জনে তো বেশ খানিকটা দূরে বসে আছে। ওদের দু'জনকে আর আমাকে ı একসঙ্গে ছুরি দেখাতে পারবে না! ওদের সামনে ছুরি বের করলেই আমি অ্যালার্ম চেন...

না, না, না তো হবে না। হতচ্ছাড়া রেল কোম্পানি বোধহয় লোক্যাল ট্রেনে অ্যালার্ম ্নের কারবারই তুলে দিয়েছে।

তাহলে!

যা থাকে কপালে, আমি ঠিক ট্রেন থেকে লাফ দেব। তারপর যা হয় হোক।

যে দুটো লোক এতক্ষণ অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, তারা হঠাৎ উঠে বসেই একবার বাইরের ক দেখে নিয়েই চুপ করে বসে থাকে। পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই ওরা নেমে যায়। ট-দশ মিনিট পরে মগরায় ঐ দম্পতি নেমে যেতেই অদিতির মুখ শুকিয়ে যায়।

মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করলেও অজানা বিপদের চিন্তায় ও শিউরে ওঠে।

এখন ওকে একা পেয়ে যদি লোকটা ওর গায়ে হাত দেয়? যদি ওর সর্বনাশ করে? ...

ওরা দু'জন ছাড়া কামরায় আর কেউ নেই। বাধা দেবারও কেউ নেই ; চক্ষুলজ্জারও নো ঝামেলা নেই।

অদিতি ভেবে কূল-কিনারা পায় না।

লোকটাকে সাক্ষাৎ যমদূত মনে হয়। ওর মুখ দেখলে গা জ্বলে যাবে কিন্তু তবু একবার দিকে না তাকিয়েও পারে না।

লোকটা বই পড়ছে?

ওকে দেখে অদিতির হাসি পায়। মনে মনে বলে, তোমার ভণ্ডামিতে আমি ভুলছি না। মার যদি কোনো বদ মতলবই না থাকে, তাহলে আমাকে দেখে এই কামরায় উঠেছিলে ন?

এইসব আকাশ-পাতাল ভাবতে-ভাবতেই আটটা কুড়ির লোক্যাল ব্যান্ডেল পেরিয়ে । দেখতে দেখতে হুগলি-চুঁচুড়া-চন্দননগরও চলে যায়। তারপর আরো কয়েকটা স্টেশন হয়ে শ্রীরামপুর-রিষড়া ছাড়তেই অদিতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

কোন্নগরে ট্রেন থামতেই অদিতি প্রায় লাফ দিয়ে নেমে যায়।

ও প্ল্যাটফর্মে নেমে পিছন দিকে ফিরে দেখে, ঐ লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

চার ভাইবোনের মধ্যে চাইতে বড় অদিতি। ও যখন বি এ পড়ে তখনই একদিন ওর স্বামীকে বললেন, ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। বড় মেয়েকে যদি এম এ পড়াও তাহলে তিন-চার বছরের মধ্যে ওর বিয়ে দিতে হবে। ততদিনে তো আবার একটা মেয়ের বিয়ের া করতে হবে। তাই বলছিলাম, এ বছরের মধ্যেই ঘরদোর পাকা করে নাও।

সুখেন্দুবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একটু হেসে বললেন, পরশু দিনই অফিসে লোন-জন্য দরখাস্ত করেছি।

পুরো বাড়িটাই শেষ করবে তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, একবার যখন ধরব, তখন পুরোটাই শেষ করব। সুখেন্দুবাবু একটু থেমে স্ত্রী দিকে তাকিয়ে বললেন, এই টিনের বাড়ি দেখলে কী কোন্নো ভালো পরিবারের ছে তোমার মেয়েদের বিয়ে করতে রাজি হবে?

যাই হোক, সত্যি সত্যি মাস খানেকের মধ্যেই বাড়ি তৈরি শুরু হল। সকাল-বিকা লরি বোঝাই ইট-বালি-সিমেন্ট-পাথর আসে। দশ-বারোজন মিস্ত্রি আর পাঁচ-ছ'জন সাগরে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ করে। মাস খানেকের মধ্যেই জানলা-দরজার ফ্রেম বসা হয়ে গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই বাথরুম পায়খানার সব সরঞ্জাম হাজির।

ছাদ ঢালাই-এর ঠিক দিন দশেক আগে সুখেন্দুবাবু স্ত্রীকে বললেন, যা ভেবেছিলাম, তা চাইতে অনেক বেশি খরচ হয়ে গেল। এখন হাতে যা আছে, তা দিয়ে ছাদ ঢালাই হবে ন

তোমার হাতে একেবারেই কিছু নেই?

আছে কিন্তু ছাদ ঢালাই-এর জন্য আরো সাত-আট হাজার লাগবে। তার উপর দোতলা ঘর-বাথরুম ছাড়াও বাড়িটার একটা পাঁচিলও তো দিতে হবে।

এখন কী হবে?

কী আর হবে? পি এফ থেকে লোন নেব। সুখেন্দুবাবু একটু হেসে বলেন, একবার যখ শুরু করেছি, তখন শেষ না করে ছাড়ছি না।

ছাদ ঢালাই হতে-না-হতেই দোতলার ঘর-বাথরুমের সব মাল-মসলা জিনিসপত্র এ গেল।

এবার সুখেন্দুবাবু বললেন, সামনের সপ্তাহেই বাথরুমের কাজ শুরু হবে। তারপ একতলার প্লাসটার আর রং-টং হতে-না হতেই দোতলায় ঘরদোর তৈরি হয়ে যাবে।

এভাবে বাড়ি তৈরি হচ্ছে দেখে সবাই খুশি।

ঠিক তিন দিন পর কারখানা লক-আউট হয়ে গেল। সারা পরিবারের মাথায় যে বজ্রাঘাত পড়ল।

ঐ কয়েকটা বছরের কথা মনে পড়লে এখনও ওরা সবাই শিউরে ওঠে। হাজার সমস্যা মধ্যেও অদিতি বি এ পাস করেই বি এড করল। তারপর কোন্নগরেই একটা প্রাইমারি স্কুে বছর খানেক চাকরি করার পর শেষ পর্যন্ত বর্ধমান শ্রী বিদ্যামন্দিরে চাকরিটা জুটে গেল যাতায়াতে পরিশ্রম থাকলেও মাইনে ভালো।

এসব বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। সুখেন্দুবাবুর কারখানা এখনও খোলেনি কি অদিতি নিজে বিয়ে না করলেও ছোট দু'বোনের বিয়ে দিয়েছে। কপালগুণে দুটো ভগ্নীপতি বেশ ভালো। আরতির স্বামী সাধারণ গ্র্যাজুয়েট হলেও আই-সি-আই-তে ভালোই মাই পায়। আরতি স্কুলে চাকরি করে প্রত্যেক মাসে মাকে শ' চারেক টাকা দেয়। ছোট ভগ্নীপতি কোল ইন্ডিয়ার এঞ্জিনিয়ার। খুবই ভালো মাইনে পায়। তাই ছোট বোন নিজে কোনে কাজকর্ম না করলেও প্রত্যেক মাসে মাকে আড়াই শ' টাকা পাঠায়। ছোট ভাই বি এস- পড়ছে। ওকে একটু দাঁড় করাতে পারলেই অদিতি একটু নিশ্চিন্ত হতে পারে।

তাছাড়া দোতলায় ঘরদোর তৈরি না হলেও আরতির বিয়ের আগেই একতলার সব কা হয়ে যায়। আরতির বিয়ের পর একটা ঘর ভাড়া দিয়ে মাসে মাসে তিন শ' টাকা আসছে

তা দিয়ে অন্তত গ্যাস আর ইলেকট্রিসিটির খরচ মিটে যায়।

সুখেন্দুবাবু কিছু না বললেও তাঁর স্ত্রী মাঝে-মাঝেই বড় মেয়েকে বলেন, তুই যে কবে বিয়ে-থা করে সংসারি হবি, সেই চিন্তাতেই আমি পাগল হয়ে যাই। অদিতি হাসতে হাসতে বলে, তোমার সতেরো বছরে বিয়ে হয়েছিল বলে আজকাল আর তা হয় না।

তা ঠিক কিন্তু বাইশ-তেইশের মধ্যেই তো আর দু'জনের বিয়ে হয়ে গেল। এদিকে সামনের অঘ্রানেই তো তুই আঠাশ পূর্ণ করে উনত্রিশে পড়বি।

আজকাল আঠাশ-উনত্রিশেই মেয়েরা বুড়ি হয় না। তাছাড়া তিরিশ-বত্রিশের আগে অনেক ছেলেই বিয়ে করতে চায় না। একটু সেটল্ না হয়ে কেউই আজকাল বিয়ে করবে না।

এইভাবেই দিন চলে।

আবার ক'দিন পর ঐ আটটা কুড়ির ট্রেনে ঠিক ওরই কামরায় ঐ লোকটাকে দেখে অদিতি চমকে ওঠে। দু'চারজন যাত্রী ওঠা-নামা করেন কিন্তু কামরায় শুধু ওরা দু'জনেই থাকে। অদিতি সতর্ক না থাকলেও সন্ত্রস্ত না হয়ে পারে না। আগের দিনের মতোই লোকটা সব সময় বইপত্তর পড়ে। না, সেদিনও কোনো ঘটনা ঘটে না।

অদিতির স্কুলের পর এক ছাত্রীর বাড়িতে কয়েকটি মেয়েকে পড়ায়। তাই সাড়ে সাতটার ট্রেন ও কিছুতেই ধরতে পারে না। এই আটটা কুড়ির ট্রেনেই ও রোজ বাড়ি যায় এবং প্রত্যেক দিন গার্ডের ঠিক পাশের কামরায় বসে।

না, অদিতি লোকটাকে রোজ দেখতে পায় না। আস্তে আস্তে খেয়াল করল, লোকটা সপ্তাহে তিন দিন যায়। তাছাড়া কয়েক মাস ধরে দেখার পর অদিতি মনে মনে স্বীকার করে, লোকটা চোর-ডাকাত বা ছিনতাইবাজ নয়। যদি লোকটা খারাপ হত, তাহলে অনেক কিছুই করতে পারতো। কম দিন তো সুযোগ পায়নি।

তাছাড়া লোকটা শুধু পড়ে। আশেপাশে লোকজন থাকলেও কারুর সঙ্গেই কোনো কথাবার্তা বলে না।

আচ্ছা ঐ লোকটা কি বর্ধমানের কোনো কলেজে পড়ায়? না কি বর্ধমানেই কোনো অফিসে চাকরি করে?

এইভাবেই ক'টা মাস কেটে গেল। গরমের ছুটিতে স্কুল বন্ধ হবার পর বাড়িতে বসে-বসেই অদিতি ঐ লোকটার কথা ভাবে। না ভেবে পারে না কোনো কোনোদিন লোকটাকে দেখতেও ইচ্ছে করে।

মাঝে মাঝে অদিতি নিজেকেই ধিক্কার দেয়। ছি! ছি! একটা নিছক ভদ্রলোককে গুণ্ডা-বদমাইশ ভেবেছিলাম!

মে মাসের একেবারে শেষের দিকে আবার স্কুল খোলে। অদিতি আবার আগের মতো আটটা কুড়ির ট্রেনে ফিরতে শুরু করে, কিন্তু না, ঐ লোকটাকে আর ট্রেনের কামরায় দেখতে পায় না। ও মনে মনে অস্বস্তিবোধ করে। বোধহয় একটু অসহায়ও বোধ করে। হাজার হোক, রাত্রের ট্রেনে কামরায় একজন ভদ্রলোক থাকলে অনেক নিশ্চিন্তে থাকা যায়।

স্কুল খোলার পর পনরো-কুড়ি দিনের মধ্যে লোকটার দেখা না পেয়ে অদিতি যেন মনে

মনে ছটফট করে। প্রত্যেক দিন কত প্রত্যাশা নিয়ে ট্রেন ধরতে এসে হতাশ হওয়া যেন আর সহ্য করতে পারে না।

দেখতে দেখতে জুন মাসও শেষ হলো।

ক'দিন বৃষ্টির পর সেদিন আকাশে এক টুকরোও মেঘ নেই। রোদ্দুরে ঝলমল করছে চারদিক। অত রোদ্দুর দেখে অদিতি আর ছাতি নিয়ে বেরোয় না। স্কুল ছুটির পরও আকাশে বিশেষ মেঘ দেখে না কিন্তু ছাত্রীদের পড়িয়ে স্টেশনে রওনা হবার সময় দেখল সারা আকাশ কালো মেঘে ভরে গেছে। মনে করে, বেশি রাত্তিরের আগে বৃষ্টি হবে না।

প্রতিদিনের অভ্যাসমতো শেষ কামরায় উঠেই অদিতি ঐ লোকটাকে কোনোর দিকে বসে থাকতে দেখেই একটু হাসে। হঠাৎ মনে হয়, ঐ লোকটার সামনের সিটে বসে জিজ্ঞেস করে, এতদিন দেখিনি যে? কিন্তু না, ও বেশ খানিকটা দূরেই বসে।

আরো দু'চারজন যাত্রী উঠলেন। ট্রেন ছাড়ল। কিন্তু দু'একটা স্টেশন পার হতেই শুরু হল তুমুল বৃষ্টি। সব জানলাগুলো ভালো ছিল না। তাই যাত্রীরা বাধ্য হয়েই কামরার একদিকে মাঝামাঝি এসে বসেন। ট্রেন এগিয়ে চলে। যাত্রীরা ওঠা-নামা করেন কিন্তু বৃষ্টির বেগ আরো বাড়ে। ছাতি না আনার জন্য অদিতি মনে মনে অনুশোচনা করে।

দেখতে দেখতে ট্রেন শ্রীরামপুর এসে গেল। অদিতি শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে নেয়। হাতের ব্যাগটা বগলের তলায় চেপে ধরে।

এই ছাতাটা নিন।

মুহূর্তের জন্য অদিতি বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে আনতেই ঐ লোকটাকে সামনে দেখে অবাক হয়ে যায়।

ঐ লোকটা আবার বলে, এই ছাতাটা রাখুন। তা না হলে একেবারে ভিজে যাবেন।

কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে অদিতি বলে, না, না, ছাতির দরকার নেই। আমি দৌড়ে রিকশায় উঠে যাব।

ঐ লোকটা একটু হেসে বলে, ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ভিজে যাবেন।

আমি ছাতি নিলে আপনি কী করবেন?

আমি পুরুষ মানুষ। আমি ভিজলে ক্ষতি নেই কিন্তু কাপড়-চোপড় ভিজে গেলে মেয়েদের অনেক অসুবিধে। তাছাড়া রাস্তাঘাটের লোকজন এমন বিশ্রীভাবে চেয়ে থাকে যে...

অদিতি ওর হাত থেকে ছাতিটা নিতে-নিতেই রিষড়া পার হয়। ও উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগুতে এগুতে জিজ্ঞেস করে, ছাতিটা করে ফেরত দেব?

ঐ লোকটা একটু হেসে জবাব দেয়, ছাতিটা ফেরত না দিলেও ক্ষতি নেই। তবে পরশু দিনই আবার দেখা হবে।

সেদিন সারারাত অদিতি বোধহয় শুধু স্বপ্ন দেখে।

মাঝখানের দিনটাকে যেন অসহ্য মনে হয়। পরের দিন অদিতি অন্য দিনের তুলনায় একটু আগেই স্টেশনে এসে শেষ কামরার এক কোণায় বসে। ট্রেন ছাড়ার মিনিট খানেক আগে ওকে উঠতে দেখেই অদিতি বলে, এদিকে আসুন।

পাশে না, ঠিক সামনে উনি বসতেই অদিতি ছাতাটা ফেরত দিয়ে বলে সেদিন আপনি

ছাতা না দিলে সত্যি বিপদে পড়তাম। স্টেশনে একটা রিকশাও ছিল না।

সেই শুরু।

তারপর এই রাত আটটা কুড়ির লোক্যালে সপ্তাহে তিনদিন একসঙ্গে যেতে-যেতেই আলাপ-পরিচয়-ঘনিষ্ঠতা।

সামনের রবিবার কি তুমি ব্যস্ত? অদিতি প্রশ্ন করে।

কেন? কোনো দারকার আছে?

বাবা-মা প্রায় রোজই বলেন, তোমাকে নিয়ে যেতে। অদিতি একটু থেমে বলে, রবিবার বিশেষ কোনো কাজ না থাকলে সকালের দিকে চলে এসো। সারাদিন একসঙ্গে কাটানো যাবে।

হ্যাঁ, আসব।

রবিবার কোন্নগরের নবগ্রামে অদিতিদের বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় বারোটা হয়ে গেল। ওকে দেখেই অদিতি জিজ্ঞেস করে, এত দেরি হল?

সকালে বাবা বললেন, পিসিমাকে নিয়ে একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

কেন, পিসিমার আবার কী হলো?

হাই-প্রেসারের রুগী...

কিন্তু পিসিমার মতো হাসি-খুশি মানুষের তো হাই প্রেসার থাকা উচিত না। অদিতি একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, যাই হোক, তাই বলে এত দেরি?

ডাক্তারের কাছ থেকে এসেই দেখি, ছোট্ট ভগ্নীপতি এসেছে। হাজার হোক, একেবারেই নতুন জামাই। তাই...

সুখেন্দুবাবু বারান্দায় দাঁড়িয়েই মেয়েকে বলে, ওকে ঘরে এনে বসতে দে। তারপর কথা বলিস।

অদিতি ওকে নিয়ে কয়েক পা এগুতেই ওর মা সামনে এসে দাঁড়ান।

মা, এই হচ্ছে সার্থক। অদিতি খুশির হাসি লুকিয়ে বলে, থিসিস জমা দিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ক'দিন পরই ইনি ডক্টর সার্থক চৌধুরী হয়ে যাবেন।

অদিতির মা বলেন, এই ছেলে যদি ডক্টরেট না হয়, তাহলে আর কে হবে?

সুখেন্দুবাবুও বারান্দা থেকে নেমে এসে পাশে দাঁড়ান। সার্থক ওদের দু'জনকে প্রণাম করে।

সুখেন্দুবাবু ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেন, দীর্ঘজীবী হও বাবা।

অদিতি সার্থককে নিয়ে ঘরে যাবার পর-পরই অদিতির মা এসে জিজ্ঞেস করেন, বাবা, তুমি কি চা খাবে? না কি এখনই খেয়ে নেবে?

না, মাসিমা, এখনই খাবো না। পিসিমা এত লুচি খাইয়ে দিয়েছে যে. .

এখন চা খেতে তো আপত্তি নেই?

না, না, চা খেতে আবার আপত্তি কী?

সবাই মিলে চা খেতে খেতে গল্পগুজব হয়।

অদিতি হাসতে হাসতে বলে, জানো মা, পিসিমা এখনও ওকে ভাত মেখে দেন।

উনিও একটু হেসে বলেন, তাই নাকি?

সার্থক বলে, পিসিমার ধারণা, এখনও আমি ছোট্ট বাচ্চা আছি। ও একটু থেমে একটু থেমে একটু হেসে বলে, তাছাড়া আমারও এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে উনি মেখে না দিলে আমিও ঠিক খেয়ে তৃপ্তি পাই না।

তোমার পিসিমার রান্না খেয়ে তো আমার মেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, পিসিমা সত্যি খুব ভালো রান্না করেন। তাছাড়া কত রকমের যে খাবারদাবার বানাতে জানেন, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সার্থক একটু থেমে বলে, বাবা মাঝে-মাঝেই হাসতে হাসতে পিসিমাকে বলেন, ছোড়দি, তোমার আচার তৈরির জন্য সারাজীবন যা ব্যয় হল, তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে সল্টলেকে একটা দোতলা বাড়ি তৈরি করতে পারতাম।

ওর কথা শুনে সবাই হাসেন।

সুখেন্দুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কলকাতায় এত টিউটোরিয়াল হোম থাকতে বর্ধমানে পড়াও কেন? আমাদের মণীন্দ্র কলেজের মর্নিং সেকশনের একজন অধ্যাপক রিটায়ার করার পর বর্ধমানে টিউটোরিয়াল হোম খুলেছেন। উনি অনুরোধ করেছিলেন বলেই...

কিন্তু সকালে কলেজে পড়িয়ে বিকেলে আবার বর্ধমানে গিয়ে পড়াতে তো যথেষ্ট পরিশ্রম হয়।

না, তেমন কিছু না। দশটার মধ্যেই কলেজের ক্লাস শেষ হয়ে যায় আর বর্ধমান যাই পৌনে তিনটের ট্রেনে।

রিসার্চ করার সময় তো তোমাকে অনেক খাটতে হত।

হ্যাঁ, তখন একটু বেশি পরিশ্রম করতে হলেও বর্ধমানে যাই তো সপ্তাহে তিন দিন।

খেতে বসেও নানা কথা হয়।

সুখেন্দুবাবু বললেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী একদিন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভাবছি।

হ্যাঁ, আসুন। বাবা আর পিসিমা তো কতদিনই অদিতিকে বলছেন, আপনাদের নিয়ে যেতে।

সুখেন্দুবাবুর স্ত্রী বললেন, না, না, এবার আমরা সত্যি যাবো। ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা শুভদিন ঠিক করা দরকার।

সন্ধের দিকে বিদায় নেবার আগে সার্থক অদিতিকে জিজ্ঞেস করে, শেষ পর্যন্ত একটা গুণ্ডা-বদমাইশের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে?

এর চাইতে আর বেটার কোয়ালিফায়েড গুণ্ডা যখন পাওয়া গেল না, তখন একেই বিয়ে করতে হবে। আমার কপালই এমন।

পাত্রী চাই

দু'তিন দিন পর-পরই খবরের কাগজের অফিস থেকে এক বান্ডিল চিঠি আসছে। প্রত্যেক চিঠির সঙ্গেই পাত্রীর রঙিন ছবি। কোনো কোনো বাবা-মা মেয়ের দু'তিনটি ছবিও পাঠিয়েছেন। শুভশ্রী দেবী বিকেলের ডাকে আসা চিঠিপত্রগুলো একটু নাড়াচাড়া করতে-করতেই একটু হেসে বলেন, এর সিকি ভাগ মেয়ে দেখে বিয়ে ঠিক করতে হলে তো আমার ছেলেটা বুড়ো হয়ে যাবে।

সৌমিত্রবাবু 'টি-ভি'তে স্টেফি গ্রাফের খেলা দেখতে-দেখতেই সিগারেটে একটা টান দিয়ে একটু হেসে বলেন, খবরের কাগজে কী লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিয়েছ মনে নেই?

—বিজ্ঞাপন কি আমি লিখেছি? রাধা যেমন লিখেছে, আমি তেমনই...

ঠিক সেই সময় শ্রীরাধা পর্দা সরিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকেই শুভশ্রী দেবীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী নতুন মা, আমি কী করেছি?

—তোর নতুন কাকা বলছিল, কি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল...

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি বলছি।

শ্রীরাধা প্রায় এক লাফে পাশের ঘর থেকে খবরের কাগজখানা এনেই পড়তে শুরু করে—পাত্রী চাই। দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত কায়স্থ (দত্ত) পরিবারের একমাত্র সন্তান। সুদর্শন স্বাস্থ্যবান সঙ্গীতপ্রিয় আদর্শবান কলকাতার M. B. B. S. ও চণ্ডীগড় PGI এর M S. পাত্রের (২৮) সুন্দরী শিক্ষিতা রুচিসম্পন্না পাত্রী চাই। পাত্র কোনোরকম যৌতুক বা উপহার গ্রহণে অক্ষম। সত্বর ছবি সহ লিখুন—বক্স নং. .

শ্রীরাধা এক নিঃশ্বাসে বিজ্ঞাপনটা পড়েই সৌমিত্রবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, নতুন কাকা, কিছু ভুল হয়েছে কি?

—না, না, তুই ঠিকই লিখেছিস। উনি একটু থেমে একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, তোর নতুন মা আর তোর ঋষিদা যা চায়, তুই তাই লিখেছিস।

—তবে? শ্রীরাধা অবাক হয়ে গেল।

—এত চিঠি এসেছে দেখে তোর নতুন মা অবাক হয়ে যাচ্ছে। তাই বলছিলাম যে, এমন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে যে দু'পাঁচ হাজার মেয়ের বাবা চিঠি লিখলেও তো অবাক হবার কিছু নেই।

শ্রীরাধা সঙ্গে সঙ্গে বলে, বিজ্ঞাপনে কী আর লিখেছি? ঋষিদার মতো ছেলে আর একটা খুঁজে বের করো তো!

শুভশ্রী দেবী হাসতে হাসতে বলেন, তোর তো ধারণা, তোর ঋষিদার মতো ছেলে এ পৃথিবীতে আর নেই।

—সত্যিই তাই। ঋষিদা ইজ ঋষিদা।

সৌমিত্রবাবু সিগারেটে শেষ টান দিয়ে একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই ঋষি আসবে। এর মধ্যে তোমরা দু'জনে মিলে অন্তত চার-পাঁচটা মেয়ে ঠিক করো যাদের আমরা দেখতে যাব।

শুভশ্রী দেবী চিঠিপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়েই শ্রীরাধাকে বলেন, চল রাধা, আমরা ও ঘরে যাই।

—চলো।

ও ঘরে গিয়েই শুভশ্রী দেবী বিকেলের ডাকে আসা চিঠিপত্রগুলো শ্রীরাধার হাতে দিয়ে বলেন, দ্যাখ তো, এর মধ্যে কাউকে তোর পছন্দ হয় কি না।

শ্রীরাধা প্রথম খামটা খুলে ছবিটা দেখেই মনে মনে বলে, ইস! কী রূপের ছিরি।

আগের ক'দিনের আসা চিঠিপত্র আর ছবিগুলো দেখতে-দেখতেই শুভশ্রী দেবীর কানে আসে শ্রীরাধার মন্তব্য—বাবারে বাবা! এ তো জলহস্তী! এর সঙ্গে বিয়ে দিলে ঋষিদা নির্ঘাত চৈতন্যদেবের মত সংসার ত্যাগ করবে।

ওর মন্তব্য শুনে শুভশ্রী দেবী চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলেন, তোর ঋষিদা সন্ন্যাসী না হয়ে যাকে নিয়ে সংসারী হতে পারবে, সেইরকম কি আছে, তাই বল।

শ্রীরাধা ওর কথা কানে না তুলেই আরো দু'একটা ছবি দেখার পর আপন মনেই মন্তব্য করে, কী সব রূপের ছিরি! এদের ছবি দেখেই তো আমার গা ঘিন-ঘিন করছে।

তারপর আরো কয়েকটা ছবি দেখার পর হঠাৎ একটা ছবি শুভশ্রী দেবীর সামনে ধরেই শ্রীরাধা বলে, দেখ, দেখ নতুন মা, মেয়েটার রুচি দেখ। ঋষিদা তো এর হাতের জলও খেতে পারবে না।

ওর হাত থেকে ছবিটা কেড়ে নিয়েই শুভশ্রী দেবী বলেন, তুই স্বর্গ থেকে একটা অপ্সরী ধরে আন। তা না হলে কাউকেই তোর পছন্দ হবে না।

শ্রীরাধা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, দরকার হলে ঋষিদা চিরকুমার থাকবে কিন্তু এইসব পেত্নীদের কাউকে সে কখনই বিয়ে করবে না।

বড় রাস্তা দিয়ে ট্রামে-বাসে যাতায়াত করার সময় লোকে ঠিক চারু এভিন্যুকে চিনতে পারে না। মোটামুটি শত খানেক বাড়ির এই পাড়ার প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের শুধু জানাশুনাই নেই, প্রায় আত্মীয়ের সম্পর্ক। চৌরঙ্গি পাড়ার মিঃ বর্মন এখানে বর্মনদা-বর্মনকাকু, রেডিও-টি.ভি.-খবরের কাগজ খ্যাত বিখ্যাত সাংবাদিক শ্যামল বসু এখানে শ্যামলদা, সাহেবী স্কুলের গুরুগম্ভীর 'মিস' এ পাড়ার শ্যামলী বৌদি। এ পাড়ায় কেউ মিঃ ব্যানার্জি, মিসেস দত্ত না, ওঁরা এখানে বিমলকাকু আর ডলিমাসি।

কলকাতার মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হলেও এ পাড়া নিয়ে বাসিন্দাদের গর্বের শেষ নেই। এই পাড়ার ব্যাপারে বন্ধুবান্ধব একটু ঠাট্টা করলেই মিঃ বর্মন হাসতে হাসতে বলেন, তোরা ভুলে যাস না, চারু এভিন্যু হচ্ছে কলকাতার নিউ ইয়র্ক। এখানে সব রাস্তা শুধু নর্থ-সাউথ ইস্ট-ওয়েস্টই না, সবই নাইনটি ডিগ্রি অ্যাংগেলে। তোরা যে চৌরঙ্গি নিয়ে গর্ব করিস সেও তো ধনুকের মতো বেঁকে গেছে।

আজকের বয়স্করা গর্ব করে ছেলেমেয়েদের বলেন, আমরা প্রত্যেকবার পরীক্ষা দিতে

যাবার সময় কবিশেখর কালিদাস রায়কে প্রণাম করে যেতাম। পরীক্ষা দিয়ে বিকেলবেলায় বাড়ি ফেরার সময় দেখতাম, উনি বাড়ির সামনের ঐ ছোট্ট চাতালে ইজিচেয়ার পেতে বসে আমাদের জন্য হাঁ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

—হ্যাঁরে, চিন্ময়, আজ কেমন হলো?

—ভালোই।

—কোনো পেপারটা বেশি ভালো হল?

—সেকেন্ড পেপার।

কবিশেখর যেন আপন মনেই বলেন, অধিকাংশ ছেলেমেয়েরাই সেকেন্ড পেপারে বেশি নম্বর পায়।

চিন্ময় দত্ত বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই কবিশেখর একটু গলা চড়িয়ে ডাক দেন, এই গোবিন্দ!

গোবিন্দ সামনে এসে দাঁড়াতেই উনি জিজ্ঞেস করেন, সব কোশ্চেন লিখেছিস?

—মেন কোশ্চেনগুলো লিখেছি কিন্তু শর্টনোটগুলো পারলাম না।

কবিশেখর একটু চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করেন, কেন? ও-গুলোতেই তো নম্বর তোলা সহজ।

—জেঠু, জাজনগর কোথায়?

একটু হেসে উনি জবাব দেন, মুসলমান আমলে উড়িষ্যার নাম হয় জাজনগর।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা জেঠু, বান্দা কে?

কবিশেখর বলেন, শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ সিং খুন হবার পর বান্দা শিখদের রাজনৈতিক নেতা হন। পরবর্তীকালে মুঘল বাদশা এর দুই ছেলেকে ওর চোখের সামনে হত্যা করেই ক্ষান্ত হন না ; ওরা বান্দাকে হাতির পায়ের তলায় পিষে মারে।

গোবিন্দ একগাল হাসি হেসে বলে, জেঠু, আপনি ইতিহাসের সবকিছু জানেন!

কবিশেখর একটু হেসে বলেন, মাস্টারি করতে হলে সব বিষয়ই একটু আধটু জানতে হয়।

নবপল্লীর পূজা প্যান্ডেলে অমিয়'র স্ত্রী শিখাকে দেখেই শ্যামল একটু হেসে বলে, অনেক ভাগ্য করে এ পাড়ায় বউ হয়ে এসেছ, বুঝলে?

শিখা কোনো জবাব দেয় না ; শুধু একটু হাসে।

—এই পূজা প্যান্ডেলে ক'দিন এলেই বুঝবে, এখানে আমরা সবাই সবার আত্মীয়। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীকে আমি তো জন্ম থেকেই মেজ জেঠু-মেজ মা বলে জানি। সৌমিত্রদার স্ত্রী আমাদের এ পাড়ায় নতুন বৌমা-নতুন মাসি-নতুন বৌদি।

শ্যামল একটু হেসে বলে, আমি অবশ্য বলি, নতুন বৌঠান।

—হ্যাঁ, আমিও ওঁকে নতুন মাসি বলি।

শ্যামল শিখার কথা কানে না তুলেই হাত দিয়ে হলদে দোতলা বাড়িটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, ওটা কার বাড়ি জানো?

—ভানু ব্যানার্জির।

—দুনিয়ার মানুষ ওঁকে চিনতো বিখ্যাত অভিনেতা বলে কিন্তু আমরা ওঁকে চিনেছি সৎ, আদর্শবান, পরোপকারী ও অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত বলে। বিজয়া-নববর্ষের দিন বাবা-মাকে প্রণাম করেই ছুটে যেতাম ভানু মামা-নীলিমা মামীকে প্রণাম করতে।

শিখা চুপ করে ওর কথা শোনে।

শ্যামল একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, ভানু মামা মারা যাবার দিন এ পাড়ার কচি-কাঁচা থেকে বুড়ো-বুড়িরা কী কান্নাকাটি করেছিলেন, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

অমিয় এর মধ্যে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, ওরা খেয়াল করেনি। শ্যামলের কথা শুনে সে বলে, সত্যি, সে দিনের কথা কোনোদিন ভুলব না।

শিখা মাথার ঘোমটা একটু সামনের দিকে টেনে দিয়েই বলে, নীলিমা মামীও খুব ভালো।

শ্যামল কিছু বলার আগেই অমিয় ওর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে, নীলিমা মামী ভালো মানে, অসম্ভব ভালো। অত বিখ্যাত অভিনেতার স্ত্রী ও নিজে অত বড় গাইয়ে হওয়া সত্ত্বেও কী অমায়িক আর ভদ্র!

এ পাড়ার ছেলেমেয়েদেব মধ্যেও ভারি মজার সম্পর্ক। চন্দন, বিনু বাবলুরা রোজ সন্ধের পর ঐ মোড়ের মাথায় বাঁড়ুজ্যের বাড়ির সিঁড়িতে বসে আড্ডা দেয়। গ্যারেজের মধ্যে কেষ্টদার দোকান থেকে অনুরাগ বেরুতেই চন্দন ডাক দেয়, এই অনু, শোন।

আমূল স্প্রে'র টিন হাতে নিয়ে অনুরাগ ওদের সামনে এসেই বলে, বল।

—তোর কেক খেলাম।

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁরে অনু, তুই ওদের কেক দিয়েছিস আর আমাদের দিলি না?

এর আগের বার যখন কেক করেছিলাম, তখনই তো তুই খেয়েছিস।

চন্দন বাবলুর হাঁটুতে একটা থাপ্পড় মেরে বলে, তুই চুপ কর। আমাকে বলতে দে।

অনুরাগ বলে, বল, বল, কি বলবি। আমি পড়তে পড়তে উঠে এসেছি।

চন্দন চাপা হাসি হেসে বলে, তোর তৈরি কেক আমরা খাচ্ছি, সেই ভালো কিন্তু ভুল করেও কখনো স্বামীকে খাওয়াবি না। ঐ কেক খাওয়ার পরদিনই তোর স্বামী তোকে ঠিক ডিভোর্স করবে।

ওর কথায় সবাই হেসে ওঠে।

অনুরাগ বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েই হাসতে হাসতে বলে, সামনের মাঘেই তো তোর বিয়ে। তোর বউয়ের কাছে আমি সব ফাঁস করে দেব। তখন মজা বুঝবি!

—ঐ মোটা ফাল্গুনীকে আমি ভালোবাসতাম, এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

পাড়ার এই পরিবেশেই সৌমিত্রবাবু বড় হয়েছেন। শুভশ্রী দেবীও তো এখানে তিরিশ বছর কাটিয়ে দিলেন। প্রায় সামনা-সামনি বাড়ির মানিকবাবু সৌমিত্রবাবুর প্রিয় রাঙাদা। দু'চার বছরের বড় হলেও রাঙাদা ওঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। ঐ রাঙাদার সঙ্গেই উনি জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ দেখেছেন, স্টার-রঙমহলে কত বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় দেখেছেন। আরো কত কি!

একটু ভালো-মন্দ রান্না করলেই রাঙা বৌদি বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু গলা চড়িয়ে

বলেন, এই শুভশ্রী, আনন্দ ঠাকুরপোর জন্য একটু মাছ পাঠাচ্ছি।

শুভশ্রী হাসতে হাসতে বলেন, এ বাড়িতে কি শুধু তোমার আনন্দ ঠাকুরপোই থাকে?

উনিও হাসতে হাসতে বলেন, ভুলে যাও কেন, আনন্দ ঠাকুরপো আমার একমাত্র বয়ফ্রেন্ড!

তারপর ঋষি হবার পর মানিকবাবুর স্ত্রী মাধুরী দেবীকে দেখলেই ও খিল খিল করে হেসে ওর কোলে যেত। মানিকবাবুর বড় মেয়ে অনুরাধা বলতো, মা, ভাইয়াকে বাড়ি নিয়ে চল।

এই অনুরাধার জন্যই মাধুরী দেবী ঋষিকে বাড়ি নিয়ে যেতেন। ঋষিও মহানন্দে সারাটা দিন কাটাতো।

ক'বছর পর ঋষি স্কুল যাতায়াত শুরু করল। ও স্কুল থেকে নেমেই এক দৌড়ে বাড়ির সামনে এসেই চিৎকার করতো, রাঙামা, আমার ছুটি হয়ে গেছে।

মাধুরী দেবী দোতলায় দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলেন, এক দৌড়ে উপরে উঠে এসো। আমি তোমার জন্য কখন থেকে দাঁড়িযে আছি।

উল্টো দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুভশ্রী একটু হেসে মাধুরী দেবীকে বলেন, এ ছেলেটা বোধহয় ভুল করে আমার পেটে জন্মেছে।

উনি ঋষিকে কোলে তুলে নিয়ে ভিতরে যাবার আগে হাসতে হাসতে বলেন তুই আর তোর বর যে আমার ছোট মেয়েটাকে কেড়ে নিয়েছিস?

অনুরাধা জন্মের বছর খানেক পর সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে শুভশ্রীর বিয়ে হয়। অনুরাধা নতুন কাকা-নতুন কাকিমার অসম্ভব ভক্ত হলেও শ্রীরাধার মতো ওদের কাছে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দিনরাত্তির কাটায়নি। অবশ্য তার কারণ ছিল, শ্রীরাধা যখন মাত্র তিন মাসের, তখন ওর মার একটা বড অপারেশন হয়। তিন সপ্তাহ পর হাসপাতাল থেকে বাডি ফিরে এলেও ঐটুকু শিশুর সব দাযিত্ব পালন করা অসম্ভব ছিল। ডাক্তারেরও নিষেধ ছিল। তখন দীর্ঘদিন শ্রীরাধা শুভশ্রীর কাছেই থেকেছে। ও যত বড় হয়েছে, এ বাড়ির সঙ্গে ওর সম্পর্ক তত গভীর হয়েছে।

ছোটবেলায় শ্রীরাধা কিছুতেই নতুন কাকিমা বলতে পারতো না। তারপর আস্তে আস্তে নতুন মা বলতে শুরু করে।

দেখতে দেখতে গঙ্গা দিয়ে কত জল গড়িয়ে গেল।

অনুরাধা বিয়ের পর পরই কানাডা চলে গেল। ঋষি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করেই এম এস পড়ার জন্য চণ্ডীগড় গেল। শ্রীরাধা ইউনিভার্সিটিতে এম এ পড়ে।

এখন?

এ বাড়ির সব ব্যাপারেই শ্রীরাধার কথাই শেষ কথা।

—নতুন কাকা, এই জামাটা তুমি আর পরবে না।

নিজের জামাটার দিকে একবার তাকিয়েই সৌমিত্রবাবু বলেন, কেন রে রাধা? জামাটা তো ভালোই আছে।

—কাচতে কাচতে রঙ কত ফেড হয়ে গেছে দেখেছ?

কোনো উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই শ্রীরাধা অত্যন্ত গুরুগম্ভীর হয়ে চরম সিদ্ধান্ত

জানিয়ে দেয়, তোমার অনেক ভালো ভালো জামা আছে। তোমাকে আর এই জামাটা পরতে হবে না।

শুভশ্রী দেবী সঙ্গে সঙ্গে বলেন, রাধা, তুই ঠিক বলেছিস।

সৌমিত্রবাবু একটু হেসে আত্মসমর্পণ করেন, ঠিক আছে ; এই জামাটা আর পরব না।

শুভশ্রী দেবীর মা প্রায়ই নাতির খোঁজ-খবর নেবার জন্য এ বাড়িতে এসে মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁরে, ঋষির চিঠি এসেছে?

শুভশ্রী কোনো জবাব দেবার আগেই শ্রীরাধা হাসতে হাসতে বলে, ও দিদা, তোমার নাতি আজকাল তোমাকে কোনো লাভ-লেটার লিখছে না।

উনি এক গাল হাসি হেসে জবাব দেন, আমাদের দু'জনের প্রাইভেট অ্যাফেয়ার্সে তোর এত উৎসাহ কেন?

শ্রীরাধাও হাসতে হাসতে বলে, তুমি যাই বল দিদা, তোমার অমন পেটুক লোভী বয়ফ্রেন্ডের নাম যে ঋষি রাখলে কেন, তা আমার মাথায় আসে না।

—আমার নাচ দেখে যে ওর তপোভঙ্গ হয়েছে, তাই তো ও আমার ঋষি!

গঙ্গার জল আরো গড়িয়ে যায়।

শ্রীরাধা গত বছরই এম এ পাস করেছে। মানিকবাবু মেয়ের বিয়ে দেবার আগ্রহ প্রকাশ করতেই ও সোজা বলে দিয়েছে, আমি এখন বিয়ে-টিয়ে করব না। রিসার্চ করব।

এদিকে ঋষি এম এস পাস করতেই ওর বাবা-মা ছেলের বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। চাকরি-বাকরি বা প্রাইভেট প্রাকটিশ শুরু করার আগে, বিয়ে করতে ঋষিরও আপত্তি নেই ; তবে ওর বাবা-মা খুব ভালো করেই জানেন, ঋষি বিয়েতে কোনো যৌতুক বা উপহার কিছুতেই নেবে না।

যাই হোক, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার পর এত চিঠিপত্র ও মেয়ের ছবি এলেও একজনকেও শ্রীরাধার পছন্দ হল না। দু' একটি মেয়ের ব্যাপারে শুভশ্রী দেবী একটু আগ্রহ দেখালেও উনি স্বামীকে বললেন, কোনো মেয়েকেই তেমন ভালো লাগল না। তবে দু' একটি মেয়েকে দেখা যেতে পারে।

শ্রীরাধা সঙ্গে সঙ্গে বলে, তোমরা কেন ঐ ঝামেলায় যাচ্ছো? রবিবার ঋষিদা এলে সব চিঠিপত্তর আর ছবি তার হাতে তুলে দিও। তারপর সে যাকে ইচ্ছে, বিয়ে করুক।

সৌমিত্রবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, সেই ভালো।

শুভশ্রী দেবী পাশ ফিরে বললেন, হ্যাঁরে, রাধা, চিঠি আর ছবিগুলো সাবধানে রেখে দে।

—ভয় নেই নতুন মা, এইসব অপ্সরীদের ছবি আমি অযত্নে রাখব না।

শ্রীরাধা হাসতে হাসতে ও ঘরে চলে যায়।

রবিবার।

মানিকবাবু অফিসের কাজে বাঙ্গালোর গিয়েছিলেন বলে সৌমিত্র রাঙা বৌদিকে নিয়ে স্টেশনে গেলেন। ঋষিকে নিয়ে বাড়ি আসার পর হই-হুল্লোড়ের মধ্যেই ঘণ্টা খানেক কেটে গেল। তারপর মাধুরী দেবী বাড়ি চলে যেতেই শুভশ্রী দেবী বললেন, হ্যাঁরে, রাধা, ঐ ছবিগুলো ঋষিকে দেখা তো!

শ্রীরাধা বলে, ঋষিদা, ও ঘরে চলো।

দশ-পনেরো মিনিট পর শুভশ্রী দেবী পর্দা সরিয়ে ও ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ান।

ঋষি দু'হাত দিয়ে শ্রীরাধার মুখখানা ধরে বলে, অন্য কোনো মেয়েকে নিয়ে ঘর করব লেই কী গত দশ-বারো বছর ধরে তোমার ছবি পার্সে নিয়ে ঘুরছি?

শুভশ্রী দেবী এক লাফে স্বামীর কাছে ছুটে গিয়ে বলেন, তুমি এক্ষুনি ঠাকুর মশায়ের ছে যাও। ঋষির বিয়ের দিন দেখতে হবে।

সৌমিত্রবাবু হতবাক হয়ে কোনোমতে বলেন, কিন্তু...

শুভশ্রী দেবী এক গাল খুশির হাসি হেসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তোমার ছেলে ধাকেই বিয়ে করবে।

—তাই নাকি?

—তবে আর বলছি কী?

সৌমিত্রবাবু বারান্দায় গিয়ে পাগলের মতো চিৎকার করেন, রাঙা বৌদি, শিগ্‌গির এক ড়ি রসগোল্লা নিয়ে এসো।

ডাক্তার

ডাক্তার আমার চাইতে বয়সে বড়ো হলেও বন্ধু। বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দিল্লিতে এলেই ডাক্ত আমাকে ফোন করবে। আমার শত কাজ থাকলেও আমাকে ছুটে যেতে হবে ইন্দ্র এস্টেটের ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের উপর তলার ঘরে। সকাল, দুপুর, স রাত্তির। সময়ের কোনো ঠিক নেই। ডাক্তার এ ব্যাপারে প্রায় নাদির শা। হুকুম অমান্য ক চলবে না। একদিন, দু'দিন, তিন দিন। ডাক্তার যে ক'দিন দিল্লি থাকবে সে ক'দিনই আম ডিউটি দিতে হবে। এর অন্যথা ও বরদাস্ত করে না ; আমিও ভাবতে পারি না।

আমি কলকাতা এলে ঠিক এর বিপরীতটা হয় না। হওয়া সম্ভব নয়। আমি দু'চার দি জন্য আসি নানা কাজকর্ম নিয়ে। ডাক্তারও ব্যস্ত। মাঝরাতেও নিস্তার নেই। হঠাৎ কে রুগীর বুকে ব্যথাটা বাড়লেই হুড়মুড় করে উঠে নিজেই গাড়ি চালিয়ে ছুটবে। আমার ডা যে কার্ডিওলজিস্ট। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। তবুও আমার ডাক্তারের আড্ডা হবেই। কখনও চেম্বারে, কখনও বা ক্লাবে ও হোটেলে। সৌভাগ্যক্রমে হাতে খুব সিরিয়াস রুগী না থাক ডাক্তার নিজেই ফিয়াট নিয়ে বেরুবে। তারপর আমাকে নিয়ে চলে যাবে কোথাও। শান্তিনিকেতন, ডায়মন্ডহারবার বা ঝাড়গ্রামের ওদিকে। একদিন দেড়দিন প্রাণ ভরে অ দিয়ে আবার কলকাতা ফিরে আসি।

এই আড্ডার ব্যাপারে আমার আর ডাক্তারের মধ্যে এক অলিখিত চুক্তি আছে। ও ওর কাছে অসুখ-বিসুখের ব্যাপারে কিছু জানতে চাই না ; ডাক্তারও আমার সঙ্গে রাজনী নিয়ে আলোচনা করবে না। এ ছাড়া বিশ্ব সংসারের যাবতীয় সব সৎ ও অসৎ ব্যাপ নিয়ে আলোচনা হয় আমাদের। তবে ডাক্তারের প্রেমের কাহিনি শুনতেই আমার সবচাই ভালো লাগে। এ ব্যাপারে ডাক্তারের ঔদার্য সীমাহীন। ডাক্তার হাসতে হাসতে সেকালে ভালো ভালো কবি ছিলেন বলে অর্জুনের প্রেম কাহিনি নিয়ে কত ভালো ক রচনা হয়েছে। একালে যদি তেমন ভালো কবি থাকতেন তাহলে আমাকে নিয়েও অ অনেক কাব্য রচনা হতে পারতো।

আমি হাসি।

ডাক্তার এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে বলে, না, না, ভাই, হাসির কথা নয়। রবি ঠাকু শরৎচন্দ্র বেঁচে থাকলেই দেখতে আমাকে নিয়ে কত কি লেখা হয়েছে।

সব যুগেই সব দেশের মানুষই প্রেম করেছে। ভবিষ্যতেও করবে কিন্তু ভারতবর্ষে প্রে করা যেন মহাপাপ। এ মহাপাপ সবাই করে, সবাই লুকোয়। ডাক্তার সত্যি ব্যতিক্রম। ভা ছাত্র বলে ডাক্তারের খ্যাতি ছিল মেডিক্যাল কলেজে। এডিনবরা থেকে এম. আর সি পাশ করেছে প্রায় অনায়াসে। তারপর এক অস্ট্রিয়ান যুবতীর মোহ ডাক্তারকে টেনে নি

যায় ভিয়েনায়। কিছুদিন এই সুন্দরীকে নিয়ে দানিয়ুব খাল, ওপেরা হাউস, নাইট ক্লাব স্পেল্‌ডিড ফাস্ট ডিস্ট্রিকেটর অলিগলিতে ঘোরাঘুরি করতেই ডাক্তার আরো একটা পরীক্ষা দেয়। আশ্চর্য ব্যাপার। পাশও কবল। সেদিন ডাক্তার ঐ মেয়েটিকে নিয়ে ইভ'এ নেচেছিল সারারাত।

মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময়ও ডাক্তারের জীবনে একাধিক মেয়ে এসেছে। সহপাঠিনী নীলিমা, ফাইন্যাল ইয়ারের জয়া, নার্স কৃষ্ণা ছাড়াও কিছুকালের জন্য ডাঃ মৈত্রের স্ত্রীর সঙ্গেও বড়ো বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই ডাক্তার বিয়ে করে অপরূপাকে। অপরূপা সত্যি অপরূপা। রূপে, গুণে। অপরূপাকে বিয়ের পিছনেও একটু কাহিনি আছে।

ডাক্তার সবে বিলেত থেকে ফিরেছে। বিশেষ কেউই চেনে না। কিছু পুরনো বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আর কেউ নাম জানে না। রুগী আসে কম। 'কল' আসে আরো কম। তবে হ্যাঁ, রুগী এলে ডাক্তার জানপ্রাণ লড়িয়ে দেয় তাকে সুস্থ করার জন্য। যে বাড়িতে 'কল' পায়, ডাক্তার সেখানে বার বার যায় রুগী দেখতে। টাকা? না, না, ঐ একবারই নেয়, বার বার নয়। ডাক্তারের এই আগ্রহ, সঠিক চিকিৎসা, হাসিখুশি মুখখানা আর অমায়িক ব্যবহার রুগীর বাড়ির সবাইকে মুগ্ধ করে। ডাক্তারের খ্যাতি ছড়ায়।

রাত তখন এগারোটা। ডাক্তার শুয়েছে। হঠাৎ টেলিফোন পেয়েই ছুটল ল্যান্সডাউনে। মিঃ চৌধুরীর অবস্থা সত্যি সঙ্কটাপন্ন। ডাক্তার পর পর দুটো ইনজেকশন দিয়ে বার বার হার্ট আর পালস্ দেখে। ঘণ্টাখানেক পরে আবার ইনজেকশন। যুদ্ধ চলল সারারাত। ভোরের দিকে ডাক্তার বাড়ির সবাইকে বললেন, মনে হয় এখন মিঃ চৌধুরী ঘুমুবেন। এখন আমি যাচ্ছি। যদি দরকার হয় সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবেন।

—ফি?

—না, না, এখন কিছু দিতে হবে না। আগে উনি সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপর ওঁর হাত থেকেই আমি আমার ফি নেব।

ডাক্তারের কথা শুনে বাড়ির সবাই অবাক। এ ডাক্তার সত্যি বিচিত্র। রুগীদের চিন্তায় এর ঘুম হয় না, স্বস্তি পান না। যখন তখন রুগী দেখতে আসেন। প্রয়োজন মনে করলে বার বার আসেন, থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দিনে, রাতে।

তারপর একদিন মিঃ চৌধুরী সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন। নিজেই এলেন ডাক্তারের কাছে। বললেন, আপনি না হলে সত্যি আমি বাঁচতাম না। আপনার ঋণ কোনোদিনই শোধ দিতে পারব না। তবু বলুন, কত দেব।

ডাক্তার হেসে বলে, না, না, আপনাকে কিছু দিতে হবে না।

—তাই কি হয়? আপনি বলুন, কী দেব?

ডাক্তার মুখ নিচু করে একটু ভাবে।

মিসেস চৌধুরী স্বামীর পাশেই ছিলেন। উনি বললেন, এতদিন আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করে তো বুঝতে পেরেছেন আমরা অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত। আপনাকে যা দেওয়া উচিত তা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই কিন্তু কিছু না দিলে তো আমরাও শান্তি পাব না।

ডাক্তার এবার হেসে বলনে, সত্যি কিছু দেবেন?

ওঁরা স্বামী-স্ত্রী প্রায় একসঙ্গেই বললেন, নিশ্চয়ই।

ডাক্তার দ্বিধা করে। বলে, কিন্তু যদি বেশি চেয়ে ফেলি তাহলে... ...

মিসেস চৌধুরী বললেন, আমরা জানি আপনি এমন কিছু চাইবেন না যা আমরা দিতে পারবো না।

এবার ডাক্তার যেন একটু সাহস পায়। বলিষ্ঠ হয়। বলে, ইচ্ছা করলে আপনারা দিতে পারবেন কিন্তু তা কি আমাকে দেবেন?

স্বামী-স্ত্রী এবারও একসঙ্গে বলেন, নিশ্চয়ই দেব।

—তাহলে অপরূপাকেই দিন।

আনন্দে, খুশিতে মিঃ চৌধুরী দু'হাত দিয়ে ডাক্তারকে টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেই কেঁদে ফেলেন। কাঁদতে কাঁদতেই বলেন, তুমি যে আমার কি উপকার করলে বাবা, তা পরমেশ্বরই জানেন।

মিসেস চৌধুরী দু'হাত দিয়ে ডাক্তারের মুখখানা ধরে কপালে একটু চুমু খেয়ে বললেন, তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোটো করব না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার খ্যাতি-যশ সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ুক।

ডাক্তার হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, এককালে বহু বড়ো বড়ো জমিদার সর্বস্বান্ত হয়েছে মদ আর রক্ষিতাদের কল্যাণে। বহু লোক সর্বস্বান্ত হয়েছে মামলা-মোকদ্দমা করে। কিন্তু আমাদের দেশে সব চাইতে বেশি লোকের সর্বনাশ হয়েছে রোগের জন্য।

আমি বলি, ঠিক বলেছ ডাক্তার।

ডাক্তার হেসে বলে, অন্যদের কথা আর কি বলব। আমার বাবা আর দিদির চিকিৎসা করতে গিয়েই মা পথে বসেন। ডাক্তার একটু থামে। তারপর বলে, তাই তো মা আমাকে অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ডাক্তারি পড়ান।

ডাক্তার অধিকাংশ সময়ই বর্তমানের কথা বলে। অতীতকে নিয়ে টানাটানির অভ্যাস বিশেষ নেই। কিন্তু আজ ডাক্তার শুধু ফেলে আসা দিনগুলোর কথাই বলছে!

ডাক্তার হাসতে হাসতে বলে, মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় যেমন পড়াশুনা করেছি, তেমনি প্রেম করেছি। দুটোই করেছি প্রাণভরে। এমন একটা সময় এসেছিল যখন নীলিমা আর জয়ার মধ্যে টাগ-অব-ওয়ার শুরু হল আমাকে নিয়ে। ঠিক এই সময় রি-ইউনিয়নে আলাপ হল শিখাদির সঙ্গে।

—কে শিখাদি?

—আরে, ডাঃ মৈত্রের স্ত্রী।

—তারপর?

—তারপর মাকে জগন্নাথ দর্শন করাবার জন্য পুরীতে গিয়ে হঠাৎ শিখাদির সঙ্গে দেখা।

—আরে ডক, তুমি?

—এখন তো সবে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। কেন আর, ডক বলে লজ্জা দিচ্ছেন?

—আজ না হোক কাল তো পাশ করে ডাক্তার হবে।

—যদি ফেল করি?

—ওসব কথা ছাড়ো। বেড়াতে এসেছ?

—মা জগন্নাথ দর্শন করতে এসেছেন।

শিখাদি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কাকে দর্শন করতে এসেছ?

ডাক্তারের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে যায়, আপনাকে।

আমি শুনেই হাসি। বলি, তারপর?

ডাক্তারও হাসে। বলে, ডাঃ মৈত্র ওঁর ডাক্তার বন্ধুদের সঙ্গে বিয়ার খেতেন, ফ্ল্যাশ খেলতেন—আর আমি শিখাদিকে নিয়ে পুরীর সমুদ্রে স্নান করতাম।

—আর?

—শিখাদি আমাকে আর মাকে নিয়ে কোনার্ক গেলেন। মা একটু দেখেই বসে রইলেন। আমি আর শিখাদি খুব ঘুরলাম।

—তারপর?

কলকাতা ফেরার দু'এক সপ্তাহ পর ডাঃ মৈত্রের বাড়ি ফোন করলাম।... ....

শিখাদি অভিমানের সুরে বললেন, তুমি তো অদ্ভুত ছেলে!

—কেন?

—এতদিন পরে তুমি ফোন করছ?

—কী করব বলুন। পড়াশুনা নিয়ে বড়োই ব্যস্ত ছিলাম তাছাড়া হসপিট্যাল ডিউটিও এমন পড়েছে যে... ...

—আচ্ছা থাক। অত লেকচার না দিয়ে চলে এসো।

—এখন?

—হ্যাঁ, এখন।

—আপনার ওখানে যাতায়াত করতে করতেই তো আমার হসপিট্যাল ডিউটি'র সময় হয়ে যাবে।

—সময় না থাকে ট্যাক্সিতে চলে এসো।

—ট্যাক্সি! ট্যাক্সি চড়ার পয়সা কোথায়?

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ভাড়া দেব। তুমি চলে এসো।

ডাক্তার আবার এক চুমুক হুইস্কি খায়। বলে, ভালো ছাত্র, ভালো ডাক্তার বলে ডাঃ মৈত্রের সঙ্গে শিখাদির বিয়ে দেন ওর বাবা। হসপিট্যাল আর প্রাইভেট প্রাকটিশ করে ডাঃ মৈত্র যেটুকু সময় পেতেন তা তাস খেলেই কাটিয়ে দিতেন। স্ত্রীর প্রতি কোনো কর্তব্য করাবই সময় ছিল নাও তাঁর।

আমি সিগারেট টানতে টানতে ডাক্তারের কথা শুনি।

ডাক্তার আবার এক চুমুক হুইস্কি খায়। আবার বলে, শিখাদি অত্যন্ত প্রাণবন্ত ছিলেন। তাই এই স্বামীর পাল্লায় পড়ে তিনি সত্যি পাগল হয়ে উঠেছিলেন। আমার সঙ্গে শিখাদির কোনো দৈহিক সম্পর্ক ছিল না কিন্তু উনি আমাকে সত্যি ভালোবাসতেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ জার্নালিস্ট! শিখাদি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন এবং ওরই তাগিদে আমি

বামন হয়েও চাঁদে হাত দিতে সাহস করেছি।

—তার মানে?

—শিখাদি অমন করে আমার পিছনে না লাগলে আমি সত্যি বিলেত যেতাম না। ডাক্তার একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। তারপর বলে, আমার বিলেত যাবার জাহাজ ভাড়া শিখাদিই দিয়েছিলেন।

—আচ্ছা!

—হ্যাঁ জার্নালিস্ট। কিন্তু বিলেত থেকে ফিরে এসে আর শিখাদিকে পেলাম না।

—কেন?

—শিখাদি আত্মহত্যা করেছিলেন।

—কেন?

—শিখাদি স্বামীর অবজ্ঞা অনেক সহ্য করেছিলেন কিন্তু যখন শুনলেন অমন ভাবভোল স্বামীরও আরেকটা সংসার আছে, তখন উনি সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেননি।

—সত্যি, কি দুঃখের কথা।

—কলকাতার অনেক ডাক্তারের কাছেই শিখাদির নামে অনেক কুৎসা নোংরামী শুনতে পাবে। অনেকে বলে, শিখাদি বছর দুই আমার সঙ্গেই সংসার করেছেন।

—এটা তো আমাদের জাতীয় চরিত্র।

—সে যাই হোক, শিখাদির কথা আমি কাউকে বলি না কিন্তু তোমাকে বলছি, ওর জন আমি এমন একটা শূন্যতা বোধ করতাম যা তোমাকে বোঝাতে পারব না।

ঠিক বুঝতে না পারলেও আন্দাজ করতে পারি।

ডাক্তার একটু হেসে বলে, অপরূপাকে প্রথম দিন দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম।..

...

—কেন?

—অনেকটা শিখাদির মতো দেখতে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তাইতো ওকে আমি বিয়ে করলাম।

—খুব ইন্টারেস্টিং তো!

—অপরূপাকে বিয়ে করার আরো একটা কারণ ছিল।

—কী?

—প্রথম দিন অপরূপার বাবাকে দেখতে গিয়েই বুঝলাম, ওরা ধনী নয়। আরো দু'চারদিন যাবার পর বুঝলাম, মিঃ চৌধুরীর অসুখের খরচ চালাবার মতো অর্থের সংস্থান ওদের নেই আমি ফি না নিলেও অন্য ব্যয় তো আছে।

—তা তো বটেই।

—তাই দেখলাম, অরূপাকে যদি বিয়ে করি, তাহলে ঐ পরিবারের অনেক উপকার হবে শুনে আমার ভালো লাগে। বলি, ডাক্তার তোমাকে কি আমি এমনি এমনি ভালোবাসি?

ডাক্তার যেন আমার কথা শুনেও শোনে না। বলে, আমি অপরূপাকে ভরিয়ে দিয়েছি সব কিছু দিয়ে। ওর কোনো ইচ্ছাই আমি অপূর্ণ রাখিনি। কিন্তু ও আমাকে এমন দুঃখ দিয়েছে

যে আজ আমি অপরূপার পাশে শুতেও ঘেন্না বোধ করি।

—কেন? অবাক হয়ে আমি প্রশ্ন করি।

—দুর্ঘটনাই বলতে পারো কিন্তু এখন কলকাতার বাজারে আমার বেশ সুনাম। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার হেসে বলে, চরিত্রের ব্যাপারে নয়, ডাক্তার হিসেবে।

তারপরই ডাক্তার গম্ভীর হয়। বলে, কিন্তু লোকে তো চরম বিপদে পড়েই আমাকে ডাকে।

—সে তো একশ' বার।

—তাই পেসেন্টদের বাড়ির অবস্থা খারাপ দেখলেই আমার বাবার অসুখের সময়ের কথা মনে পড়ে যায়। আমি কিছুতেই ওদের কাছ থেকে টাকা নিতে পারি না।

আমি হেসে বলি, এই মন আছে বলেই তো তুমি এত বড়ো হয়েছ!

ডাক্তার একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, একটা ঘটনা শোন। সেদিন শনিবার। রাত তখন গোটা নয়েক হবে। চেম্বারের রুগী দেখা শেষ করে দুটো একটা পেসেন্টের কিছু রিপোর্ট দেখছিলাম। হঠাৎ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন—

—চিনতে পারছ বাবা?

চেহারা অনেক বদলে গেছে কিন্তু তবু ডাক্তার চিনতে পারে, হ্যাঁ স্যার, চিনতে পারব না কেন?

—না বাবা, সব ছাত্র তো চিনতে পারে না। তাছাড়া তুমি এখন বিরাট ডাক্তার।

—ওকথা বলবেন না স্যার। আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে কিছু শিখেছি মাত্র। বলুন স্যার, কি ব্যাপার?

—বাবা, পাড়ার ডাক্তার বললেন, জামাইয়ের নাকি হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

—সে কি?

—হ্যাঁ বাবা। বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে বলেন, অন্য ডাক্তারের কাছে যাবার তো সাহস নেই, তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। তুমি যদি একটু দয়া... ...

—কী বলছেন আপনি? আমি এখুনি যাচ্ছি।

দু'এক মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার মাস্টারমশায়ের সঙ্গে গাড়িতে রওনা হয়।

গাড়ি মাস্টারমশায়ের বাড়ির সামনে থামতেই ডাক্তার ড্রাইভারকে বলে, তুমি বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে এসো। আর অপরূপাকে বলে দিও, আমি এখানে আছি।

পেসেন্টের ঘরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার যুদ্ধ শুরু করে। পাড়ার ডাক্তারবাবু ওকে সাহায্য করেন। ঘণ্টা তিনেক পরে যুদ্ধের প্রথম পর্ব শেষ হয়। ডাক্তার এবার একটু হেসে মাস্টারমশায়ের মেয়েকে বলে, দিদি, এবার এক কাপ চা খাব।

—এখুনি দিচ্ছি ডাক্তারবাবু।

—ডাক্তারবাবু না, আমি তোমার দাদা। বাবার ছাত্র দাদাই হয়, তাই না?

ডাক্তারের কথা শুনেই এই দুর্যোগের মধ্যেও আনন্দে মাস্টারমশায়ের মেয়ের চোখে জল আসে।

চা খেতে খেতেই পাড়ার ডাক্তারবাবু কিছু নির্দেশ দেন। পাড়ার ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর ডাক্তার মাস্টারমশাইকে প্রেসক্রিপসন দিয়ে বলেন, শুধু এক নম্বর ওষুধটা কিনবেন।

আর সব অষুধ আমার কাছে আছে। তারপর ডাক্তার মাস্টারমশায়ের মেয়েকে বলে দে কখন কোন ওষুধ খাওয়াতে হবে।

ডাক্তার যখন ও বাড়ি থেকে রওনা হয়, তখন রাত প্রায় দেড়টা। মাস্টারমশা ডাক্তারের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিতে যান। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে হেসে বলে, কি করছে স্যার?

ডাক্তার আর কথা বলতে পারে না। গাড়ি চালাতে শুরু করে।

ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ এক নার্সিংহোম থেকে ডাঃ ঘোষ ফোন করেন ডাক্তারকে তুমি একটু আসবে এখুনি? আমার একটা পেসেন্টের ব্যাপারে তোমার ওপিনিয়ন... .

ডাক্তার একটু হেসে জানতে চায়, পুরুষ না মেয়ে পেসেন্ট?

—পুরুষ।

—শালা, মেয়ে পেসেন্ট হলে তো কখনও আমাকে কনসাল্ট করার কথা মনে পড়ে না

ডাঃ ঘোষও হাসেন। বলেন, ওরে শালা, তুমি তো আমার বউয়ের মেডিক্যা এ্যাডভাইসার। আচ্ছা, তাড়াতাড়ি এসো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসছি।

ডাক্তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে নিজেই চালিয়ে চলে যায়। আধঘন্টার মধ্যেই নার্সিংহোম থেকে ডাক্তার বেরিয়ে পড়ে। সোজা চলে যা মাস্টারমশায়ের জামাইকে দেখতে। মাস্টারমশায়ের মেয়ে দরজা খুলেই দিয়েই অবাক আপনি? এত ভোরে?

ডাক্তার বলে, আগে বলুন, আমার পেসেন্ট কেমন আছেন?

—এখনও ঘুমুচ্ছেন।

ডাক্তার পেসেন্টকে দেখে। আবার ই-সি-জি করে। আরো কত কি! একটা ইনজেকশন দেয় ডাক্তার। তারপর আবার ই-সি-জি, আবার ব্লাড প্রেসার দেখে। খুব মন দিয়ে নাড়ি স্পন্দন পরীক্ষা করে বার বার। স্টেথো কানে দিয়ে বুক পরীক্ষা করে বহুক্ষণ ধরে।

ঘরখানা অত্যন্ত ছোটো। তাই ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় পা দিয়েই একটু হেসে মাস্টারমশায়ের মেয়েকে বলে, চায়ের জল চাপিয়েছো?

সেও হাসে। বলে, চায়ের জল ফুটছে।

তাহলে এক্ষুনি পাব?

—নিশ্চয়ই। এবার মাস্টারমশায়ের মেয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে দাদা?

ডাক্তারের মুখে হাসি লেগেই আছে। বলে, আমাকে দেখেও বুঝতে পারছো না?

—একটু ভালো, তাই না?

—একটু না, বেশ ভালো।

পাশের ঘরে বসে চা খাবার সময় মাস্টারমশাই ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, অত রাত্তিরে গিয়ে আবার এই ভোরবেলায় না এসে একটু বেলায়..

—সাড়ে চারটের সময় একটা নার্সিংহোমে একজন পেসেন্টকে দেখতে গিয়েছিলাম। তাই ফেরার পথে ঘুরে গেলাম।

মাস্টারমশায়ের মেয়ে বলে, তাহলে তো ঘন্টা দুয়েকের বেশি ঘুম হয়নি।

ডাক্তার হেসে বলে, না, তা হয়নি।

—দিনে কি ঘুমুবার সুযোগ হবে?

—বছর খানেকের মধ্যে তো দিনে ঘুমুবার সুযোগ হয়নি। জানি না আজ কি হবে।

—কিন্তু এভাবে পরিশ্রম করলে তো শরীর ভেঙে পড়বে।

—বিধবা মা অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আমাকে মানুষ করেছেন। এই কষ্টে আমার শরীর ভেঙে পড়বে না।

দিন পাঁচেক পর মাস্টারমশায়ের জামাইয়ের অবস্থা সত্যি ডাক্তারকে ঘাবড়ে দিয়েছিল কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত সামলে যায়। তারপর থেকে আস্তে আস্তেই অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

এই তিন সপ্তাহে ডাক্তারের সঙ্গে এ বাড়ির সবার সম্পর্কও অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। মাস্টারমশায়ের স্ত্রী আর ঘোমটার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন না। মাস্টারমশায়ের সেই কৃপাপ্রার্থীর মনোভাব আর নেই। জামাই সুজিত ডাক্তারের প্রায় বন্ধু হয়ে গেছে। হাসতে হাসতে সুজিত বলে, এখন মনে হচ্ছে শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসে অসুস্থ হওয়ায় ভালোই হয়েছে। অসুস্থ না হলে তা তো আপনাকে পেতাম না। মাস্টারমশায়ের মেয়ে দেবকী বলে, আমরা এলাহাবাদ ফিরে গেলে আপনাকে একবার আসতেই হবে।

ডাক্তার হেসে বলে, সময় কোথায়?

—ওসব জানি না। আপনাকে আসতেই হবে।

ডাক্তার ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, আসতেই হবে?

—একশ' বার আসতে হবে।

ডাক্তার সুজিতের দিকে তাকিয়ে বলে, জামাই, শুনছ তোমার বউয়ের কথা?

—ও ঠিকই বলছে।

ডাক্তার বলে, তাহলে একবার নিশ্চয়ই এলাহাবাদ যেতে হবে।

এর দু'চার দিন পরেই অপরূপা হাসতে হাসতে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল, মাস্টারমশায়ের বাড়িতেও কি আরেকটা অপরূপার দেখা পেলে?

ডাক্তার অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

—মানে দেখে শুনে মনে হচ্ছে ওখানেও একটা অপরূপা পেয়েছ। তা না হলে বিনা পয়সার চিকিৎসায় এত উৎসাহ কেন?

—যাদের বেশি পয়সা নেই, যারা শুধু আমার উপর নির্ভর করে, সেরকম সব পেসেন্টদের বাড়িতেই আমি বার বার যাই।

—পয়সা পেলে কেন যাবে না?

—শুধু পয়সার জন্য আমি চিকিৎসা করি না।

—কেন তুমি কি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী?

—সন্ন্যাসী কেন হব?

—তাহলে মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে কিছু নিলে না কেন?

—কারণ উনি আমার মাস্টারমশাই।

—পেসেন্ট তো ওর জামাই। সে তো চাকরি বাকরি করে?

ডাক্তার হেসে বলে, ও বাড়ি থেকে টাকা নিইনি বলে কি তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে?

—কষ্টের কথা তো বলি না। তোমার প্রাপ্য তুমি নেবে না কেন?

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারে না। মুখ নিচু করে একটু ভাবে। বলতে পারে না, অপরূপা, আমি যদি আমার উচিত প্রাপ্য নিতাম তাহলে তোমার বাবা-মাকে পথের ভিখারী হতে হত। তোমারও বিয়ে হত কি না, তা ভগবান জানেন। ডাক্তার বলতে পারে না তার মায়ের কথা, দ্যাখ বাবা, পয়সার লোভে চিকিৎসা করবি না। যদি তোর খাওয়া-পরার কষ্ট না থাকে, তাহলে কোনো গরিব লোকের কাছ থেকেই পয়সা নিস না। দেখবি ওদের আশীর্বাদে তোর আয় দশগুণ বেড়ে যাবে।

মার কথা ভাবতে গিয়েও ডাক্তারের চোখে জল আসে। ডাক্তার হুইস্কির গেলাসটা পাশে সরিয়ে রেখে আমাকে বলে, জানো জার্নালিস্ট, মার কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি প্রমাণিত হয়েছে আমার জীবনে। একটা গরিব পেসেন্টের টাকা ছেড়ে দিলে দশটা বড়োলোকের বাড়ির পেসেন্ট হাতে আসে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, জার্নালিস্ট। আমি পদে পদে এর প্রমাণ পাই। ডাক্তার একটু হেসে বলে, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি কি ভবিষ্যতে বেশি পাবার লোভে এদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছি না? পর মুহূর্তে মনে হয়, না, না, তা কেন হবে? আমি তো আমার মাতৃ আজ্ঞা পালন করছি।

—তাই তো।

ডাক্তার গেলাসে এক চুমক দিয়ে বলে, অপরূপা এত তাড়াতাড়ি তার অতীত ভুলে গেল যে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। তাছাড়া ও যত পেয়েছে, তত ওর লোভ বেড়েছে। আমি সত্যি এসব ভাবতে পারি না।

—তুমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছ?

—বহুবার, বহুভাবে। ডাক্তারের গেলাস খালি হয়। আবার ভরে নেয়। বলে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমনই অদ্ভুত যে একজনের সব মহত্ত্ব-ক্ষুদ্রতাই অন্যের কাছে ধরা পড়ে। তাই প্রতিদিন প্রতি পদক্ষেপে ওর এত ক্ষুদ্রতা এত দৈন্য দেখি যে আমি আর ওকে ভালোবাসতে পারি না ; বরং ঘেন্না করি। আমি আস্তে আস্তে ওর থেকে দূরে সরে যেতে যেতে আজ কতজনের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি।

এবার আমি একটু হেসে বলি, অনেকের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছ?

—হ্যাঁ, অনেকের কাছে। তারপর ডাক্তার একটু হেসে বলে, ছাত্রজীবনে অনেকের সঙ্গে প্রেম করেছি কিন্তু চরিত্রহীন ছিলাম না। একবার নীলিমা আমাকে কি বলেছিল জানো?

—কি?

—বলেছিল, ছেলেদের সঙ্গে একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা হলেই তারা অনেক কিছু দাবি করতে শুরু করে কিন্তু তুমি বেশি কিছু দাবি কর না বলেই তোমার সঙ্গে এত প্রাণখুলে মিশতে পারি!

শুনে আমি হাসি!

ডাক্তার হুইস্কির গেলাসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একটু ম্লান হাসি হাসে

আপনমনে। তারপর সে যেন স্বগতোক্তি করে, নদীর জলে বাধা দিলেই সে দশদিক দিয়ে এগুবার চেষ্টা করে : এটাই জলের ধর্ম। মানুষেরও তাই স্বভাব। সে একজনের কাছে প্রাণ ভরে ভালোবাসা পেলে দশজনের কাছে ভালোবাসার ভিক্ষা চাইবে না, কিন্তু ঐ একজনের কাছে হতাশ হলে সে বিপথগামী হবেই।

আমি বলি, হ্যাঁ ডাক্তার, অনেকের জীবনেই এই ঘটনা ঘটে।

ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, জার্নালিস্ট, এখন অন্যের কথা বাদ দাও। আমার কথাই শোন।

পার্ক সার্কাসের এক তরুণ ডাক্তারের টেলিফোন পেয়েই ডাক্তার ছুটে গেল। ভদ্রলোক বয়স বেশি না, বড়ো জোর চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। কনস্‌ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার। বিলেতেই থাকেন। বিয়ে করেছেন বছর পাঁচেক আগে। একটি মেয়ে হয়েছে। তার বয়স বছর দেড়েক। ভদ্রলোকের স্ত্রীকে এককালে কলকাতার নানা মঞ্চে শ্যামার ভূমিকায় দেখা গেছে। সবচাইতে ছোটো ভাইয়ের বিয়ের জন্য লন্ডন থেকে এসেছেন। বিয়েও বেশ ভালোভাবেই হয়েছে। বৌ-ভাতও খুব সুষ্ঠুভাবে হল। চার ভাই মহা খুশি। খুশি ওদের বৃদ্ধা মা ও বাড়ির সবাই।

দু'দিন পর ভোরের দিকে হঠাৎ বুকে ব্যথা। অসহ্য ব্যথা। অবশ হয়ে যাচ্ছে এক দিক। সঙ্গে ঘাম। ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ছুটে এলেন। একটু দেখেই তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেল। ওঁর টেলিফোন পেয়েই ডাক্তার ছুটে গেলেন। হ্যাঁ, যা সবাই আশঙ্কা করেছিলেন, তাই।

বড়ো ভাই ডাক্তারকে বললেন, ভাইকে সুস্থ করার জন্য যা দরকার তাই করুন। ডাক্তার নার্স ওষুধ—নার্সিংহোম, কোনো ব্যাপারেই আপনার দ্বিধা করার প্রয়োজন নেই।

ডাক্তার বললেন, এ পেসেন্টকে নার্সিংহোম নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাই বাড়িতেই সবকিছু করতে হবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করুন।

পার্ক সার্কাসের এই বাড়িরে পেসেন্টের ঘরকেই আধুনিক নার্সিংহোমে পরিণত করা হল। কত রকমের মেসিন আনা হল। কার্ডিয়াক পেসেন্ট দেখাশুনা করে এমন নার্সদেরও আনা হল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখছেন ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান। এছাড়া ডাক্তার বার বার আসছেন ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকছেন।

বাহাত্তর ঘণ্টা কেটে গেল। সবার চোখেই আশার আলো। রাত সাড়ে বারোটার পর ডাক্তার বাড়ি যাবার সময় বলে গেলেন, হার্টের কন্ডিশন অনেকটা স্টেবিলাইজ করেছে। অবস্থা এইরকম থাকলে ভয়ের কিছু নেই।

রাত পৌনে তিনটের সময় হঠাৎ সিস্টারের ফোন, স্যার এখুনি চলে আসুন।

ডাক্তার পনের মিনিটের মধ্যে ছুটে যায়।

হ্যাঁ, হঠাৎ সেই ব্যথা, সিরিয়াস সেই ব্যথা। ডাক্তার যুদ্ধ করে, যুদ্ধ করে নার্স কিন্তু না, ওরা হেরে গেল। চারদিকে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই এ বাড়িতে অমাবস্যার অন্ধকার নেমে এল। ডাক্তারের পায়ের উপর মূর্চ্ছা গেলেন পেসেন্টের স্ত্রী আর বড়ো ভাই। ডাক্তার চোখে অন্ধকার দেখে। হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম। সামলে নেয় সিস্টার।

ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মৃত্যু অনেক দেখিছি কিন্তু এই পেসেন্টের মৃত্যুতে

এমন শক্ পেলাম যে তখন গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরার মতো অবস্থা আমার নেই। সিস্টার কাছেই সি. আই. টি. রোডে থাকত। ও আমাকে ওর বাড়িতেই নিয়ে গেল।

—তারপর?

ছোট্ট দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাট। আশা আর ওর দাদা-বৌদি থাকেন। কখনও কখনও দেশ থেকে মা আর ছোটো ভাই আসে। ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায়, অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা কিন্তু আশার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে যান ডাক্তার।

ডাক্তার বলল, বোধহয় ঘন্টাখানেক আশার ওখানে ছিলাম কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই বুঝলাম, আশা মানুষকে ভালোবাসতে পারে, মানুষের সুখ-দুঃখ বোঝে।

তারপর প্রায় বছর খানেক আশার সঙ্গে ডাক্তারের দেখা হয় না। সেদিন রুগীরা চলে যাবার পরও ডাক্তার চেম্বারে বসে আছেন এক বন্ধুর অপেক্ষায়। একলাই। স্টাফদের ছুটি দিয়েছেন। হটাৎ টেলিফোন... ...

—ইয়েস।

—স্যার আমি আশা।

—আশা। মানে সিস্টার আশা?

—হ্যাঁ স্যার।

—কেমন আছ? কাজকর্ম কেমন চলছে?

—এমনি ভালো আছি, তবে কাজকর্ম কখনও ভালো, কখনও খারাপ।

—তুমি কি কোনো নার্সিংহোমে চাকরি করতে ইন্টারেস্টেড?

—হ্যাঁ স্যার।

—ঠিক আছে, আমি দেখছি।

—স্যার, আমি কিন্তু নিজের জন্য টেলিফোন করিনি।.. . .

—হ্যাঁ বল, টেলিফোন করলে কেন?

—স্যার আপনার শরীরটা বোধহয় ঠিক নেই, তাই না?

—হ্যাঁ, খুব টায়ার্ড কিন্তু তুমি কি করে জানলে?

—সেদিন কন্টিনেন্টাল নার্সিংহোমে আপনাকে দূর থেকে দেখেই... ...

—তুমি ওখানে ছিলে নাকি?

হ্যাঁ স্যার, আমি পাশের কেবিনে ছিলাম কিন্তু আপনাকে দেখেছি। দেখেই মনে হল, আপনার রেস্ট দরকার।

সত্যি ডাক্তার বড়ো ক্লান্ত। হবে না কেন? এত রুগী সামলান কি সহজ ব্যাপার? খাওয়া-দাওয়ার কোনো ঠিক নেই। ঘুম? না, বহুকাল ভালো করে ঘুমুতে পারে না কিন্তু কেউ তো ডাক্তারকে বলেনি, তুমি ক্লান্ত, তুমি বিশ্রাম নাও।

মুগ্ধ ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারে না। কয়েক মুহূর্ত পরে বলে, ঠিক বলেছ আশা, আমার রেস্ট দরকার।

—অন্তত দশ-পনের দিনের জন্য কোথাও চলে যান স্যার।

—অত দিন বাইরে থাকা মুস্কিল কিন্তু পাঁচ-সাত দিনের জন্য যেতে পারি। তবে একলা গেলে তো সারাদিন শুধু হুইস্কি খাব ; তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

—আমি? আশা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, তুমি।

—আপনি সিরিয়াসলি বলছেন স্যার?

—হ্যাঁ আশা, আমি সিরিয়াসলি বলছি। তুমি ক'দিন দেখাশুনা করলে আমি সত্যি সুস্থ হব।

—আপনি যদি তাই মনে করেন তাহলে নিশ্চয়ই যাব স্যার।

ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, আশাকে নিয়ে চলে গেলাম গোপালপুর অন-সী। ওবেরয় পান বীচ-এ আগের থেকেই ঘর বুক করা ছিল। সত্যি বলছি জার্নালিস্ট, আমাকে আশা কত শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, তা সেবার দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সেবা-যত্নের কথা তো বাদই দিচ্ছি।

আমি একটু হেসে বললাম, সো, ইউ হ্যাড এ ওন নাইস টাইম।

—একশ'বার! মানসিক, দৈহিক সব দিক থেকেই মহানন্দে ছিলাম।

—আশা এখনও কলকাতায় আছে? আমি হাসি চেপে প্রশ্ন করি।

—হ্যাঁ।

—এখনও মাঝে মাঝে গোপালপুরেব সমুদ্রে দুজনে একসঙ্গে স্নান করো?

—বছরে একবার নিশ্চয়ই যাই! তাছাড়া দু'এক মাস অন্তর দু'একদিনের জন্য কোথাও না কোথাও আশাকে নিয়ে চলে যাই।

—তুমি কি আশাকে ভালোবাসো?

—নিশ্চয়ই ভালোবাসি।

—আর কাকে ভালোবাসো?

—অনেককেই আমি ভালোবাসি।

—অনেককে?

—হ্যাঁ অনেককে। যারা আমাকে ভালোবাসে, আমিও তাঁদের ভালোবাসি।

আমি হেসে বলি, নট এ ব্যাড থিওরি।

ডাক্তার আমার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরায়। পর পর দু'তিনটে টান দেবার পর বলল, এইতো দিল্লি আসার পথে দু'দিন এলাহাবাদে কাটিয়ে এলাম।... ...

—এলাহাবাদে?

—হ্যাঁ। দেবকী আছে না?

—কোন্ দেবকী?

—মাস্টারমশায়ের মেয়ে। যার স্বামীর... ...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। তুমি তাহলে সত্যি এলাহাবাদ গেলে?

—গেলে মানে? দিল্লি আসা-যাওয়ার পথে সব সময় এলাহাবাদ নামি! না নেমে পারি না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করি, তোমার হৃৎপিণ্ডের এক টুকরো কি ওখানেও জমা রেখেছ?

—ইয়েস।

—গুড গুড।

—তাহলে শোনো।... ...

আগে মনে পড়েনি। মনে পড়লে নিশ্চয়ই চিঠি লিখত, দেবকী, মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কাজে দিল্লি যাচ্ছি। মাঝ পথে এলাহাবাদ। তাই ভাবছি নেমেই পড়ব দু'এক দিনের জন্য। তোমাদের দুজনের সঙ্গে আড্ডা দেবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারছি না। কিন্তু না, মনে পড়েনি। ডাক্তার এত ব্যস্ত থাকে যে অনেক কথাই মনে পড়ে না। রুগীদের চিন্তায় এত ব্যস্ত থাকে যে অন্য কোনো কিছু চিন্তার অবকাশ পায় না। মনে পড়ল কালকা মেলে উঠে। ডাক্তার মনে মনে অনুশোচনা করে চিঠি না দেবার জন্য। চিঠি না দিয়ে যাওয়া উচিত নয় কিন্তু মনে মনে বড়ো ইচ্ছে করছে দেবকীর কাছে যেতে।

কালকা মেলের বার্থে বসে হুইস্কি খেতে খেতে ডাক্তারের মনে পড়ে দেবকার কথা।.. ...

—ডাক্তারদা।

—কি? ডাক্তার মুখ না ফিরিয়েই জানতে চায়।

—এই হরলিক্সটুকু খেয়ে নিন।

ডাক্তার বিস্মিত হয়ে ওকে দেখে। ওর স্বামী জীবন-মরণের মাঝে ভাসছে কিন্তু তবু সে হরলিক্স এনেছে!

দেবকীর মুখে হাসি নেই কিন্তু সারা মুখে তার ঐকান্তিকতার ছাপ। বলল, এখন রাত প্রায় একটা। কখন বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করবেন, তার তো ঠিক নেই। এটুকু খেয়ে নিন।

ডাক্তার একটু হেসে বলে, এই অবস্থার মধ্যেও তুমি আমার জন্য হরলিক্স তৈরি করলে?

—তাতে কি হল? আপনার শরীরটাও তো দেখতে হবে।

হুইস্কির গেলাসের দিকে তাকালেই যেন ডাক্তার দেবকীকে দেখতে পায়। কি অপূর্ব শান্ত, স্নিগ্ধ মূর্তি! ঐ মহাবিপর্যয়ের মধ্যেও সে অবিচলভাবে কর্তব্য পালন করেছে। বিপদের মধ্যেও সে মুষড়ে পড়েনি ; আবার যেদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হল সেদিন আনন্দেও ভেসে যায় নি। ও যেন মাঝ গঙ্গায় আপন মনে ভাটিয়ালি গাইতে বিভোর। জোয়ার না ভাটা—সেদিকে খেয়ালই নেই।

জামাইয়ের ঘরে ডাক্তার ছাড়াও আরো অনেকে। হঠাৎ দেবকী এসে বলল, ডাক্তারদা, একটু হাত ধুয়ে নিন।

—না, না, এখন কিছু খাব না?

দু'মিনিট পরেই দেবকী ঘুরে এল। সবার সামনে নির্বিবাদে বলল, শিগগির হাঁ করুন।

ডাক্তার অবাক হয়ে হাসে। দেবকী ঐ সুযোগেই ওর মুখের মধ্যে লুচি আলুর দম পুরে দেয়।

এ রকম আরো কত টুকরো ঘটনা ডাক্তারের মনে পড়ে। দেবকীর কথা ভাবতে ভাবতে এমন বিভোর হয়ে যায় যে হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিতেও ভুলে যায়। তারপরে হঠাৎ কালকা মেল খুব জোরে ব্রেক কষে থামতেই ডাক্তারের সংবিত ফিরে আসে।

ডাক্তার গেলাসের হুইস্কি শেষ করে আবার ভরে নেয়। আবার ভাবে দেবকীর কথা। জামাইয়ের কথা। খবর না দিয়ে গেলেও কোনো অসুবিধা নেই। ডাক্তারকে কাছে পেলে ওরা দুজনেই খুশি হবে। দারুণ খুশি হবে। পাঁচ পেগ হুইস্কি পেটে যাবার পর ডাক্তার ঠিক করল, এলাহাবাদে নামবে। নামতেই হবে।

কালকা মেল আধ ঘণ্টা দেরিতে এলাবাদ পৌঁছল। ঠিক মহল্লায় পৌঁছে যেতে বেশি সময় লাগল না কিন্তু বাড়িটা খুঁজতে খুঁজতে একটু সময় লাগল। ডাক্তার পৌঁছবার আগেই জামাই অফিস চলে গেছে। দরজা খুলেই ডাক্তারকে দেখে দেবকী আনন্দে খুশিতে চিৎকার করে উঠল, ডাক্তারদা!

দেবকী ওর হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়েই টিপ করে প্রণাম করল। ডাক্তার দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, খবর না দিয়ে এসে অন্যায় করলাম কি?

দেবকী ডাক্তারের বুকের উপর মুখখানা রেখে বলে, এমন অন্যায় রোজ করতে পারেন না?

—রোজ?

—হ্যাঁ রোজ। রোজ আপনার কথা ভাবি।

—কাল সারারাত আমিও তোমার কথা ভেবেছি আর গেলাসের পর গেলাস হুইস্কি খেয়েছি।

—তাই কি কাল সারারাতে আমিও ঘুমোতে পারিনি?

—কাল রাত্তিরে বুঝি তোমার ঘুম আসছিল না? ডাক্তার আলতো করে হাত দিয়ে দেবকীর মুখখানা তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করে।

—ঘুমিয়েছি কিন্তু একেবারে ভোর রাত্রে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—জামাই কিছু বলল না?

—ও জানে না।

—তাহলে সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো?

—নিশ্চয়ই ভালোবাসি। প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি।

ডাক্তার ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব চাপা গলায় বলল আমিও তোমাকে ভালোবাসি।

—জানি।

—সত্যি জানো?

—হ্যাঁ জানি।

—কি করে জানলে?

—পরে বলব। এখন বসুন। চা করি।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে বাহুবন্ধন থেকে দেবকীকে মুক্তি দিয়ে বলে, হ্যাঁ, চা করো। কতদিন তোমার হাতের চা খাই না।

ডাক্তার কোট খোলে, টাই খোলে, জামার বোতামগুলো খুলে পাখার তলায় বসে।

দেবকী চা আনে। পাশে বসে। বলে, সত্যি, আমি ভাবতে পারছি না। আপনি এসেছেন।

—কেন?

—মনে হচ্ছে, আমি যেন স্বপ্ন দেখছি।

—কাল দুপুরেও আমি জানতাম না, আজ দুপুরে তোমাকে কাছে পাব।

—কেন? আগের থেকে ঠিক করেননি?

—না। ট্রেনে উঠে হুইস্কি খেতে খেতে ঠিক করলাম. দেবকীর কাছে যাব।

—খুব ভালো করেছেন। চা খেতে খেতে দেবকী বলে, আপনি স্নান করুন। আমিও চটপট কাজ সেরে নিই। তারপর সারা দুপুর গল্প করব।

—তোমার আবার কি কাজ?

—একটু রান্না করব।

—কেন? তোমার রান্না হয়নি?

—হয়েছে, একটু বাকি।

—না, না, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। যা আছে তাই দুজনে ভাগ করে খেয়ে নেব।

—না, ডাক্তারদা তা হয় না।

ডাক্তার দেবকীর কাঁধে হাত রেখে বলেন, তাই হবে। তারপর একটু থেমে বলেন, তুমি যা দেবে তাতেই আমার পেট ভরবে।

—না, না, আপনার কষ্ট হবে।

—দেবকী, আমি বিধবার ছেলে। শুধু সিদ্ধ ভাত খেতেও আমার কষ্ট হয় না।

না. দেবকী আর কিছু রান্না করে না। যা ছিল তাই দিয়ে দুজনে খেতে বসে—ডাইনিং টেবিলে না, মেঝেয় আসন পেতে। কোনো চায়নার প্লেটে না, কাঁসার থালায়। দেবকী হাসতে হাসতে বলল, খুব অসুবিধে হচ্ছে তো?

—তা একটু হচ্ছে। মা মরে যাবার পর কেউ তো এমন আন্তরিকভাবে যত্ন করে খাওয়ায় নি, তাই অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে গেছে।

দেবকী অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়। ডাক্তার আবার বলে, জানো দেবকী আমি নাকি নামকরা ডাক্তার। আমি চেম্বারে বসেই এক একদিন সাত আট হাজার টাকা আয় করি।...

...

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ দেবকী। সবাই একশ' আঠাশ টাকা করে দেয়। পনের-কুড়ি জন পেসেন্ট রোজই দেখি কিন্তু কোনো কোনো দিন পঞ্চাশ ষাট-জনকেও দেখি। আজ আমার কত কি হয়েছে কিন্তু পাগলের মতো খুঁজে বেড়াই আন্তরিকতা আর ভালোবাসা। তারপর ডাক্তার একটু হেসে বলে. ঐ দুটোর লোভেই তোমার কাছে চলে এলাম।

দেবকী, মুখ নিচু করে বলে. ও দুটোর অভাব কোনোদিন এখানে হবে না।

—কোনোদিন হবে না?

—না কোনোদিন হবে না।

ডাক্তার খেতে খেতেই দেবকীকে একবার চুমু খায়।

খেয়ে উঠেই ডাক্তার শুয়ে পড়ে। দেবকী ওর পাশে বসে গল্প করে—জানেন ডাক্তারদা, আপনাদের জামাই যেদিন অসুস্থ হয়, সেদিন বাবা খুব ভয়ে ভয়ে আপনার কাছে গিয়েছিলেন।

—কেন?

—বাবা আপনাকে স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়াতেন। দীর্ঘকাল আপনার সঙ্গে বাবার যোগাযোগ হয়নি। ইতিমধ্যে আপনি বিখ্যাত ডাক্তার হয়েছেন।

—তার জন্য ভয়ের কি আছে?

—ভয় ছিল টাকাকড়ির ব্যাপারে। টাকা ব্যয় করে জামাইয়েব চিকিৎসা করাবার ক্ষমতা বাবার ছিল না। তাই...।

দেবকী কথাটা শেষ করে না।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করে, তাই কি?

—তাই আপনি যখন টাকা নিলেন না তখন আনন্দে বাবা কেঁদে ফেলেছিলেন। আবার যখন ওষুধপত্র দিলেন তখন বাবার গর্ব দেখে কে?

ডাক্তার হাসে।

দেবকী আবার বলে, সত্যি আপনি ঐভাবে চিকিৎসা না কবলে ওকে আমরা বাঁচাতে পারতাম না।

ডাক্তার দেবকীর হাতখানা নিয়ে খেলা করতে করতে বলে, না, দেবকী, ঠিক বললে না। টাকা ব্যয় করলেই কি রুগীকে বাঁচান যায়? এবার ডাক্তার একটু হেসে বলে, একটা কথা তোমাকে বলছি, কিন্তু কাউকে বল না।

—না, না, বলব না।

—মাস্টারমশায়ের জন্যই তোমাদের বাড়ি যাই কিন্তু জামাইয়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি শুধু তোমার জন্য।

—আমার জন্য?

—একশ'বার তোমার জন্য?

—কেন? আমি কি করলাম?

সেদিন তোমাকে দেখেই মনে হয়েছিল, আহা এই মেয়েটা যদি আমাকে একটু ভালোবাসত তাহলে আমার জীবন ধন্য হত।

—কি বলছেন আপনি?

—হ্যাঁ দেবকী সত্যি কথাই বলছি। তোমাকে খুশি করার জন্যে মিথ্যে বলছি না এবং বিশ্বাস করো, কোনোদিনই আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলতে পারব না।

দেবকী মুখে কোনো কথা বলে না। বলতে পাবে না। শুধু মুগ্ধ দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ডাক্তার বলে, সেদিন তোমাকে দেখেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব যাতে দেবকী দুঃখ না পায়। ভগবান আমার মুখ রক্ষা করেছেন। ডাক্তার একটু থেমে বলে, তবে দু'চারদিন পরে জামাইয়েরও প্রেমে পড়ে গেলাম। ভারি সুন্দর ছেলে।

দেবকী বলে আপনাকে যে ও কি চোখে দেখে তা বলে বোঝাতে পারব না।

—তা আমি জানি, বুঝি।

দেবকী একটু কাত হয়ে বসে ডাক্তারের মাথায় হাত দিতে দিতে বলে, রাত্রে তো ঘুমোননি। এখন একটু ঘুমিয়ে নিন।

—না, না, ঘুমোব না।

—কেন? ঘুম পাচ্ছে না?

—ঘুমালেই তো তুমি চলে যাবে।

—না না, আমি চলে যাব না। আপনি ঘুমোন, আমি আপনার কাছেই থাকব। হঠাৎ ডাক্তার পাশ ফিরে শুয়ে দেবকীর কোমর জড়িয়ে ধরে বলে, দেবকী তোমাকে এত কাছে পেয়ে আমি যদি কোনো অন্যায় দাবি করি?

—আপনার কোনো দাবিই অন্যায় হবে না।

—কি বললে?

—বললাম তো, আপনি যা ইচ্ছে দাবি করতে পারেন। আপনার কোনো দাবিকেই আমি অন্যায় মনে করব না।

আনন্দে, উত্তেজনায় ডাক্তার উঠে বসে দু'হাত দিয়ে দেবকীকে জড়িয়ে ধরে বলে, সত্যি অন্যায় মনে করবে না?

—না, কখনই না।

—আমার চরম দুর্বলতা দেখেও রাগ করবে না?

—না, ডাক্তারদা, আমি কোনোদিনই আপনার উপর রাগ করব না।

ডাক্তার দেবকীকে নিয়ে আনন্দে উন্মাদ হয়ে যায়।

দু'জনে মুগ্ধ হয়ে দুজনকে দেখে। দুজনের মুখেই আত্মতৃপ্তি মাখা খুশির হাসি। মুখে না, শুধু চোখে চোখেই দুজনে কথা বলে। অনেক কথা যে কথা মুখে বলা যায় না, তা শুধু চোখের ভাষাতেই বলা যায়। অনেকক্ষণ এ ভাবেই কেটে যায়।

তারপর দেবকী বলে, কেউ ভাবতেও পারবে না এত বড়ো ডাক্তার আমার কাছে এসে এত ছেলেমানুষী করে।

—আমি বুঝি খুব বড়ো ডাক্তার?

—হ্যাঁ, তবে আমার কাছে আপনি শুধু ডাক্তারদা।

—ঠিক বলেছ দেবকী! যে বড়ো হয় সেও মানুষ।

—আমি তো সেই মানুষটাকেই ভালোবাসি, বড়ো ডাক্তারকে না।

—আমি জানি ; বড়ো ডাক্তার ভাবলে তুমি এভাবে আমাকে কাছে টেনে নিতে পারতে না।

আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করেই ডাক্তার বলে, দেবকী, চা খাওয়াও। তারপর চল আমরা দুজনে জামাইকে নিয়ে আসি।

ডাক্তারের কথা শুনে দেবকী অবাক হয়। বলে, আপনি ওর অফিস যাবেন?

—যাব না কেন? আমরা দুজনে ওকে আনতে গেলে খুব মজা হবে।

—মজা মানে? ও আপনাকে দেখে চমকে যাবে।

দেবকী চা করে। দুজনে পাশাপাশি বসে চা খেতে খেতে কথা হয়। ডাক্তার বলে, কাল

এমন সময় আমি আবার ট্রেনে।

—সে কি? আপনি কালই যাবেন?

—পরশু যে দিল্লিতে মিটিং আছে। কাল দিল্লি এক্সপ্রেসে যাব

—কী আশ্চর্য! তাহলে আপনি এলেন কেন?

—কেন এলাম, তা এখনও বুঝতে পারনি?

দেবকী মাথা নেড়ে বলে, না, না, কাল যাওয়া হবে না। এসেছেন যখন তখন দু'চারদিন থাকতেই হবে।

—কিন্তু পরশু যে আমাকে দিল্লিতে থাকতেই হবে।

—তা আমি জানি নে।

—যদি তুমি বল, তাহলে ফেরার পথে আবার আসতে পারি।

—সত্যি আসবেন?

—তুমি বললেই আসব কিন্তু. . . .

—আবার কিন্তু কেন?

—আমি যদি আবার পাগলামি করি?

—যত ইচ্ছে পাগলামি করবেন কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে। দেবকী ডাক্তারের হাত দুটো চেপে ধরে বলে।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ডাক্তার দেবকীর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি না বললেও আমি আসতাম।

—তবে কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন?

—পাগলামি করার পারমিশনটা আগে থেকে আদায়ের লোভে।

লজ্জায় দেবকী উঠে যায়।

সাইকেল রিক্সায় উঠেই ডাক্তার দেবকীকে জিজ্ঞেস করল, জামাইয়ের ছুটি হতে কত দেরি আছে?

দেবকী ঘড়ি দেখে বলল, এখনও ঘন্টাখানেক।

—তাহলে আমরা কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরেই জামাইয়ের অফিসে যাব।

—কোথায় ঘুরবো?

—এমনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব।

—হেঁটে হেঁটে।

—না, না, এই সাইকেল রিক্সায়। তোমাকে পাশে নিয়ে ঘোরার মতো সুযোগ হয়নি তাই... ...

দেবকী ডাক্তারের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে, আপনি সত্যি বিচিত্র মানুষ।

এ-জি অফিসের সামনে এসে যখন রিক্সা থামল, তখন ছুটির সময় প্রায় হয়ে এসেছে। দেবকী বলল, আমরা এখানেই অপেক্ষা করি। ও এখুনি বেরুবে।

হ্যাঁ, জামাই একটু পরেই বেরুল। ডাক্তারকে দেখেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। তারপর বাড়ি এসে কত হাসি, কত গল্প।

ডাক্তার মাঝখানে বসে দুহাত দিয়ে দুজনকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমার অনেক দোষ ত্রুটি আছে কিন্তু ভাই, আমি তোমাদের দুজনকে সত্যি ভালোবাসি। তোমরা আমাকে দূরে সরিয়ে দিও না।

জামাই বলে, ডাক্তারদা, জানি আপনি অনেক বড়ো কিন্তু তবু আপনাকে আমাদেরই একজন মনে করি। আমরা ভুল করে আপনাকে সরিয়ে দিতে চাইলেই আপনি সরে যাবেন কেন? আমরা দুজনেই তো আপনার।

দেবকী বলে, ডাক্তারদা, আপনি যে আমাদের কত প্রিয়, কত আপন, তা কি আপনি বোঝেন না?

ডাক্তার বলে, তা জানি বলেই তো তোমাদেরই কাছে ছুটে এসেছি। আবার দিল্লি থেকে ফেরার পথে আসব। তারপর সময় পেলেই আসব। তোমাদের কাছে না এসে থাকতে পারব না।

সত্যি, ডাক্তার দিল্লি আসা যাওয়ার পথে সব সময় দু'একদিন এলাহাবাদে কাটিয়ে যাবে যাবেই। কেন ডাক্তারের বার বার মনে পড়ে সেই ক'টা কথা।... ...

—দেবকী, একটা কথা বলব?

—বলুন ডাক্তারদা।

—শেষ পর্যন্ত একজন চরিত্রহীন ডাক্তারের কাছে নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিলে?

দেবকী মাথা নেড়ে বলল, কে বলল আপনি চরিত্রহীন? যে ভালোবাসতে জানে সে কি চরিত্রহীন হয়? যে দেয়া-নেয়ার মধ্যে ভালোবাসা থাকে, তাতে কারুরই চরিত্র যায় না।

ডাক্তার মুগ্ধ হয়ে দেবকীকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

উনযৌবনা

তাপ্তী, সবরমতী, মাহী পেরিয়ে সাতপুরা, সহ্যাদ্রি, বিন্ধ্য ও আরাবল্লীর পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পিছনে ফেলে গুজরাত সেখানে আরব সাগরের কোলে প্রায় ঢলে পড়েছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় যাদের উল্লেখ সেই গিরনার পাহাড়, জুনাগড়, সোমনাথ, দ্বারকা ছড়িয়ে রয়েছে আশে পাশেই। একটু উত্তরে জামনগর ছাড়লেই কচ্ছের রন-এ লোনা জলের সাম্রাজ্য শুরু। মাটির নীচে সর্বত্রই অমূল্য খনিজ সম্পদ। আরব সাগর আর কচ্ছ-কাম্বে উপসাগরের কোলে কত ছোটো-বড়ো বন্দর। ছোটো-বড়ো শহরেরও অভাব নেই কিন্তু মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে সীমাহীন জনশূন্য প্রান্তর। টুকরো টুকরো জমিতে বজরা বা ভুট্টার চাষ। ছোটো রেলগাড়ি এরই মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে কিন্তু কোনো ব্যস্ততা নেই।

ছোট্ট স্টেশনে গাড়ি থামল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি। সংস্কৃত টোলবাড়ির পণ্ডিত মশাইদের ফতুয়ার ঘাঘরার মতো কুঁচি দেওয়া জামা পরা কিছু পুরুষ যাত্রী ওঠানামা করে কিছু সওদা মাথায় নিয়ে। রঙিন পোশাক পরা কিছু মেয়ে যাত্রীও চোখে পড়ে। হকাররা চিৎকার করে—ব্যয় আনা, ব্যয় আনা। অসংখ্য বৈচিত্র্যের দেশ ভারতবর্ষের এক অপরূপ ছবি দেখি সর্বত্র। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যাই। অতি সাধারণ গরিব মানুষ কিন্তু তাদের চোখে-মুখে হাহাকারের স্পর্শ নেই।

দু' এক মিনিট দাঁড়িয়ে আবার চলতে শুরু করে আমার ছোটো রেলগাড়ি। আবার স্টেশন আসে, আবার দাঁড়ায়। দু' এক মিনিট পরে গার্ডের বাঁশি বাজে ; অথবা তার আগেই ইঞ্জিনের বাঁশি। গাড়ি আবার চলতে শুরু করে।

হঠাৎ খেয়াল হয়, আমি বিভোর হয়ে মানুষ দেখছি, আমার কামরায়, স্টেশনে, প্ল্যাটফর্মে। আহা! কী চোখ! শুধু সুন্দর নয়, অপূর্ব! এর আগে আর কোথাও দেখিনি। না দেশে, না বিদেশে। ভূমধ্য সাগরের ধারে, নাইলের পাড়ে, গ্রীসের ধ্বংস-স্তূপের পাশে পৃথিবীর সব চাইতে সুন্দর মানুষদের দেখেছি। এখানকার সুন্দরীরা যুগ যুগ ধরে সারা পৃথিবীর পুরুষকে মুগ্ধ করেছে কিন্তু তাদের এমন চোখ নেই। বোধহয় এদেরই কাউকে দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।

টিকিটবাবু টিকিট চাইতেই সম্বিত ফিরে এল। শুধু আমার না, গাড়ির সবার টিকিট পরীক্ষা করলেন উনি। অবাক হলাম, সবারই টিকিট আছে। টিকিট পরীক্ষা শেষ করে টিকিটবাবু আমারই পাশে বসলেন। এমন বন্ধু এত কাছাকাছি আর পাইনি। তাই তাঁকেই বললাম, মাঝপথে ট্রেন বদলে আমাকে আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হবে কিন্তু এ গাড়ি তো পৌঁছবার দু'ঘণ্টা আগেই ও গাড়ি ছেড়ে দেবে।

টিকিটবাবু হেসে বললেন, এ গাড়ি এ রকমই চলে। আপনি বরং সামনের স্টপেজেই

নেমে পড়ুন। টিকিটবাবু আরো বললেন, দু' তিন টাকার লোকসান হলেও অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছবেন।

গাড়ি থামতেই নেমে পড়লাম। মাত্র দু' তিনজন যাত্রী ওঠানামা করতেই গাড়ি আবার ছেড়ে দিল। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম গাড়ি এগিয়ে চলেছে মাঠের মধ্যে। না দেখে পারলাম না। যে গাড়িতে বসে এত কিছু দেখেছি তাকে বিদায় না জানিয়ে দৃষ্টি ঘোরাতে পারলাম না।

এটা স্টেশন নয়, হল্ট। হিন্দি, ইংরেজি, গুজরাতিতে লেখা পরিচয়-লিপি থেকে চোখ ঘোরাতেই দেখি, মাস্টারবাবু অবাক হয়ে আমাকে দেখছেন। পরনে ধুতি কিন্তু তার উপর রেল কোম্পানির কোট। বয়স বেশি নয়, বোধহয় ত্রিশ-বত্রিশ। খুব বেশি হলে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। তার বেশি কখনই নয়। এমন কিছু সুপুরুষ না হলেও চেহারাটি মোটামুটি ভালোই।

প্ল্যাটফর্ম বলে কিছু না থাকলেও দু দিকের দুটি পরিচয়লিপির মাঝখানের লম্বা জমিটুকুর উপরই মাস্টারবাবু দাঁড়িয়ে। ওর পিছনেই ছোট্ট একটা ঘর। নিঃসন্দেহে ওটাই ওর অফিস ঘর। তাকিয়ে দেখি, ঐ অফিস ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একজন বৃদ্ধ ও একজন কিশোরীও মাস্টারবাবুর মতোই অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। মনে মনে হাসি। ভাবি, ওরা কী কোনোদিন আমার মতো মানুষ দেখেনি।

আমি মাস্টারবাবুর দিকে এগুতেই মেয়েটি দৌড়ে কোথায় চলে গেল।

তারপর মাস্টারবাবুর কাছে গিয়ে প্রথমে নমস্কার, পরে আমার সমস্যার কথা বললাম। উনি বাসের খবর না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, কোথায় থাকেন?

—দিল্লিতে।

শুনে উনি অবাক, দিল্লিতে থাকেন?

—হ্যাঁ।

—দিল্লিতে কোন্ ডিপার্টমেন্টে আছেন?

—আমি কোনো ডিপার্টমেন্টে নেই।

—আপনি চাকরি করেন না?

—হ্যাঁ, করি।

—তবে বলছেন, কোনো ডিপার্টমেন্টেই নেই।

—আমি সরকারি চাকরি করি না।

—তবে আবার দিল্লিতে কী চাকরি করেন?

—আমি খবরের কাগজে কাজ করি।

মাস্টারবাবু চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে বললেন, আপনি জার্নালিস্ট?

—হ্যাঁ।

আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করেই মাস্টারবাবু বললেন, আসুন, আসুন।

ওকে অনুসরণ করে ওর অফিস ঘরে আসি। ঘরে একটা চেয়ার, একটা টেবিল, একটা আলমারি, একটা বেঞ্চ। আমাকে চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন, বসুন।

আমি ওর অনেক অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করেও বেঞ্চিতে বসলাম। অনেক দ্বিধা-

সঙ্কোচের সঙ্গে উনি চেয়ারে বসেই হাঁক দিলেন, রতিলাল!

বৃদ্ধ রতিলাল আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই দরজার আড়ালে লুকিয়েছিল। মাস্টারবাবুর হাঁক শুনে এবার সে আত্মপ্রকাশ করতেই হুকুম হল, কৃষ্ণাকে তাড়াতাড়ি চা করতে বল।

কৃষ্ণা! মেয়েটির নাম শুনে একটু অবাক হলেও মুখে কিছু বললাম না।

এবার মাস্টারবাবু আবার আমাকে প্রশ্ন করেন, আপনি কী দিল্লিরই লোক? মানে আপনি কী পাঞ্জাবি?

—আমি বাঙালি।

এতক্ষণ হিন্দিতেই কথাবার্তা চলছিল। এবার উনি প্রায় পাগলের মতো চিৎকার করে বাংলায় বললেন, আপনি বাঙালি?

আমিও বাংলায় জবাব দিলাম, হ্যাঁ।

চিৎকার শুনে রতিলাল ছুটে আসে। ও কিছু বলার আগেই মাস্টারবাবু বলেন, রতিলাল, বহু বছর পর একজন বাঙালি পেয়েছি। তুমি আমার সাইকেল নিয়ে চটপট সৈয়দের কাছে গিয়ে একটু মাছ নিয়ে এসো। একটুও দেরি করো না।

আমি কিছু বলতে গেলাম কিন্তু ওরা কেউ আমার কথায় কান দিলেন না। রতিলাল মাস্টারবাবুর হুকুম শুনেই প্রায় উড়ে গেল। মাস্টারবাবুও সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পাঁচ-সাত মিনিট পরেই ফিরে এলেন। হাতে এক প্লেট ভর্তি মিষ্টি। ওর পিছনেই কৃষ্ণা। হাতে দু' কাপ চা। পরনে সুন্দর রঙিন শাড়ি। মাথায় ঘোমটা। হাতে চা নিয়েই ও মাথা নিচু করে বলল, নমস্কার বাবুজী।

আমি কৃষ্ণার মুখে বাংলা শুনে অবাক বিস্ময়ে বলি, তুমি বাঙালি?

কৃষ্ণা ডান হাত দিয়ে ঘোমটা একটু টেনে একটু হেসে মাথা নেড়ে বলে, না বাবুজী, আমাদের দেশ জেতপুরের ওদিকে। আমি বাংলা জানি। মাস্টারবাবু আমার গুরু আছে।

আমি হেসে বলি, তাই নাকি?

কৃষ্ণাও হাসে। বলে, হ্যাঁ।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলি, তোমার নামটিও খুব সুন্দর।

ও মুখ নিচু করে হাসতে হাসতেই বলে, সেটাও মাস্টারবাবুর কৃপা।

এবার আমি মাস্টারবাবুর দিকে তাকাই। দেখি উনিও হাসছেন। বললেন, হ্যাঁ, আমিই ওর নাম রেখেছি কৃষ্ণা। ভারি ভালো মেয়ে।

প্রশংসা শুনে কৃষ্ণা লজ্জায় প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে যায়। অনেক কষ্টে বলে, আমি ঘরে যাবে বাবুজী?

—হ্যাঁ যাও।

কৃষ্ণা চলে যায়।

আমি এবার বাসের খোঁজ করি। মাস্টারবাবু বললেন, একটা ব্রীজ ভেঙে গেছে বলে ক'দিন বাস চলছে না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—তাহলে কী করে যাব?

মাস্টারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ওদিকে যাওয়া কী খুবই দরকার?

—কিছুদিন আগেই কচ্ছের রণ্ নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ হয়ে গেল বলে এদিকে ঘুরতে বেরিয়েছি।

ভুজের দিকে গিয়েছেন কী?

—হ্যাঁ, ওদিক ঘুরে এসেছি।

—তাহলে এদিকে আর কী দেখবেন। সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারবাবু হেসে বলেন, ভাগ্যক্রমে যখন আপনাকে পেয়েছি তখন দু'চারদিন না রেখে ছাড়ছি না।

আমি চমকে উঠি, বলেন কী?

উনি আবার হেসে বলেন, আমি যেতে দিলেও রতিলাল বা কৃষ্ণা আপনাকে ছাড়বে না।

—কেন?

—ওরা মানুষ বড়ো ভালোবাসে।

এক মুহূর্ত থেমে ভেবে বলি, কিন্তু... ...

উনি মাথা নেড়ে বলেন, আমার আর রতিলালের কথা ছেড়েই দিলাম। আপনি কৃষ্ণাকে ছেড়ে যেতেই পারবেন না। কথাটা শুনেই খটকা লাগল। বললাম, কেন?

—ও এমন আদর-যত্ন করে যে ওকে ছেড়ে যাওয়া খুবই মুস্কিল।

ওর কথা শুনে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। বলি, তাই নাকি?

একটু সলজ্জ আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে মাস্টারবাবু মুখ নিচু করে বললেন, শুধু ওর জন্যই তো আমি এখানে ক'টা বছর পড়ে আছি। আরো কতকাল থাকব তা ভগবানই জানেন।

শুনেও আমার মজা লাগে। ভালোও লাগে। হাসি ঠাট্টা করে বলি, তাহলে তো এখানে থাকা একদম নিরাপদ নয়।

মাস্টারবাবু হো হো হেসে ওঠেন। পর মুহূর্তেই ম্লান হয়ে যায় মুখের হাসি। কেমন যেন বেদনার্ত সুরে বলেন, এ সংসারে আমার আপনজন নেই বললেই চলে। পেটের দায়ে এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে পড়ে আছি। কতকাল প্রাণভরে বাংলায় কথা বলি না। এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, যখন এসেই পড়েছেন, দু' একদিন থাকুন। সত্যি খুব খুশি হব।

কথাগুলো যেন এলোমেলো হয়ে বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে কিন্তু আমার মনে বড়ো দাগ কাটল। কথাগুলোর মধ্যে ওর আন্তরিকতায় এমন স্পর্শ অনুভব করলাম যে কিছুতেই ওর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। হেসে বললাম, আজ তো ট্রেনও নেই বাসও নেই ; সুতরাং আজ তো আছি। তারপর কালকের কথা কাল ভাবা যাবে।

আবার কৃষ্ণা দু' কাপ চা নিয়ে হাজির। ওকে দেখেই আমি হেসে বললাম, আদর-যত্ন করে তুমি কী আমাকেও এখানে বন্দী করে রাখবে?

কৃষ্ণা মুখ নিচু করে হাসতে হাসতে বলল, বাবুজী, আপনি মুসাফির। মুসাফির ঘরে এলে তাকে দেবতার মতো যত্ন করতে হয় কিন্তু আমরা তো গরিব আছে...

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না, কৃষ্ণা, ঠিক হল না। যে মানুষকে ভালোবাসতে পারে, সে তো কখনো গরিব হতে পারে না।

মাস্টারবাবু হেসে বললেন, বাঃ! ভারী সুন্দর কথা বললেন তো।

চা খেতে খেতে আমি কৃষ্ণাকে জিজ্ঞেস করি, দুপুরে কি খাওয়াবে?

—বাবুজি, এখানে সব্জী খুব কম পাওয়া যায়। ইঞ্জিনের ড্রাইভারবাবু মাঝে মাঝে সব্জী এনে দেয়। একটু সব্জী আপনাকে খাওয়াবে। মচ্ছির ঝোল হবে। আর ডাল-পাঁপর তো জরুর পাবেন।

—তুমি মাছ খাও?

অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে মুখ নিচু করে ও বলে, হ্যাঁ বাবুজী, আমি মচ্ছি খায়।

—মচ্ছি না, বল মাছ।

—হা, হা, মাছ। গলতি হয়ে যায়।

আমি হেসেই বলি, আর যেন গলতি না হয়।

কৃষ্ণা মুখখানা গম্ভীর কবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, গলতি হলে আপনি মাফ করবেন না বাবুজী?

আমি ওর সারল্য, নিষ্পাপ মুখ দেখে যেন মুগ্ধ হয়ে যাই।'এই পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরেও যেন এই স্নিগ্ধ পবিত্রতার মুখোমুখি হইনি কোনো মন্দিরে-মসজিদে বা গির্জায়। এ সারল্য, এ পবিত্রতা যেন শুধু কাশবনে, শুধু শবতের আকাশে, দোয়েল-কোকিলের মধ্যেই দেখা যায়। হঠাৎ মনে হল এই কিশোরীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলি, এই পৃথিবীতে এমন কোনো পাপিষ্ঠ নেই যে তোমাকে মাপ করবে না। পারলাম না। মনের ইচ্ছা মনেই রইল। হেসে বললাম, তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের তো গলতি হওয়া উচিত নয়।

ঠিক বলেছ বাবুজী। আমার আর গলতি হবে না। আমি আর মচ্ছি বলবে না।

--তবে কি বলবে?

কৃষ্ণা একটু জোরেই বলল, মাছ!

আমি আর মাস্টারবাবু হেসে উঠি।

হাসি থামতেই কৃষ্ণা মাস্টারবাবুকে বলে, বাবুজীকে ঘরে নিয়ে যাই? আর কত সময় দপ্তরে বসবেন?

আমি বললাম, না, না, আমি একলা যাব না। মাস্টারবাবুর কাজ শেষ হলেই.. ...

মাস্টারবাবু বললেন, আপনি স্নান করে নিন। আমি একটু কাজ সেরেই আসছি।

কৃষ্ণা আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে না। এক হাতে আমার সুটকেস তুলে নিয়েই অন্য হাতে আমার একটা হাত ধরে টান দিয়ে বলে, চলিয়ে, চলিয়ে।

মাস্টারবাবু আবার বললেন, আপনি যান। আমি আসছি।

কী আর করব? কৃষ্ণার পিছন পিছন মাস্টারবাবুর কোয়ার্টারে গেলাম।

কোয়ার্টার মানে একখানি ঘর, একটা বারান্দা, ঐ বারান্দার এক পাশেই রান্নাঘর। ছোট্ট একটু উঠান। তার কোনায় একটু ঘেরা জায়গা। ওর নাম বাথরুম। তবে কলও নেই, পায়খানাও নেই। কোয়ার্টার আর স্টেশনের মাঝখানে একটা টিউবওয়েল আছে। প্রাকৃতিক কাজকর্মের জন্য মুক্তাঙ্গন।

তা হোক। শুধু ঘরখানি নয়, সমস্ত বাড়িটাই অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে সাজান গোছান। ঘরের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি। বোধহয় কোনো ক্যালেন্ডার থেকে

কেটে বাঁধান। একটা চেয়ার-টেবিলও আছে ঘরটার এক কোনায়। খুব পুরনো দু' তিনটে শারদীয়া সংখ্যা অত্যন্ত সযত্নে রাখা আছে টেবিলের ওপর। এছাড়া দুটো-একটা ডায়েরি ও কাগজ-কলম। ঘরের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য হচ্ছে, টেবিলের উপর ছোটো এক টুকরো কাচের তলায় কৃষ্ণার একটা ছবি। মনে মনে হাসি। ভাবি, যে মাটিতে বজরা-ভুট্টার চাষ কবতে চাষীর প্রাণ বেরিয়ে যায়, সে মাটিতেই স্বচ্ছন্দে মানুষের মনে জন্ম নেয় সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

স্নান করার জন্য টিউবওয়েলের দিকে পা বাড়াতেই কৃষ্ণা বলল, বাথরুমেই জল আছে। বাথরুমে ঢুকে দেখি, চার বালতি জল, সাবান, ছোট্ট একটা তোয়ালে রাখা আছে। স্নান করে ঘরে আসতেই কৃষ্ণা আয়না-চিরুনি এগিয়ে দিল। তারপরই নিয়ে এল এক গেলাস সরবৎ। আমি প্রতিবাদ করি না। হাসি আর কৃষ্ণাকে দেখি।

—তোমার মা নেই কৃষ্ণা?

—না বাবুজী, আমার মা নেই। আমি যখন সাত সালের তখন আমার মা মারা যায়।

—তুমি এখানে আছ ক' বছর?

—আমি যখন সাত সালের তখন থেকেই আছি।

আমি আর প্রশ্ন করি না। চেয়ারে বসে সরবৎ খেতে খেতে কৃষ্ণার কথা শুনি। এখন যেখানে স্টেশন, আগে এখানেই ছিল লেভেল-ক্রশিং। সে লেভেল-ক্রশিং পাহারা দিত রতিলাল। দক্ষিণ দিকে মাইলখানেক দূরে বড়ো রাস্তা তৈরি হবার পর এই লেভেল-ক্রশিং-এর জায়গায় তৈরি হল স্টেশন। নতুন মাস্টারবাবু এলেন ভেরাবল থেকে কিন্তু পুরো দুমাসও থাকলেন না। আবার মাস্টারবাবু এলেন, গেলেন। কেউই এখানে থাকতে চায় না। থাকবে কেন? পড়ালেখা জানা শহরের মানুষ কি এখানে থাকতে পারে?

ক'টা বছর এইভাবেই কেটে গেল। তারপর একদিন সকালবেলার গাড়িতে এই বাঙালি মাস্টারবাবু এসে হাজির। মাস্টারবাবু না পারেন রাঁধতে, না পারেন গুজরাতি বলতে; মাস্টারবাবু কোনোদিন খাওয়া-দাওয়া করেন, কোনোদিন করেন না। চা আর ভাজাভুজি খেয়েই কাটিয়ে দেন। রতিলাল বজরার রুটি দিতে দ্বিধা করে। ভয়ও পায়। মাস্টারবাবু প্রায় সারা দিনরাতই স্টেশনে থাকেন। কোনো কোনোদিন রাত্রের মালগাড়ি চলে গেলে কোয়ার্টারে আসেন ; তবে রোজ নয়। অফিসের টেবিলেই ঘুমিয়ে পড়েন। স্টেশন পাহারা দেবার কাজ খালাসী রতিলালের। সে মেঝেয় শুয়ে থাকে। কিন্তু মাস্টারবাবুর সামনে ঘুমুতে দ্বিধা করে। সময় সময় ওরা বাপ-বেটিতে আলোচনা করে কিন্তু ভেবে পায় না কে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে। শেষ পর্যন্ত একদিন রতিলালের কিশোরী মেয়ে মাথার ঘোমটা আরো একটু সামনে টেনে এগিয়ে এল।

—বাবুজী!

—কে?

—আমি খালাসীর বেটি।

মাস্টারবাবু বিছানায় শুয়ে শুয়ে পুরনো শারদীয়া সংখ্যার পাতা ওলটাতে ওলটাতে মুখ না তুলেই বলেন, কী চাই?

—কিছু চাই না বাবুজী। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন। আমি আপনার খানা নিয়ে এসেছি।

—খানা? মাস্টারবাবু অবাক।

—হ্যাঁ বাবুজি, খানা। জলদি হাত-মুখ ধুয়ে নিন। খানা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মাস্টারবাবু বিছানায় উঠে বসে জিজ্ঞেস করেন, কে তোমাকে খানা আনতে বলল?

—আগে হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নিন, পরে সব জবাব দেব।

মাস্টারবাবু খেতে খেতেই রতিলালের বেটি বিছানা ঠিক করে টেবিলের ওপর এক গেলাস জল ঢেকে রাখে। মাস্টারবাবু ঘরে ঢুকতেই সে বলল, মালগাড়িকে আলো দেখাবার জন্য আপনাকে আর স্টেশনে যেতে হবে না। এখন শুয়ে পড়ুন। অনেক রাত হয়েছে।

—রতিলাল কোথায়?

—খেয়েদেয়ে স্টেশন চলে গেছে।

মাস্টারবাবু শুয়ে পড়েন। রতিলালের বেটি চলে যায় কিন্তু অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পরও মাস্টারবাবুর চোখে ঘুম আসে না, রতিলালের বেটির কথাই শুধু ভাবেন।

রাত আরো গভীর হয়। বিছানায় শুয়ে শুয়েই মাস্টারবাবু শুনতে পান মালগাড়ি আসছে। হঠাৎ দরজার বাইরে বারান্দার কোনায় একটা ছায়ামূর্তি দেখেই চিৎকার করে ওঠেন, কে?

রতিলালের বেটি বলে, আমি।

—তুমি? এত রাত্রে?

—আপনি ঘুমোননি মাস্টারবাবু?

—না।

মাস্টারবাবু বিছানা ছেড়ে দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এত রাত্রে কি করছ?

—সত্যি কথা বলব?

—হ্যাঁ, সত্যি কথা বল।

—রাগ করবেন না?

—না।

রতিলালের বেটি একটু ভেবে বলে, দেখছিলাম আপনি শুয়ে আছেন নাকি স্টেশনে গিয়েছেন।

এবার মাস্টারমশাই আর গম্ভীর থাকতে পারেন না। হেসে ওঠেন। আরো দু' এক পা এগিয়ে ওর সামনে দাঁড়ান। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করেন, তুমি ঘুমোয়নি কেন?

রতিলালের বেটি আবার বলে, সত্যি কথা বলব মাস্টারবাবু?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ সত্যি কথাই বল।

—শুয়ে শুয়ে আপনার কথা ভাবছিলাম।

—অ্যাঁ! আমার কথা?

হ্যাঁ, আপনার কথা। রোজ রাত্রে শুয়ে শুয়ে আপনার কথা ভাবি।

মাস্টারবাবু আবার প্রশ্ন করেন, আবার জবাব দেয় রতিলালের বেটি, আপনি খাওয়া-দাওয়া করেন না, সব সময় কি যেন ভাবেন, বিশেষ কথাবার্তাও বলেন না, তাই তো আপনার কথা ভাবি।

বিকেলবেলায় মাস্টারবাবুর সঙ্গে রেল লাইনের ওপর দিয়ে বজরার ক্ষেতের পাশের কালভার্টের উপর বসে কথা হচ্ছিল। তখন রতিলালের বেটির কতই বা বয়স। বড়ো জোর এগার-বারো। নিতান্তই কিশোরী! তার মনেও এত প্রশ্ন? আমাকে নিয়ে এত চিন্তা? রতিলাল স্টেশনে ডিউটি দেয়। আর সে একলা ঘরে শুয়ে শুয়ে শুধু আমার কথাই ভাবে?

মাস্টারবাবু যেন থমকে দাঁড়ান। দাঁড়াবেন না? ওর জীবনে যে অনেক দুঃখ, অনেক হতাশা। বাবা টিটাগড়ের কারখানায় কাজ করতেন আর ও দেশে থাকত মার কাছে। সেই ছেলেবেলার কথা কিন্তু তবু ওর মনে আছে, বাবা বিশেষ দেশে আসতেন না। কদাচিৎ কখনও এলেও বোতল থেকে ঢেলে কি যেন খেতেন। শুরু করতেন চেঁচামেচি—মারধব।

অবোধ শিশু আর একটু বড়ো হল। বুড়ি ঠাকুমার হাত ধরে গ্রামের স্কুলে যায়, আসে। রাত্তির বেলায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। স্কুলের এক মাস্টারমশায়ের সঙ্গে মাকে ফিস ফিস করে গল্প করতে দেখে চমকে ওঠে। ভয় পায়। ঘুম আসে না কিন্তু চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে চোখ খোলে। দেখে, মাস্টারমশাই আর মা খেলা করছে।

ক'বছর পর টিটাগড়ের কারখানা থেকে চিঠি এল, বাবা মারা গেছেন। তার কিছুদিন আগেই বুড়ি ঠাকুমা গত হয়েছেন। সাত-আট বছরের শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কাটোয়া লোক্যালে চেপে মা চলে আসেন কলকাতা। হাওড়া স্টেশনে অভ্যর্থনা জানালেন সেই মাস্টারমশাই।

উপেক্ষা আর অনাদরের মধ্যেও পিতৃহীন বালক বড়ো হয়। খুঁড়িয়েই পার হয় ক'টা বছর। সোমনাথ তখন চোদ্দ বছরের কিশোর। ছবিটা তখন অনেক বেশি স্পষ্ট। বুকের ব্যথা প্রায় অসহ্য। মনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। বাড়ি থেকে পালাল সোমনাথ।

মাস্টারবাবু একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, ক'টা বছর বড়ো কষ্টে কাটালাম। কত জনে কত বদনাম দিয়েছে। কেউ বলেছে চোর ; কেউ বলেছে পকেটমার। মারধরও খেয়েছি বহুবার।

আমার অজ্ঞাতসারেই আমার মুখ দিয়ে আওয়াজ বেবোয়, ইস!

—ঘুরতে ঘুরতে এলাম নাসিক। সৌভাগ্যক্রমে এক বৃদ্ধ মিঠাইওয়ালার কৃপা লাভ করলাম। ঐ বৃদ্ধের দোকানেই থাকি ; কাজকর্মও করি। ওবই দয়ায় আবার পড়াশুনা শুরু করলাম।

—তারপর?

স্কুলের গণ্ডী পার হতে না হতেই বৃদ্ধ মারা গেলেন। ওব ছেলে বোম্বেতে চাকরি করত। তাছাড়া মিষ্টির দোকানের কাজও জানত না। ব্যবসা তুলে দিল। আমিও ওরই সঙ্গে বোম্বে চলে এলাম।

—তারপর?

—এটা-ওটা করতে করতেই রেলের চাকরি পেয়ে গেলাম।

এখানে এলেন কেন?

মাস্টারবাবু একটু শুকনো হাসি হেসে বলেন, একদিন হঠাৎ কোন্নগর স্কুলের এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল চার্চ গেটের ধারে। কথায় কথায় তার কাছে মার অনেক কীর্তি

শুনলাম।

মাস্টারবাবু আর বলতে পারেন না। থামেন। আমি অবাক হয়ে ওকে দেখি।

একটু পরেই উনি আবার শুরু করলেন, বন্ধুর কাছে ঐসব শুনে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল! তাই মনে মনে ঠিক করলাম, এমন জায়গায় যাব যেখানে কোনো পরিচিতের মুখ কোনোদিন দেখব না। মাস্টারবাবু হঠাৎ একটু হেসে বললেন, অনেক খোঁজখবর, অনেক চেষ্টা করে এখানে এসেছি।

হঠাৎ নজর পড়ে, রেল লাইনের ধার দিয়ে কৃষ্ণা আসছে। মাস্টারবাবুকে বললাম, দেখুন দেখুন, কৃষ্ণা আসছে।

—নিশ্চয় চা নিয়ে আসছে।

—ও জানল কেমন করে, আমরা এখানে আছি?

—প্রায় রোজ বিকেলের দিকেই আমি এই কালভার্টের উপর বসে থাকি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, এ জায়গাটা আমার খুব প্রিয়। অনেকদিন রাত্রেও আমি এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকি।

—কৃষ্ণা এখানে এসেও চা দিয়ে যায়?

—হ্যাঁ।

মাস্টারবাবুর সংসারে ফ্লাস্ক নেই কিন্তু কেটলি আছে। কৃষ্ণা সেই কেটলির চারপাশে জড়িয়েছে ছোট একটা তোয়ালে। সে মাস্টারবাবুকে আর আমাকে গরম চা খাওয়াবেই। আমি দেখে হাসি। মনে মনে খুশি হই, মুগ্ধ হই ওর আন্তরিকতা আর ভালোবাসা দেখে।

কৃষ্ণা চা খায় না। আমরা দুজনে চা খাই। দুটো-একটা কথাবার্তার পরই ও মাস্টারবাবুকে বলে, মাস্টারবাবু, আজ আমি পড়বো না।

--কেন? মাস্টারবাবু প্রশ্ন করেন।

কৃষ্ণা তার কালো হরিণ-চোখ ঘুরিয়ে বলে, আজ আমি পড়বো কেন? আজ তো বাবুজির সঙ্গে কথা বলবো।

মাস্টারবাবু হেসে বলেন, বাবুজির সঙ্গে তো আমি গল্প করব। তুমি কেন পড়বে না?

কৃষ্ণা মাথা নেড়ে বেণী দুলিয়ে বলে, না, না, আজ আমি জরুর বাবুজির সঙ্গে গল্প করবে।

আমি না হেসে পারি না। আমি ওর মাথা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলি, না, না, আজ তোমাকে পড়তে হবে না। আজ আমি আর তুমি গল্প করব।

—আর মাস্টারবাবু?

—মাস্টারবাবু আজ সারা রাত স্টেশনে ডিউটি দেবে।

আমার কথা শুনে ও হাসিতে ফেটে পড়ে। মাস্টারবাবুও হাসেন।

কৃষ্ণা কেট্‌লি থেকে আবার চা ঢেলে দেয়। আমরা চা খাই। গল্প করি। হাসি। তিনজনে একসঙ্গে ফিরে আসি। কৃষ্ণা কোয়ার্টারে যায়। আমরা দুজনে স্টেশনে বসি। ঘোরাঘুরি করি। কত কথা শুনি, কত কথা বলি। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে ভারতবর্ষের পশ্চিম দিগন্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। রতিলাল অফিস ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে কোয়ার্টারে যায়। ফিরে আসে খাওয়া-দাওয়ার পর। আমরা তখনও গল্প করি।

রতিলাল তাগিদ দেয় কিন্তু আমরা উঠতে পারি না। গল্পের নেশায় এমনই মশগুল যে উঠব উঠব করেও উঠতে পারি না। শেষে ছুটে আসে কৃষ্ণা। আমরা আর দেরি করি না।

খাওয়ার আগে, খাওয়ার পর আবার গল্প। তিনজনেই যেন গল্পের নেশায় মাতাল হয়ে গেছি। কোয়ার্টারের বাইরে চাটাই বিছিয়ে গল্প করতে করতে ভুলে যাই শুক্লা তৃতীয়ার রাতের মেয়াদ আর বেশি নেই। হঠাৎ মাস্টারবাবু উঠে কোয়ার্টারে যান। বোধহয় বাথরুমে। কৃষ্ণা হাত দিয়ে আমার মুখখানা ওর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করে, আচ্ছা বাবুজি, আমার মাস্টারবাবু খুব ভালো না?

উনযৌবনার কথা শুনে মুগ্ধ হই। বলি, হ্যাঁ, তোমার মাস্টারবাবু খুব ভালো লোক।

ওদের সান্নিধ্যে দুটো দিন কাটিয়ে দিলাম।

পরের দিন সকালের ট্রেনেই চলে যাব। শেষ রাত্তিরের দিকে শুতে এলাম। হঠাৎ মাস্টারবাবু প্রশ্ন করলেন, আমি কি ভুল করলাম?

—না, না, ভুল করবেন কেন? ঠিকই করেছেন। একটু থেমে বললাম, ভগবান দু-হাত দিয়ে যাকে এগিয়ে দিয়েছেন তাকে বুক পেতে গ্রহণ করার মধ্যে কোনো অন্যায়, কোনো ভুল নেই।

পরের দিন সকালে সকলের চোখেই জল। গাড়ি এসে থামল এই অখ্যাত অপরিচিত হল্ট-এ।

কৃষ্ণা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলল, বাবুজি, এর পরেব বার এসে তুমি আমাকে বাঙালিদের দেশে নিয়ে যাবে। আমি আরো ভালো বাংলা শিখবে, আরো ভালো খানা বানাবে।

বিদায়বেলা বিচ্ছেদ বেদনাব মধ্যেও আমি হাসি। বলি, তোমার মাস্টারবাবু নিশ্চয়ই তোমাকে বাঙালিদের দেশে নিয়ে যাবে। ওটা তো তোমারও দেশ।

রতিলাল গামছা দিয়ে চোখের জল মুছে বলল, হ্যাঁ বাবুজী, ও আপনাদেরই মেয়ে আছে।

গাড়ি ছেড়ে দিল। আমি লাফিয়ে ট্রেনে উঠলাম।

স্টপওভার : করাচি

ভারতীয় সাংবাদিকদের তখন পাকিস্তান যাবার ভিসা দেওয়া হত না। তাই চাণক্যপুরীর পাকিস্তান হাই-কমিশনের দরজায় কোনো আবেদনপত্র নিয়ে হাজির হইনি কিন্তু সব সময়ই পাকিস্তান যাবার একটা অদম্য ইচ্ছা মনের মধ্যে জমা ছিল। মনে হত অমৃতসর থেকে মাত্র আধ ঘণ্টার পথ যে লাহোর তাকেও কী দেখতে পাব না? করাচিকে পাশে রেখে মধ্যপ্রাচ্যের কত দেশ ঘুরে চলে যাচ্ছি ইউরোপ। দেশে ফেরার পথেও করাচির সঙ্গে লুকোচুরি খেলছি। তখনও সে বোরখা পরে নিজেকে ঢেকে রেখেছে।

সেবার কমনওয়েলথ প্রাইম মিনিস্টার্স কনফারেন্স কভার করতে লন্ডন গেছি। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বোধহয় ইচ্ছা করেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে ক্লারিজেস-এ রেখেছেন। তাই আমাকেও বার বার যেতে হয় ব্রুক স্ট্রিটের এই বিখ্যাত হোটেলে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নানা কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য আমাদের হাই-কমিশনের বেশ কয়েকজন কর্মী ও অফিসারকে দিনরাত ওখানে থাকতে হয়। পাকিস্তান প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করার জন্য পাকিস্তান হাই-কমিশনের অনেকে ওখানে। ভাগ্যক্রমে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস-এর কয়েকজন বাঙালি অফিসারের সঙ্গে ক্লারিজেস-এ আমার বেশ আলাপ হল। প্রথমে নেহাতই সৌজন্যমূলক কথাবার্তা ; হয়তো সামান্য হাসিঠাট্টা। তারপর একটু ঘনিষ্ঠতা। সপ্তাহের শেষে প্রাইম মিনিস্টার্স কনফারেন্স শেষ হতে না হতেই ওঁরা আমার বন্ধুস্থানীয় হয়ে গেলেন। আয়ুব খান লণ্ডন ত্যাগ করার পরের দিনই নটিংহিল-এ হক সায়েবের বাড়িতে আমার নৈশভোজন।

ঐ নৈশভোজনে পাকিস্তান হাই-কমিশনের চার-পাঁচজন কূটনীতিবিদ সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও বি বি সি-র দুচারজন বাঙালিও সস্ত্রীক আমন্ত্রিত ছিলেন। এক রাউণ্ড শেরি-শ্যাম্পেন-কনিয়াক-ভডকার পর শুরু হল গান। সবার আগে মাহমুদা বেগম গাইলেন অতুলপ্রসাদের 'মিছে তুই ভাবিস মন। তাই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন!' তারপর আরো কতজনের কত গান। ঐ গান-বাজনার মাঝে মাঝেই হাসিঠাট্টা-গল্পগুজব। হঠাৎ কি প্রসঙ্গে যেন করাচির কথা উঠতেই আমি বললাম, দিল্লি ফেরার পথে কটা দিন করাচিতে কাটাতে পারি না?

আমিন সায়েব বললেন, আপনাকে ভিসা দেওয়া যাবে না কিন্তু ভিসা ছাড়াও তো আটচল্লিশ ঘণ্টা আপনি থাকতে পারেন।

—তা তো জানি কিন্তু... ...

হকসায়েব বললেন, ওসব কিন্তু-টিন্তু ছাড়ুন ; আপনি যান। আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব।

আমি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলাম, কোনো বিপদে পড়ব না তো?

ওরাও সোজাসুজি উত্তর দিলেন, না, বিপদে কিছু পড়বেন না, তবে টিকটিকি লেগে থাকবে।

আমি হেসে বললাম, পাকিস্তানে গেলে যে টিকটিকি পিছনে লেগে থাকবে, তা তে খুবই স্বাভাবিক।

পরের দিনই আমি রিটার্ন জার্নির প্ল্যান ঠিক করে ফেললাম। লন্ডন, প্যারিস, ফ্রাঙ্কফার্ট মিউনিক, ভিয়েনা, রোম, বেইরুট, কায়রো, করাচি, দিল্লি। হকসায়েবকে জানিয়েছিলাম, চার তারিখে লন্ডন ছাড়ছি ; একুশে ভোর চারটে ত্রিশে বি ও এ সি ফ্লাইট ফাইভ জিরো ওয়ান-এ করাচি পৌঁছব। থাকব কে-এল-এম হোটেলে। হকসায়েব বললেন, সব ঠিক হোগা কোই চিন্তা নেই করনা।

আমি লন্ডন ছাড়ার আগে হকসায়েবকে আমার রোম আর কায়রোর হোটেলের নাম ঠিকানাও জানিয়ে দিলাম।

ঘুরে-ফিরে এলাম রোম কিন্তু না, হকসায়েব কোনো কিছু খবর দিলেন না। কায়রোতেও তিনদিন কাটালাম। না, ওখানেও কোনো চিঠিপত্র পেলাম না। উনি প্রতিশ্রুতি না দিলেও বলেছিলেন, দরকার হলে যোগাযোগ করবেন। আমি আশা করেছিলাম, রোম বা কায়রোতে ওর কাছ থেকে একটা চিঠি বা টেলিগ্রাম পাব। তাই বেশ দুশ্চিন্তা নিয়েই কুড়ি তারিখ রাত্রে কায়রো থেকে করাচি রওনা হলাম।

প্লেন ঠিক সময়ই করাচি পৌঁছল। অবিভক্ত ভারতের বৃহত্তম এয়ারপোর্ট আমাকে মুগ্ধ করল না, বরং সূর্যোদয়ের প্রাক্কালেও এর বাতাসে প্রাণহীন রুক্ষতার স্পর্শে চমকে উঠলাম। করাচি এয়ারপোর্টে নামলেই বোঝা যায়, বেলুচিস্তানের মরুপ্রান্তর দূরে নয়।

এলাম টার্মিন্যাল বিল্ডিং। ইমিগ্রেশন কাউন্টারের পুলিশ কর্মচারী আমার পাশপোর্ট একটু বেশি যত্ন নিয়ে দেখে একবার ভালো করে আমার মুখখানা দেখলেন, এ্যারাইভালো করাচি ইন্টারন্যাশনাল। ঐ স্ট্যাম্পের উপরেই সই করে তারিখ দিলেন।

একটু পরে কাস্টমস্। একজন অফিসার আমার সুটকেসের উপরেই কমনওয়েলথ প্রাইম মিনিস্টার্স কনফারেন্সের ফোলিও ব্যাগটি দেখে প্রশ্ন করলেন, আর ইউ এ ডিপ্লোম্যাট?

—না, আমি সাংবাদিক।

—পাশপোর্ট দেখান।

ওঁকে পাশপোর্ট দেবার পর উনি আমার পরিচয়পত্রের পাতাটি ভালো করে দেখে নিয়েই একবার আমাকে দেখলেন। তারপর হঠাৎ বাঘের মতো হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, এনি ক্যামেরা? ওয়াচ? ইলেকট্রনিক...

—না, ওসব কিছুই নেই।

অসভ্যর মতো চিৎকার করে 'জিজ্ঞাসা করলেন, সোনার গহনা? ফরেন কারেন্সি?

—না, তাও নেই ; তবে ট্র্যাভেলার্স চেক আছে।

আবার সেই অসভ্য চিৎকার, তবে কী আছে আপনার সুটকেশে?

—জামা-কাপড় আর কাগজপত্র।

যে ভদ্রলোক এতক্ষণ অসভ্যর মতো চিৎকার করছিলেন, তিনিই হঠাৎ অত্যন্ত চাপা গলায় আমার দিকে না তাকিয়েই বাংলায় প্রশ্ন করলেন, আপনি হকসায়েবের বন্ধু?

সতর্কভাবে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বললাম, হ্যাঁ।

উনিও অত্যন্ত সতর্কভাবে একবার চারপাশে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে প্রায় আপনমনে বললেন, কে এল এম-এর হোটেলেই থাকবেন তো?

মুখে না, মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

—চলে যান। কোনো চিন্তা নেই।

মনে মনে হকসায়েবকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না।

এরপর পাশপোর্ট জমা রেখে রসিদ নিয়ে বি ও এ সি-র গাড়িতে চলে এলাম কে এল এম-এর ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে। তখন ছ'টা বাজে। রাত্রে বিশেষ ঘুম হয়নি। তাই জামা-কাপড় বদলে একটু শুয়ে পড়লাম।

দরজায় নক্ করার আওয়াজ হতেই ঘুম ভাঙল। ঘড়িতে দেখলাম, প্রায় সাড়ে ৯টা বাজে। দরজা খুলতেই এক বৃদ্ধ রুম বেয়ারা আমার ঘরেব ভিতর ঢুকেই ডান হাত কপালের কাছে তুলে বলল, আদাব।

সেলাম আলেকুম না বলে আদাব বলতেই বুঝলাম উনি বাঙালি। একটু হেসে বললাম, আপনি বাঙালি?

—হ্যাঁ কর্তা, আমি বাঙালি। প্যাটের দায়ে এই বিদেশে পইড়্যা আছি।

—করাচি বিদেশ হবে কেন?

বৃদ্ধ রুম বেয়ারা একটু ম্লান হেসে বললেন, যে দেশের ভাষা, খাবার দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আবহাওয়া আলাদা সে বিদেশ ছাড়া আবার কী?

বৃদ্ধের কথা শুনে আমি বিস্মিত হই না ; বরং খুশি হই।

আমি কিছু বলার আগেই উনি বললেন, আপনার ঘরে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক না। আমি সরষের তেল এনে দিচ্ছি, ভালোভাবে স্নান করুন। এ শালাদের এক গাদা মশলা দেওয়া খাবার-দাবার খাওয়ার দরকার নেই। আমি মাছের ঝোল ভাত এনে দেব। তাই খেয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

বুঝলাম, পরিকল্পনা মতোই কাজ এগুচ্ছে। বৃদ্ধের কথা উপেক্ষা করলাম না, সরষের তেল মেখেই স্নান করলাম। বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গেই মাছের ঝোল ভাত খেলাম।

—তারপর?

ঐ বৃদ্ধের নির্দেশমতো প্রিডি স্ট্রিটের কটেজ ইন্ডাস্ট্রীজ সেলস অ্যান্ড ডিসপ্লে সেন্টারের সামনে গিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। দশ-পনের মিনিট এদিক ওদিক ঘোরাঘুরির পর ডানদিকে কিছুদূর যেতেই বৃদ্ধের দেওয়া নম্বরের অষ্টিন দেখতে পেলাম। গাড়িতে কেউ ছিলেন না কিন্তু দরজা খোলা ছিল। আমি গাড়িতে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক ভদ্রলোক হাসতে হাসতে গাড়িতে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, আমি সিরাজুল ইসলাম। গাড়ি খুঁজতে কোনো অসুবিধে হয়নি তো?

—না।

উনি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট করলেন। একটু ফাঁকা রাস্তায় পৌঁছেই উনি বললেন, আপনি খুব ভালো দিনে এসেছেন।

—কেন?

—আজ আমাদের চিত্রাঙ্গদার ফাইন্যাল রিহার্সাল।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। একসঙ্গে অনেক বাঙালির সঙ্গে আপনার আলাপ হবে।

—তাহলে তো সত্যিই ভালো দিনে এসেছি।

গাড়িতে যেতে যেতেই অনেক গল্প হল। সিরাজুল ইসলাম জন্মেছেন কলকাতায় পড়াশুনা কলকাতারই রিপন কলেজে ; তবে এম এ পড়েছেন ঢাকায়। চাকরি করে পাকিস্তান রেডিও-র বাংলা বিভাগে। আমার কথাও উনি শুনলেন।

দু' পাঁচ মিনিট পর সিরাজুল ইসলাম লুকিয়ে একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, কলকাতার কথা মনে পড়লে আর কিছু ভালো লাগে না।

আমি বললাম, যেখানে জন্মেছেন, যেখানে লেখাপড়া শিখেছেন, সেখানকার স্মৃতি কখনই ভোলা যায় না।

সিরাজুল হঠাৎ ডানদিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নতুন রাস্তায় পড়েই বলেন, কাজকর্মে ঝামেলায় দিনগুলো কেটে যায় ঠিকই কিন্তু কদাচিৎ কখনও কলকাতার লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে শুধু কলকাতার কথাই মনে হয়। উনি আপন মনে একটু ম্লান হেসে বললেন কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি, আমি করাচিতে এসে রেডিও পাকিস্তানের সেবা করব।

—কেন? পূর্ব পাকিস্তানের লোক হয়ে করাচিতে এসে চাকরি করা কী স্বাভাবিক ব্যাপার নয়?

সিরাজুল আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, আমাদের দেশ বসিরহাট ; পূর্ব পাকিস্তান না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—তাহলে কী দাঙ্গার পরই বসিরহাট ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান?

উনি আবার একটু হাসেন। বলেন, দাঙ্গা হয়েছিল কলকাতায়, ঢাকায়, নোয়াখালিতে বসিরহাটে না।

—তাহলে বসিরহাট ছাড়লেন কেন?

উনি একটা আঙুল দিয়ে কপাল দেখিয়ে বললেন, সবই কিসমতের খেল। ঢাকায় ব্যবসা করতে গিয়ে বাবা মারা গেলেন ; আর সেই ব্যবসা সামলাতে আমি গেলাম ঢাকায়। ব্যস এমন জড়িয়ে পড়লাম যে আর ফিরতে পারলাম না।

রহমান সায়েবের বাড়িতে ঢুকেই আমি স্তম্ভিত। চিত্রাঙ্গদা নাচছে আর গান হচ্ছে—আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি। আমি ঘরে পা দিতেই মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার নাচ থেমে গেল, গান বন্ধ হল। চিত্রাঙ্গদা মুহূর্তের জন্য একটু হেসে আমার দিকে তাকালেন। আমাকে অভ্যর্থনা করলেন ঘরের সবাই। আমি হাসতে হাসতে বললাম, আপনারা এমন করে অভ্যর্থনা করছেন যেন ঘরে অর্জুন ঢুকলেন।

আমার কথায় ঘরের মেয়ে-পুরুষ সবাই হাসেন। চিত্রাঙ্গদা বললেন, কোনো দ্বিধা সঙ্কোচ না করে প্রায় অর্জুনের মতোই তো এলেন।

আমি হাসতে হাসতে বলি, তাহলে কী বলব—কাহারে হেরিলাম! আহা!

সে কি সত্য, সে কি মায়া।

ঘর ভর্তি; সবাই হাসিতে লুটিয়ে পড়লেন। হাসি থামতেই সিরাজুল ইসলাম একটি মেয়েকে বললেন, লায়লা, তুই সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দে। লায়লা আমাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর আমাকে পাশে নিয়েই বসলেন। তারপর একটু চাপা গলায় বললেন, আমি লায়লা ইসলাম, সিরাজুল ইসলামের বোন।

এ ঘরের অর্ধেকের বেশিই তো রেডিও টি-ভি-তে আছেন। আপনিও কী রেডিও বা টি-ভি-তে আছেন?

—না, না, আমি পড়াশুনা করছি।

—কী পড়ছেন? এম এ।

লায়লা একটু হেসে জবাব দিলেন, বছর দুই আগে এম এ পাশ করেছি।

—তাহলে রিসার্চ করছেন?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।

ঐ সামান্য বিরতির মধ্যেই চা আর চিড়ের পোলাও এলো। মিসেস রহমান নিজে আমাকে চা দিলেন। লায়লা এগিয়ে দিলো এক প্লেট চিড়ের পোলাও। একটু হাসিঠাট্টা গল্প-গুজবের পর আবার রিহার্সাল শুরু হল।

নাচ-গানের মধ্যে যেন নিমেষেই সময়টা কেটে গেল। রিহার্সাল শেষ হবার পর আবার চা-কফি আর হিংয়ের কচুরি। নানাজনের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ গল্প-গুজব। এবার আস্তে আস্তে সবাই বিদায় নিতে শুরু করলেন। হঠাৎ হুদাসায়েব আমার কাছে এসে বললেন, হাজার হোক আপনি ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট। পুলিশ নিশ্চয়ই একটু খেয়াল রাখছে কিন্তু যদি কোথাও কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে ফোন করবেন।

আমি মিঃ হুদার টেলিফোন নম্বরের কাগজটা হাতে নিয়ে বললাম, কোনো অঘটন ঘটার সম্ভাবনা আছে নাকি?

উনি হেসে বললেন, না, না, কিচ্ছু ঘটবে না। আমি ঘন্টাখানেক আগেই টেলিফোন করেছি।

সিরাজুল ইসলাম পাশেই ছিলেন। উনি আমাকে বললেন, হুদা সায়েব আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর। তার চাইতে বড়ো কথা উনি কলকাতায় থাকার সময় পঙ্কজ মল্লিকের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন।

আমি হুদা সায়েবকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। তারপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি সিরাজুল আর লায়লার সঙ্গে ওঁদের বাড়ি রওনা হলাম।

বাড়ি ফেরার পথে সিরাজুল আমাকে প্রায় সারা শহরটা ঘুরিয়ে দেখাবার পর বললেন, আপনার মতো লোকের কাছে এ শহরে দেখার কিছু নেই; তবে কাল যদি আপনাকে ক্লিফটন্ বীচ্ দেখাতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগবে।

—হ্যাঁ, ক্লিফটন বীচের কথা অনেকের কাছেই শুনেছি।

—কাল যদি ছুটি নিতে পারি তাহলে আমিই নিয়ে যাব; নয়তো লায়লা আপনাকে ঘুরিয়ে আনবে।

আমি বললাম, কাজকর্মের ক্ষতি করে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার দরকার নেই।

লায়লা বললেন, আপনাকে একটু ঘুরিয়ে আনলে আমাদের কারুরই কোনো কাজের ক্ষতি হবে না। দাদা ছুটি না পেলে আমিই আপনাকে ঘুরিয়ে আনব।

ঘুরে-ফিরে সিরাজুলের বাড়িতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ওদের মা দরজা খুলে দিয়েই বললেন, একটু আগেই রহমান সায়েবের কুঠী থেকে ফোন এসেছিল। তার আগে তোর অফিস থেকে দুবার ফোন এসেছে।

সিরাজুল প্রথমেই ওঁর অফিসে ফোন করলেন। সহকর্মী নরুল হাসানের খুব জ্বর। সুতরাং একটু পরেই ওঁকে রেডিওতে ছুটতে হবে।

এরপর রহমান সাহেবের বাড়িতে ফোন করে জানালেন, আমার আপত্তি না থাকলে আগামীকাল দুপুরে আমাকে ওরা খাওয়াতে চান। মিসেস রহমান আমার সঙ্গেও কথা বললেন, আজ তো আপনার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলতে পারলুম না। তাই কাল দুপুরে আসুন। সবাই মিলে একটু গল্প করা যাবে।

আমি সানন্দে স্বীকৃতি জানালাম।

সিরাজুল একটু পরেই রেডিও স্টেশনে চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন, আপনি আম্মা আর লায়লার সঙ্গে গল্প করুন। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসছি।

সিরাজুলের মার সঙ্গেও অনেক গল্প হল। উনি কাটোয়ার মেয়ে। ম্যাট্রিক পাশ করেছেন কলকাতার শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল থেকে। ভিক্টোরিয়াতে আই-এ ক্লাস-এ ভর্তি হবার পরই বিয়ে হয়। উনি বললেন, আমাদের সব আত্মীয়স্বজনই পশ্চিমবাংলায়। শুধু বড়ো মেয়ে আর জামাই ছাড়া ঢাকায় আমাদের আর কোনো আত্মীয় নেই। আত্মীয়স্বজন ছেড়ে এত দূর দেশে পড়ে থাকতে একটুও ভালো লাগে না। সব শেষে উনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কোথা দিয়ে যে কি ঘটে গেল, তা ভাবতেও অবাক লাগে।

আমি চুপ করে ওঁর কথা শুনি। লায়লা স্নান করতে গেছেন। ঘরে শুধু আমরা দুজন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হঠাৎ উনি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বাবা, শনিবারের চিঠি এখনো বেরোয়?

—না।

—তাই নাকি? অত সুন্দর কাগজটা বন্ধ হয়ে গেল?

—হ্যাঁ।

—ভারতবর্ষ-প্রবাসী তো চলছে?

—না, ওগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে।

—কী আশ্চর্য! তাহলে লোকে পড়ে কী?

—এখন নতুন নতুন অনেক কাগজ বেরিয়েছে।

—কিন্তু বাবা, সেগুলোতো ভারতবর্ষ-প্রবাসী হতে পারে না।

—না, তা কী সম্ভব?

বৃদ্ধা আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সব কিছুই এমনভাবে বদলে যাচ্ছে যে আমাদের সব কিছুই বেসুরো মনে হয়।

লায়লা স্নান করে আসতেই উনি বললেন, তোরা গল্প কর। আমি শুতে যাই। পায়ে বড়ো ব্যথা করছে।

লায়লা আমাকে বললেন, আম্মা বাতের ব্যথায় বড়ো কষ্ট পাচ্ছেন। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেন না।

আমি বললাম, আমি তো অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি। আপনি এবারে বিশ্রাম করুন।

বৃদ্ধা চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে লায়লাকে বললেন, একে দেখেশুনে খেতে দিস।

লায়লা হাসতে হাসতে বললেন, কেন, তোমাব কলকাতার লোক বলে?

—তাই তো!

ওঁর মা ভিতরে চলে যেতেই লায়লা জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের রিহার্সাল কেমন লাগল?

—খুব ভালো।

—কী ভালো লাগল?

—নাচ-গান, আপনাকে, আপনার দাদাকে, রহমান সাযেবকে..

—আমি আপনার সামনে বসে আছি বলে আমাকে খুশি করার কোনো দরকার নেই।

—ঠিক তো?

—অবশ্যই।

—তাহলে বলি, আপনি ছাড়া আর সবাইকে ভালো লেগেছে।

—আর আমাকে?

—একটুও ভালো লাগেনি?

—কেন?

—আপনার রূপ নেই, গুণ নেই, আপনাকে ভালো লাগবে কেন?

—ঠিক বলেছেন।

দু'জনেই হাসি।

এবার আমি প্রশ্ন করি, আচ্ছা মেয়েরা কি সব সময়ই নিজেদের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে?

—মেয়েদের দোষ দিচ্ছেন কেন? প্রশংসা শুনতে আপনারা ভালোবাসেন না?

—অন্যের কথা বলতে পারি না। তবে আমার প্রশংসা করলে নিশ্চয়ই আমার ভালো লাগবে কিন্তু দুঃখের কথা, কেউ আমার প্রশংসা করে না।

—কেউ না?

—একজন করে তবে সাক্ষাতে না।

—তিনি কে?

—এক কথায় জবাব দিতে পারব না।

—ঠিক আছে, সবিস্তারেই বলুন।

—তার কথা শুরু করলে আরো দু-চারদিন আমাকে করাচি থাকতে হবে।

—তাই থাকুন। কে আপনাকে চলে যেতে বলছে?

—দু-চারদিন থাকার পব যদি যেতে ইচ্ছে না করে?

—ইচ্ছে না করে থেকে যাবেন।

—যদি সিরাজসায়েব আপত্তি করেন?

—সে দায়িত্ব আমার।

—আপনি আমার দায়িত্ব নেবেন কেন?

—আমার ইচ্ছা।

আমি আর কথা বলি না। লায়লার দিকে তাকিয়ে একটু হাসি। লায়লাও হাসেন। দু-জনেই দু-জনকে দেখি আর হাসি।

তারপর লায়লা বললেন, আপনি ভারি মজার লোক।

—কেন?

—বেশ কথা বলেন।

—তাই নাকি?

—আপনি আমাদের রিহার্সালের ওখানে ঢুকতেই বুঝলাম, আপনি বেশ ইন্টারেস্টিং লোক।

আমি হাসি।

হঠাৎ লায়লা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু [illegible] চা করে আনি।

—কোনো দরকার নেই।

—কেন? চা খেতে ইচ্ছে করছে না?

—ইচ্ছে তো করছে কিন্তু আপনি চলে গেলে একলা একলা ঝগড়া করব কেমন করে?

লায়লা হাসতে হাসতে বললেন, আমার সঙ্গে কিচেনে চলুন।

—না থাক ; তাহলে আপনার সঙ্গে আরো অনেক জায়গায় যেতে ইচ্ছে করবে।

লায়লা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা চা খেতে খেতেই সিরাজুল সায়েব ফিরে এলেন। অনেক গল্প হল : তবে শুধুই কলকাতার কথা। ভিক্টোরিয়া, চৌরঙ্গী, কলেজ স্কোয়ার, কফি হাউস, বসন্ত কেবিন। পুরনো বইয়ের দোকান, গানের জলসা ময়দানের ফুটবল—আরো কত কি! সব কিছুর মধ্যেই কেমন একটা আবেগ, মমত্ববোধ। কী যেন হারাবার বেদনা!

কথা বলতে বলতে সিরাজুল সায়েব হঠাৎ চুপ করেন। কী যেন আপনমনে ভাবেন। নাকি মনে মনে কিছু আবৃত্তি করছেন?

আচ্ছা অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে কলকাতাতেই আছেন তো? সুভাষ মুখোপাধ্যায় খুব জনপ্রিয়, তাই না?

আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ লায়লা বললেন, দাদাও খুব ভালো কবি।

—তাই নাকি?

সিরাজুল একটু হাসেন। লায়লা বলেন, দাদার তিনটে কবিতার বইও বেরিয়েছে।

আমি সিরাজুল সায়েবকে বলি, আপনি তো আচ্ছা লোক! এসব খবর আগে বলেন নি?

উনি সলজ্জভাবে বললেন, পাঁচজনকে জানানোর মতো কবিতা আমি লিখতে পারি না। তবে মাঝে মাঝে যখন মানসিক যন্ত্রণাটা অসহ্য হয়, তখন কবিতা না লিখে পারি না।

কথায় কথায় অনেক রাত হয়েছিল। তাই খেয়েদেয়েই হোটেলে ফিরে এলাম।

হোটেলে পৌঁছে দেবার সময় সিরাজুল সায়েব জানালেন, উনি ছুটি পাননি। রহমান সায়েবের বাড়িতে খেতে যেতে পারবেন কি-না তারও ঠিক নেই ; তবে খুব চেষ্টা করবেন। আর জানালেন, লায়লা ১২টা নাগাদ আমার হোটেলে এসে আমাকে রহমান সায়েবের বাড়ি নিয়ে যাবেন। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর লায়লাই আমাকে ক্লিফটন বীচ্ ঘুরিয়ে আনবেন। মনে মনে খুশি হলেও ভদ্রতার খাতিরে আপত্তি জানালাম কিন্তু সিরাজ সায়েব বললেন, না, না, আপনার দ্বিধা করার কোনো কারণ নেই। ওর একটুও কষ্ট হবে না ; বরং খুশি হবে।

মনে মনে ঠিক করেছিলাম, ১০টা পর্যন্ত ঘুমব কিন্তু সাড়ে ৯টা বাজতে বাজতেই দরজায় খট্ খট্ আওয়াজ। রাত্রে তিনটে নাগাদ এয়ারপোর্ট যেতে হবে ; সুতরাং রাত্রে ঘুম হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই একটু বিরক্ত হয়েই বিছানা ছেড়ে উঠলাম। দরজা খুলে আমি হতবাক।

লায়লা!

আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি! এখন?

লায়লা দরজার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিট মিট করে হাসতে হাসতে বললেন, আগে বলুন, আপনার ঘরে ঢোকার অনুমতি পাব কি-না।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

ঘরে ঢুকে আমার বিছানার দিকে একবার তাকিয়েই লায়লা প্রশ্ন করলেন, শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন?

আমি হেসে বলি, আপনাকে।

—তাহলে আপনার ঘরে আমার বসার অধিকার আছে, তাই না?

—একশ'বার।

—আমি টেলিফোন করে রুম সার্ভিসকে চা পাঠাতে বলেই ওঁকে প্রশ্ন করি, হঠাৎ এখন আপনার আবির্ভাব?

—অকারণেই।

—সিরাজ সায়েব কী বাড়িতে?

—ওকে আমি অফিসে নামিয়ে দিয়েই এখানে এসেছি।

—উনি এত সকালেই অফিসে গেলেন?

—হ্যাঁ ; আজ ওর অনেকগুলো রেকর্ডিং আছে।

সেই বৃদ্ধ রুম বেয়ারা চা নিয়ে এলো। টুকটাক কথা বলে ও চলে গেল। লায়লা আমাকে চা করতে দিলেন না। বললেন, থাক। আমার সামনে আর আপনাকে চা করতে হবে না।

চা খেতে খেতে আমি আবার জানতে চাই, সত্যি বলুন তো আপনি এখন এলেন কেন? কোনো প্রোগ্রাম চেঞ্জ হয়েছে?

—না, কোনো প্রোগ্রাম চেঞ্জ হয়নি।

—তাহলে এখন এলেন কেন?

—ইচ্ছে হলো, তাই চলে এলাম।

—সত্যি?

—আমি মিথ্যে কথা বলি না।

—না, না, তা বলছি না। তবে ভাবছিলাম হয়তো... ...

—কাল আপনার সঙ্গে কথা বলতে বেশ লাগছিল। তাই মনে হল, যাই আপনাকে একটু বিরক্ত করে আসি।

—খুব ভালো করেছেন।

—সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ, সত্যি বলছি! করাচিতে আসার আগে মনে মনে অনেক ভয় ছিল কিন্তু কাল এত আনন্দে কাটিয়েছি যে আপনাদের কথা কোনোদিন ভুলতে পারব না।

—আমাদেরও খুব ভালো লেগেছে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত আমি আর দাদা আপনার কথা আলোচনা করেছি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—আমি সত্যি ভাগ্যবান।

—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লায়লা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, আপনি বেশ চট করে সবাইকে আপন করে নিতে পারেন।

—আমি তো বুঝতে পারিনি, কাকে আপন করে নিলাম।

—আচ্ছা ওসব কথা থাক। আপনি কিন্তু রহমান সায়েবের বাড়িতে জমে যাবেন না।

আমি হেসে বলি, সেটা কী আমার হাতে?

—হ্যাঁ, আপনার হাতে।

আমি হাসি চেপে বললাম, ঠিক আছে। ওরা কেউ থাকতে বললে বলব, আপনি বেশিক্ষণ থাকতে বারণ করেছেন।

—কোনো আপত্তি নেই।

না, রহমান সায়েবের বাড়িতে সত্যি বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। ওঁদের আন্তরিকতার জন্য বারবার ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, বেশ কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হবে বলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখন আড্ডা ছেড়ে উঠছি।

লায়লা আয়েসার সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমি ওঁকে বললাম উঠুন আর গল্প করলে আমাদের সব জায়গা যাওয়া হবে না।

লায়লা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তো আপনার ড্রাইভার। হুকুম করলেই উঠব।

রহমান সায়েবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডানদিকে ঘুরেই লায়লা হাসতে হাসতে বললেন ওয়েল ডান।

—কৃতিত্ব অভিনেতার নয়, পরিচালিকার।

লায়লা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, আপনার সঙ্গে দিনের পর দিন কাটালেও কেউ ক্লান্ত হবে না।

গাড়ি চলছে সোজা পশ্চিমে। আরব সাগরের ঝড়ো হাওয়া উইন্ড স্ক্রীনের উপর আছড়ে পড়ে গাড়ির ভিতরে আশ্রয় নিচ্ছে। লায়লার চুল উড়ছে, শাড়ির আঁচল উড়ছে। আমি

দেখছি। না দেখে পারছি না। হঠাৎ দেখি, আরব সাগর আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাতলামি করছে। লায়লা অষ্টিনের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েই বললেন, এই আমাদের ক্লিফটন বীচ্।

—শহরের এত কাছে?

—হ্যাঁ, শহর থেকে মাত্র তিন মাইল।

দু-এক পা এগিয়ে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই বললাম, সত্যি অপূর্ব।

—আপনি আরো দু-একদিন থাকলে মনোরা আইল্যান্ড ঘুরিয়ে আনতাম। ওটাও খুব সুন্দর জায়গা।

—পরের বার যাওয়া যাবে।

—আপনি কী আবার করাচি আসবেন?

—আশা তো করি।

আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগুতে এগুতে লায়লা বললেন, এলে খুশি হবো কিন্তু আশা করি না।

—কেন?

—এ সংসারে বেশি আশা করলেই বেশি দুঃখ পেতে হয়।

—তা ঠিক কিন্তু আমি না এলে আপনি দুঃখ পাবেন কেন?

—দুঃখ না পেলেও আশাভঙ্গ তো হবে।

ক্লিফটন বীচের আলোছায়ায় ঘোরাঘুরি করতে করতে আমরা কত কথা বলি। এলোমেলো। কখনও হাসি, কখনও গম্ভীর হয়ে ভাবি। আবার আনমনাও হই মাঝে মাঝে। তারপর অস্তগামী সূর্যের মুখোমুখি হয়ে সমুদ্রের ধারে বসি। কখনও নীরব, কখনও সরব। আবার কখনও দু-জনে দু-জনের দিকে তাকিয়ে থাকি অপলক দৃষ্টিতে ; দুজনের চোখেই কত অনুক্ত প্রশ্ন।

ফেরার পথে গাড়িতে কেউই বিশেষ কথা বলি না। বলতে পারি না ; বলতে মন চায় না। আনমনা হয়ে কত কী ভাবি। বোধহয় লায়লাও ভাবেন। ফিরে আসি করাচি শহরে। রেডিও স্টেশন থেকে সিরাজুল সাহেবকে তুলে নিয়ে সোজা ওঁদের বাড়ি। আম্মার সঙ্গে আবার সেই কলকাতার গল্প। সিরাজুল সায়েব আমায় তাঁর কবিতার বই "সাধনা, আমার সাধনা" উপহার দেন। আমার আটচল্লিশ ঘণ্টা করাচি বাসের মেয়াদ যত কমে আসছে, ঘড়ির কাঁটা তত বেশি জোরে দৌড়চ্ছে। হোটেলে জিনিসপত্র গোছগাছ করার ছিল। তাই দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর আর বসলাম না। ওঁরা দু-ভাই-বোনেই আমাকে হোটেলে ছাড়তে এলেন। রাত তখন এগারোটা।

আমি আর সিরাজুল সায়েব ঘরে ঢুকলেও লায়লা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ভিতরে আসতে বললাম কিন্তু উনি এলেন না।

ঘরে ঢুকেই সিরাজুল সায়েব বললেন, দাদা আমার একটা উপকার করবেন?

—নিশ্চয়ই করব।

—আপনি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে কলকাতা যান?

—হ্যাঁ যাই।

—আমার দু-খানা বই আর একটা ফাউন্টেনপেন একজনকে পৌঁছে দেবেন?

আমি হেসে বললাম, সানন্দে।

উনি ব্যাগ থেকে দু-কপি "সাধনা, আমার সাধনা" আর একটা নতুন লেডিজ পার্কার কলম বের করে আমার হাতে দেবার পর এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলেন। বললেন, এই কাগজে ঠিকানা লেখা আছে।

ঠিকানা পড়তে গিয়েই চমকে উঠলাম। শ্রীমতী সাধনা রায়!

আমি ওঁর দিকে তাকাতেই উনি একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ দাদা, এই সাধনাই আমার সাধনা।

আমি বিমুগ্ধ হয়ে ওঁকে একবার ভালো করে দেখেই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম।

আমার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েই উনি বললেন, দাদা, কফি খাওয়াবেন না?

—নিশ্চয়ই।

—আপনি কফির অর্ডার দিন। আমি গাড়িটা পার্কিং-এ রেখে আসি।

সিরাজসায়েব বেরিয়ে যেতেই আমি কফির অর্ডার দিলাম। আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখতেই লায়লা ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলেন।

—দাদা কোথায় গেল?

—গাড়িটা পার্কিং এ রাখতে গেলেন।

লায়লা দু-এক পা এগিয়ে একেবারে আমার সামনে মুখ নিচু করে দাঁড়ালেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বললেন?

লায়লা একটা ছোট্ট প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে বললেন, কাফ লিংকটা ব্যবহার করলে খুশি হব। যদি কাফ লিংক দেখে আমার কথা মনে পড়ে তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে ওঁর উপহার গ্রহণ করে বললাম, নিশ্চয়ই করব।

এবার লায়লা কোনো কথা না বলে একটা খোলা খাম আমার হাতে দিলেন। দেখি, ভিতরে রয়েছে ওঁর সুন্দর ছোট্ট একটা ছবি। ঠিক পার্সে রাখার মতো। আমি কিছুতেই বলতে পারলাম না, লায়লা, আমার পার্সে একটাই ছবি রাখা যায়। সেখানে যার স্থান আছে সেই আমার চিরদিনের, চিরকালের।

বন্যেরা বনে সুন্দর...

তখনও পুরো জ্ঞান ফেরেনি, দুটো চোখই বন্ধ করে আছে। একটু আচ্ছন্নের ভাব কিন্তু তবু ব্যথায় কাতরাচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। চোখে দেখা যায় না। জয়-এর দাদা বৌদি আর ছোড়দির চোখে জল এসে যায়। ডাঃ সেন সকালে বলেছেন, ক্রাইসিস ইজ ওভার কিন্তু তবু ওদের ভয়ের শেষ নেই। একটা অজানা আশঙ্কায় সবারই বুক কাঁপে কিন্তু মুখে কেউই তা প্রকাশ করেন না।

শীলা নিজেকে একটু সামলে নিয়ে স্বামীকে বলে, এ কষ্ট চোখে দেখা যায় না। তুমি একবার সিস্টারকে বলো না।

—হ্যাঁ যাচ্ছি।

অজয় এক মুহূর্ত দেরি না করে সাত নম্বর কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়।

উনি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই শীলা বলে, আমি যে জয়কে কতদিন বলেছি অত স্পীডে মোটর সাইকেল না চালাতে, তার ঠিক ঠিকানা নেই কিন্তু.

ছোড়দি বললেন, আমিও ওকে হাজারবার বারণ করেছি কিন্তু সব সময় ওর এক কথা, ছোড়দি, এটা সাইকেল না, মোটর সাইকেল। আস্তে চালালে এর জাত যাবে।

—হ্যাঁ, সব সময় ওর মুখে এক কথা। শীলা একটু থেমে একটু হেসে বলে, আমাকে নিয়ে বেরুলে তো বেশি জোরে চালাতে পারতো না। তাই সব সময় আমাকে বলতো, তুমি এবার থেকে জীন্স পরে আমার মোটর সাইকেলে উঠবে, নয়তো জোরে চালানো যায় না।

অজয় পর্দা সরিয়ে কেবিনে ঢুকতেই শীলা আর ছোড়দি প্রায় এক সঙ্গেই জিজ্ঞেস করে, সিস্টার আসছে?

অজয় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়, মহারাণী বললেন, ব্যথা তো করবেই।

—ব্যস! ছোড়দি অবাক হয়ে বলে, তাই বলে ওদের কিছু করণীয় নেই?

—তুমি ভাবতে পারবে না ছোড়দি, এই সিস্টার কী বিচ্ছিরিভাবে কথাবার্তা বলে।

অজয় একটু থেমে একবার ভালো করে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, এই রকম একটা সিরিয়াস অ্যাকসিডেন্ট কেসের পেসেন্টের জ্ঞান ফেরার সময় সে ব্যথায় ছটফট করবে, তা সবাই জানে কিন্তু ওষুধ ইন্‌জেকশন তো আছে।

মেজদি বলে, সে তো একশবার।

—তাছাড়া কথা বলারও একটা ধরন আছে তো! এই ভদ্রমহিলা এমন বিচ্ছিরিভাবে কথাবার্তা বলেন যে...

স্বামীকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই শীলা বলে, অথচ সকালে যে সিস্টার ডিউটিতে ছিলেন, তার ব্যবহার কথাবার্তা কী সুন্দর।

অজয় বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ মেয়েটির ব্যবহার কত ভালো। আজ তিনদিন ধরে তো দেখছি..

জয়-এর কত জায়গায় যে কেটেকুটে গেছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই কিন্তু সব চাইতে বেশি চোট লেগেছে ডান হাতে আর ডান পায়ে। ডান পায়ের নীচের দিকে দু' জায়গায় ফ্রাকচার হয়েছে। ডান হাতের কনুইয়ের একটু উপরই হাড় ভেঙেছে। তাছাড়া ডানদিকে উরুর ওখানটা দারুণভাবে কেটে গেছে। শুধু ওখানেই চোদ্দটা স্টিচ হয়েছে। ভাগ্যক্রমে মাথায় বা বুকে তেমন কিছু চোট লাগেনি। তবে দুচারটে করে স্টিচ শরীরের অনেক জায়গাতেই করতে হয়েছে। জয়-এর প্রায় সারা শরীরটাই ব্যান্ডেজ আর প্লাস্টার দিয়ে ঢাকা। হঠাৎ দেখলে চমকে উঠতে হয়। ওকে যখন অপারেশন থিয়েটার থেকে বের করে আনে, তখন তো ওকে দেখে সবার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ডাঃ সেন অবশ্য বলেছিলেন, আই থিঙ্ক হি উইল বী অল রাইট তবে টাইম লাগবে কিন্তু তবু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউই নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। মনে মনে সবাই আশঙ্কা করেছিলেন এমন সিরিয়াস অ্যাকসিডেন্টের পর পেসেন্টের অবস্থা কখন কী হয় কিছু বলা যায় না। আজ সকালে ডাঃ সেনের কথা শুনে সবাই অনেকটা আশ্বস্ত হলেও কেউই ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। অজয় তো ওর বাবাকে শুধু বলেছে, পায়ে একটা ফ্রাকচার হয়েছে আর দু একটা জায়গায় সামান্য কেটেকুটে গেছে। উনি হাসপাতালে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওকে বলা হয়েছে, শুধু শুধু আপনি কেন কষ্ট করবেন? জয় তো ভালোই আছে। ভাগ্য ভালো ওদের মা এখন দিল্লিতে বড় মেয়ের কাছে বেড়াতে গিয়েছেন। উনি এখানে থাকলে কী যে হতো তা ভাবা যায় না।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হবার ঘণ্টা বেশ কিছুক্ষণ আগেই বেজেছে কিন্তু ওরা তিনজনে এখনও জয়-এর কাছে রয়েছে। বেচারা ব্যথায় এত কাতরাচ্ছে যে ওরা ওকে ছেড়ে যেতে পারছেন না। হঠাৎ সিস্টার ইনজেকশন দেবার জন্য কেবিনে ঢুকে ওদের দেখেই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, এ কি! আপনারা এখনও রয়েছেন? ডাক্তাররা রাউন্ডে এসে আপনাদের দেখলে আমাদেরই বকুনি খেতে হবে।

অজয় বলে, আমরা যাচ্ছি।

—হ্যাঁ যান। সিস্টার আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে জয়-এর হাতে সিরিঞ্জের নিড্‌লটা ঢুকিয়ে দেয়। ছোড়দি কেবিন থেকে বেরিয়েই শীলাকে বলে, কী নির্মমভাবে ছুঁচটা ঢোকাল দেখলে?

—এর কথা আর বলো না। একে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

পরের দিন সকালে গিয়ে শীলা সেই ভালো নার্সটির সঙ্গে দেখা হতেই বলল, বিকেলের দিকে যে সিস্টারটি ডিউটিতে থাকেন, তাকে দেখলেই আমাদের ভয় করে।

—কেন? উনি হেসে জিজ্ঞেস করেন।

—ভাই, ওর বড্ড মেজাজ।

উনি আবার হেসেই জবাব দেন ও একটু কড়া আছে ঠিকই কিন্তু ও সত্যি খুব ভালো নার্স।

—তা হতে পারেন কিন্তু ওর কথাবার্তা শুনলে পেসেন্টদের আত্মীয়স্বজনদের খুব খারাপ লাগে।

—দেখছেন তো আমাদের কত পরিশ্রম করতে হয়। সব সময় মেজাজ ঠিক রাখাও যায় না। সিস্টার জয়-এর টেম্পারেচার দেখতে দেখতে বলেন, যাই হোক, কিছু মনে করবেন না। তাছাড়া আপনার দেওর তো আস্তে আস্তে ভালোই হচ্ছেন।

—শীলা একটু হেসে বলে, ভাই, আপনি একটু দেখবেন। আমরা কিন্তু আপনাকেই বিরক্ত করব।

—না, না, বিরক্ত হবার কী আছে? যতটা পারবো নিশ্চয়ই করবো। সিস্টার একটু থেমে শীলার দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি যদি একটু বাইরে যেতেন তাহলে এখনই আমি ড্রেস করে দিতাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। শীলা একটু হেসে বলে, তাছাড়া টাইমও তো হয়ে গেছে।

প্লাস্টার আর ব্যান্ডেজে জয়-এর প্রায় সারা শরীরটা ঢেকে গেছে। কোনো জামা কাপড় পরাবার উপায় নেই। গলা পর্যন্ত একটা চাদর দিয়ে ঢাকা আছে। সিস্টাররা চাদর একটু সরিয়ে স্টিচের জায়গাগুলো ড্রেস করেন। সময়ও লাগে প্রায় ঘণ্টা খানেক। জয়-এর জ্ঞান ফিরলেও এখনও বেশ আচ্ছন্নে ভাব। কানের কাছে মুখ নিয়ে বার কয়েক ডাকাডাকি করলে চোখ বুজেই জবাব দেয়। কদাচিৎ কখনও দু' একটা কথা বলে। তার বেশি কিছু নয়। সিস্টাররা কখন ওকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে বা ড্রেস করছে, তা ও জানতেও পারে না।

এই ভাবেই আরো ক'টা দিন কেটে গেল। জয়-এর পুরোপুরি জ্ঞান ফিরেছে। ডাক্তার সিস্টার বা বাড়ির লোকজনের সঙ্গে বেশ কথাবার্তাও বলে। ডাক্তার সিস্টারদের সঙ্গে বাড়ির লোকজনদেরও বেশ হৃদ্যতা হয়েছে। ডাঃ সেন তো কালকে অজয় আর শীলার সামনেই জয়কে বললেন, প্রথম তিন চারদিন তো আপনার দাদা-বৌদি আমার কথার উপরও আস্থা রাখতে পারেননি। এখন আপনিই ওদের বলে দিন কেমন আছেন।

—আমরা তো লে-ম্যান, তাই...। অজয় আমতা আমতা করে বলে।

এখন 'ভালো' নার্স কেবিনে ঢুকলেই শীলা বলে, ভাই বাসন্তী, আমাদের হিরো বাড়ি ফিরলে তোমাকে কিন্তু আমাদের বাড়িতে আসতে হবে।

বাসন্তী হেসে বলে, আমরা হাসপাতালের মানুষ হাসপাতালেই থাকি। কোনো পেসেন্টের বাড়ি যাইনি।

—না, না, বাসন্তী, ওসব কোনো ওজর আপত্তি আমরা শুনব না।

ছোড়দি বলে, না গেলে আমি পাকড়াও করে নিয়ে যাবো।

জয়কে ওষুধ দিয়ে বাসন্তী হাসতে হাসতে কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হবার ঘণ্টাখানেক পর বাসন্তী আবার সাত নম্বর কেবিনে আসে জয়কে ইন্‌জেকশন দেবার জন্য। ওকে দেখেই জয় জিজ্ঞাসা করে, শতখানেক ইন্‌জেকশন তো নিলাম। আর কত ইন্‌জেকশন দেবেন?

বাসন্তী একটু হেসে বলে, আপনি যত স্পিডে মোটর সাইকেল চালাচ্ছিলেন, তার চাইতে কম ইন্‌জেকশনই দেওয়া হয়েছে।

জয় একটু হেসে বলে, দেখছি, মোটর সাইকেলটার উপর আপনারও যথেষ্ট রাগ।

—হবে না? কী সুন্দর অবস্থায় এসেছিলেন, তা তো জানেন না। বাসন্তী ইন্‌জেকশনটা দিয়ে বলে, আর জীবনে মোটর সাইকেল চড়বেন না।

—চড়ব না?

—নেভার।

—কেন?

—কেন জানি না। চড়তে বারণ করলাম, চড়বেন না। বাসন্তী কথাটা শেষ করেই কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়।

জয় শুয়ে শুয়ে কত কী ভাবে। হাসপাতালে কত অ্যাকসিডেন্ট কেসই তো আসে কিন্তু কোনো পেসেন্টকে কোনো নার্স কী এই ধরনের পরামর্শ দেয়? না, কখনও তো শুনিনি। পেসেন্টদের পরামর্শ দেওয়া তো নার্সদের কাজ না। তবে কী...

একটু পরেই বাসন্তী আবার ওর কেবিনে আসে। জিজ্ঞেস করে, আপনার কাছে অনেক বই আর ম্যাগাজিন আছে। কাল আমার অফ ডে। একটা বই দেবেন?

—কাল অফ ডে?

—হ্যাঁ ; পরশু থেকে নাইট ডিউটি।

—কাল মর্নিং এ কার ডিউটি?

—নমিতার।

—বিকেলে? জয় সঙ্গে সঙ্গে বলে, গীতাদির?

—হ্যাঁ।

কয়েকটা মুহূর্ত কেউই কোনো কথা বলে না। তারপর জয় জিজ্ঞেস করে, আজ রাত্তির ন'টা-সাড়ে ন'টায় যাবেন আর পরশু দিন সেই রাত্তিরে আসবেন?

—হ্যাঁ ; কেন? বাসন্তী একটু হেসে জিজ্ঞেস করে।

আপনমনে কী একটু ভেবে জয় প্রশ্ন করে, কাল সারাদিনের মধ্যে একবারও আসবেন না?

—ডিউটি না থাকলে আসবো কেন?

পরের দিন অফ ডিউটি থাকলেও বাসন্তীকে আসতে দেখেই গীতাদি জিজ্ঞেস করেন, কিরে তুই এখন?

—সাত নম্বর কেবিনে এই বইটা ফেরত দিতে এলাম।

—ও! গীতাদি আর কোনো কথা না বলে দু'নম্বর কেবিনে যান।

বাসন্তীকে কেবিনে ঢুকতে দেখেই জয় এক গাল হাসি হেসে বলে, দেখছি আমার সত্যিই উইল পাওয়ার আছে।

—তার মানে?

—তার মানে আর শুনতে হবে না।

বাসন্তী একটু চাপা হাসি হেসে বলে, আজ নিশ্চয়ই অনেকে দেখতে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, আজ রবিবার বলে অন্তত পঁচিশ-তিরিশ জন আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসে হাজির।

ঐ চাপা হাসি হাসতে হাসতেই বাসন্তী বলে, তবু উইল পাওয়ার পরীক্ষার দরকার হল?

জয় ওর দিকে মৃদু দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধু মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

—আমি পাঁচ বছর এই হাসপাতালে চাকরি করছি। আজই প্রথম অফ ডিউটিতে ওয়ার্ডে ঢুকলাম।

জয় খুশির হাসি হেসে বলল, যাক, রোগটা তাহলে শুধু আমার না।

* * *

জয় ডিসচার্জ হবার পর রোজই বাসন্তী ভাবে, ওদের বাড়িতে যাওয়া কী ঠিক হবে? হাজার হোক এরা সবাই বেশ উচ্চ শিক্ষিত এবং বেশ পয়সাওয়ালা। আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে তো কাউকেই সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মনে হয়নি। আর আমি? আমি সরকারি হাসপাতালের একজন সাধারণ নার্স। মাইনে পাবার পরের অফ ডে'তেই আমাকে হাওড়া থেকে কাটোয়া লোক্যালে চেপে জিরাট যেতে হয় মা-র হাতে টাকা পৌঁছে দেবার জন্য।

বাসন্তী মনে মনে আরো কত কী ভাবে। নিজের মনেই নিজেকে বোঝায়, আমি তো নিজে চাইনি। ওরা সবাই তো হাজার বার আমাকে যেতে বলেছে। না গেলে নাকি ওরা...

শেষ পর্যন্ত পরের অফ ডে'তে বাসন্তী জয়দের বাড়িতে না গিয়ে পারল না। একটা চাকর এসে দরজা খুলে ড্রইংরুমে বসতে দিয়ে বলল, আপনি বসুন। আমি উপরে খবর দিচ্ছি।

পাঁচ-সাত মিনিট পর শীলার গলা ভেসে আসে, ছোড়দি, হাসপাতালের সেই নার্স নাকি সত্যি সত্যিই এসে হাজির হয়েছে।

—তুই যা ; আমি এখন যেতে পারবো না।

ছোড়দির জবাবটা স্পষ্ট শুনতে পায় বাসন্তী। পিঠে যেন পর পর দুটো চাবুকের আঘাত পড়ল। না, বাসন্তী আর এক মুহূর্ত দেরি না করে নিঃশব্দে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়। রাসবিহারী এভিন্যুর ট্রাম স্টপেজের কাছাকাছি হঠাৎ জয়ের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে তিন-চারজন বন্ধুবান্ধব। জয় ওকে দেখেই অবাক হয়ে বলে, আরে, আপনি এ পাড়ায়!

—হ্যাঁ, এক বন্ধুর বাড়ি এসেছিলাম।

—ভালো আছেন তো?

—হ্যাঁ : আপনি?

জয় এক গাল হাসি হেসে বলল, হ্যাঁ, পারফেক্টলি অল রাইট।

হঠাৎ একটা মিনিবাস আসতেই বাসন্তী তাতে উঠে পড়ে।

* *

সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের ঐ অন্ধ গলিটার শেষ বাড়ির দরজায় খট্ খট্ করে কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে একজন মহিলা প্রায় চিৎকার করে বললেন, যাই।

এক নিনিট পর বৃদ্ধা দরজা খুলতেই বাসন্তী তাঁকে প্রণাম করে।

বৃদ্ধা দু'হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে এক গাল খুশির হাসি হেসে বললেন, এতদিন পর আমাকে মনে পড়ল?

বাড়ির উঠানে পা-দিয়েই বাসন্তী বলে, কী করব মাসীমা? সারা সপ্তাহ ডিউটি করার পর অফ ডে'তে আর বিশেষ বেরুতে ইচ্ছে করে না।

—জানি মা ; তোমাদের বড্ড খাটুনি। খোকার কাছে তো সব শুনি।

—মেশোমশাই আর সন্তোষদা বাড়ি আছেন তো?

—না মা ; তোমার মেসোমশাই গতকাল বড মেয়ের বাড়ি গিয়েছেন। আজ রাত্তিরেই ফিরে আসবেন। আব খোকাকে একটু দোকানে পাঠিয়েছি। এখুনি এসে যাবে।

সত্যি মিনিট খানেকের মধ্যেই সন্তোষ ফিরে আসে ' রান্নাঘরের দোর গোড়ায় মোড়ার উপর বাসন্তীকে বসে থাকতে দেখেই চিৎকার করে, মা, মোড়ার উপরে কী ভূত বসে আছে?

বাসন্তী একটু হেসে বলে, না, পেত্নী।

একটু কাছে এসে সন্তোষ বলে, হাসপাতালের প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টের এক সামান্য কর্মচারীর বাড়িতে তুমি আসতে পারলে?

—আমি কী মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট?

সন্তোষের মা কড়ায় তরকারি চাপাতে চাপাতেই বলেন, ও এই বাড়িতে আসবে না মানে? এইটাই তো ওর আসল বাড়ি। বৃদ্ধা আপনমনেই একটু হেসে বলেন, সামনের অঘ্রানেই ওকে আমি এ বাড়িতে পাকাপাকিভাবে নিয়ে আসছি।

লজ্জায় বাসন্তীর মুখ লাল হয়ে ওঠে। ও একটু সামলে নিয়েই সন্তোষকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা সঞ্জীব চ্যাটার্জীর কোন বইতে যেন আছে "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে?"

—পালামৌ।

অপারেশন

এক

ছোট ছোট মেঘের টুকরোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চাঁদ আবার লুকিয়ে পড়ল। রত্না একটু আড়াল দিয়ে চোখের জল মুছে নিল। আমার সান্ত্বনা জানাবার কোনো ভাষা ছিল না। তাছাড়া গলা দিয়ে যেন কথাও বেরুতে চাইল না। ইচ্ছা করছিল রত্নার চোখের জল মুছিয়ে দিই, তাকে অনেক কিছু বলে একটু সান্ত্বনা জানাই! কিছুই পারলাম না। দুজনেই চুপচাপ বসে রইলাম।

কতক্ষণ যে দুজনে এমনি করে নিশ্চল দুটি প্রাণহীন পাথরের মতো বসেছিলাম, তা মনে নেই। মনে আছে, রত্নার মা রত্নাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওদের হাউস বোটে।

আমার হাউস বোটের ছাদ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে শিকারায় চড়বার সময় শাড়ির আঁচলটা একটু টেনে ভালো করে গায়ে জড়াতে জড়াতে রত্না শুধু বলেছিল, 'চলি দাদা, কাল সকালে আবার আসব।'

আমি তারও কোনো জবাব দিতে পারিনি। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম বলেও মনে হয় না।...

অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন নিয়ে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর গিয়েছিলাম। বহুদিন পরে, বহু চেষ্টা করে ক'দিনের জন্য মুক্তি পেয়েছিলাম সাংবাদিক জীবনের নিত্যকর্ম পদ্ধতি থেকে। ভেবেছিলাম, ডাল হ্রদের জলে হাউস বোটে ভাসতে ভাসতে একটু তাজা করে নেব নিজের দেহ আর মনকে। বায়ুগ্রস্ত আমেরিকান টুরিস্টদের মতো উল্কার বেগে ঘুরে বেড়াবার কোনো পরিকল্পনা আমার ছিল না। গুলমার্গ-পহলগাও দেখারও কোনো আগ্রহ ছিল না! অন্যান্য বাঙালি টুরিস্টদের মতো বক্স-ক্যামেরা হাতে নিয়ে শালিমার গার্ডেন দেখতেও আমি চাইনি। তাইতো তারিক-এর 'নিউ মডার্ন প্যারিস' হাউস বোটে এসেই বলেছিলাম, দুটো টাকা বেশি নিও কিন্তু নতুন খদ্দের এনে আর ভিড় বাড়িও না। আর একটা বিষয়ে তারিককে সতর্ক করেছিলাম, খবরদার! খবরের কাগজ আনবে না, আমি চাইলেও আনবে না। তাই তো তিন দিন ধরে 'নিউ মডার্ন প্যারিসে' কাটাবার পর এক কাপ কফি খেতে গিয়েছিলাম নেহরু পার্কের রেস্টুরেন্টে।

তিন দিন পর কিছু মানুষ দেখে বোধহয় একটু ভালোই লেগেছিল। পরের দিন বিকালেও গেলাম। সেদিনও বেশ লাগল। তারপর থেকে বিকালের দিকে এক কাপ কফি খাবার অছিলায় কিছু নতুন মানুষ দেখার লোভে রোজই যেতাম নেহরু পার্কের রেস্টুরেন্টে।

সেদিনও একই উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলাম। কফি খাওয়াও হয়ে গিয়েছিল, অনেকক্ষণ ঠিক উঠব উঠব ভাবছি এমন সময় কোথা থেকে ছুটে এসে রত্না বলল, 'বাচ্চুদা আপনি এখানে?'

আমাকে দেখে রত্না যতটা অবাক হয়েছিল, আমিও ওকে দেখে ঠিক ততটাই বিস্মিত হয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কোথা থেকে?'

মাত্র ঐ ক'টি মুহূর্তের মধ্যেই রত্নার সব চাঞ্চল্য, সব উচ্ছ্বাস বিদায় নিল। সার মুখের চেহারাটাই যেন বদলে গেল। কেমন যেন হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে গেল রত্না। সেদিন বিশেষ কিছু বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকু বুঝেছিলাম রত্না পাল্টে গেছে। কেন সে নিষ্প্রভ হয়েছিল সেদিন, কেন তার সব উচ্ছ্বাস বিদায় নিয়েছিল মাত্র ঐ ক'টি মুহূর্তের মধ্যে, সেসব কিছুই বুঝতে পারিনি।

রত্না শুধু বলেছিল, মাসখানেক হল আমি লন্ডনের সংসার তুলে চলে এসেছি। একটু থেমে বলেছিল, মন মেজাজ বিশেষ ভালো না ; তাই বাবা-মা'র সঙ্গে বেড়াতে এসেছি

আমি আর উঠলাম না। রত্নাকে বললাম, 'বসো, কফি খাবে তো?'

মুখে কোনো উত্তর দিল না। জিভ দিয়ে নীচের ঠোঁটটা একটু কামড়াতে কামড়াতে শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল আমার প্রস্তাবে।

কফি খেতে খেতে আমি বললাম, 'কি আশ্চর্য এই দুনিয়াটা। কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি শ্রীনগরে তোমার দেখা পাব!'

'ঠিক বলেছ বাচ্চুদা, দুনিযাটা বড় আশ্চর্যের জায়গা। মানুষ যা চায়, যা ভাবে তা হয় না। আর যা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়, ঠিক সেটাই জীবনে ঘটবে।' কফির কাপ থেকে মুখটা উঁচু করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই না বাচ্চুদা?'

আমি একটু মুচকি হেসে বললাম, 'ঠিক বলেছ।'

কফি খেয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে নেহরু পার্কে একটু ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'লন্ডন থেকে কবে দেশে ফিরলে?'

রত্না যেন কেমন আনমনা ছিল। মনে হল আমার কথা শুনতে পায়নি। আবার প্রশ্ন করলাম, 'কবে দেশে এলে?'

'এইতো কিছুদিন হল ; এখনও একমাস হয়নি।'

'বিনয় ডাক্তার কেমন আছে?'

'কি বললেন?'

'বিনয় ডাক্তার কেমন আছে?'

'ও!' একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল রত্না! বলল, 'খুব ভালো।'

আরো কয়েক মিনিট ঘুরে বেড়ালাম পার্কের মধ্যে। এতদিন পর এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আমার সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু তবুও কথাবার্তা বলাব বিশেষ তাগিদ না দেখে মনে হল, রত্নার মনমেজাজ বোধ হয় ভালো নেই।

রত্নাকে পৌঁছে দিলাম ওদের হাউস বোটে, দি প্যারাডাইসে। আমাকে দেখে ওর বাবা-মা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পরে দেখা করাব প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিন বিদায় নিয়ে চলে এলাম আমার হাউস বোটে।

মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে গিয়েছিল, মাথাটাও কেমন যেন ঝিম ঝিম করছিল। হাত-পা ছড়িয়ে ড্রইংরুমে সোফার ওপর শুয়ে পড়লাম। তারিক একটু উতলা হয়ে আমার তবিয়তের খবর নিল। আমি ওকে নিশ্চিত হতে বলে একটু চোখ বুজলাম। ডিনার খাবার জন্য তারিক ডেকেছিল কিন্তু আমি আর উঠিনি।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি বেশ জ্বর হয়েছে। সারাদিন চুপচাপ শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। বিকেলে কফি খেতেও বেরুলাম না। সন্ধ্যার পর ছাদে গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে বসে আবছা চাঁদের আলোয় দূরের হরিপর্বত দেখছিলাম। ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, টের পাইনি। কার যেন একটা ঠাণ্ডা হাত কপালে লাগতেই চমকে উঠলাম! চেয়ে দেখি রত্না।

'কি ব্যাপার? তুমি?'

রত্না আমার সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'জ্বর হয়েছে একটা খবর তো দিতে পারতে।'

একটু মুচকি হেসে রত্নার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেলাম। বললাম, 'তারিককে একটু ডাক দাও না, কফি খেতাম।'

'তারিককে একটু আমাদের বোটে পাঠিয়েছি, এখুনি আসছে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই রত্নার বাবা-মা এসে হাজির। মহা ব্যস্ত হয়ে চ্যাটার্জী সাহেব আমার নাড়ী পরীক্ষা করলেন, জিভ দেখলেন, কপালে বুকে হাত দিলেন। তারপর তাঁর ছোট্ট অ্যাটাচি থেকে কি যেন একটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বের করে আমাকে খাইয়ে দিলেন।

পরের দুটি দিন মিস্টার ও মিসেস চ্যাটার্জী এসেছিলেন আমাকে দেখতে। রত্নাও এসেছিল, তবে হিসেব করে নয়। সকালে এসেছে, দুপুরে এসেছে, এসেছে সন্ধ্যায় ও রাত্তিরে। আমার তদারক করেছে, আমার সঙ্গে গল্প করেছে। দুটি দিন পরেই আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম, কিন্তু তবুও রত্না আসত, আসত গল্প করতে, গল্প শুনতে।

কয়েকদিন পর লক্ষ্য করলাম, রত্না কি যেন আমাকে বলতে চায় অথচ বলে না বা বলতে পারে না। একটি একটি করে দিন চলে যায়, আমার শ্রীনগর ত্যাগের আগের দিন সন্ধ্যায় মিস্টার ও মিসেস চ্যাটার্জী রত্নাকে নিয়ে এলেন আমার হাউস বোটে। অনেক গল্পগুজব হল। শেষে ওঁরা বিদায় নিলেন।

রত্না বলল, 'মা তোমরা যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

রত্না আর দেরি করেনি। সেদিন রাত্রে আমার হাউস বোটের ছাদে বসে আবছা চাঁদের আলোয় তার জীবন নাট্যের নাতিদীর্ঘ অথচ ঘটনাবহুল কাহিনি শুনিয়েছিল আমাকে। নির্বাক, নিশ্চল, মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে কাহিনি শুনেছিলাম আমি।

দুই

প্রথম মাস দুই সারা লন্ডন শহরটাকে চষে ফেলল কিন্তু তবুও কোনো সুরাহা করতে পারল না অলক। পরে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিচয় হয় এক ইংরেজ সাংবাদিকের সঙ্গে এবং শেষে তাঁরই সাহায্যে ফ্লীট স্ট্রিটের এক আধাখ্যাত সাপ্তাহিকের আর্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি পায়। অলকের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আর্ট ডিরেক্টরের সুপারিশে ছ'মাসের মধ্যে অলকের মাইনে বারো থেকে পনেরো পাউন্ড হল।

মাইনে বাড়ার পর অলক বাসা পাল্টাল। গোল্ডর্স গ্রীনে একটা ছোট্ট দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাট নিল। একখানা ঘরে স্টুডিও হল। বেডরুমের কোনো এক কোন'য় রান্নার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু নিজের বাড়িতে একটু আধটু চা-কফি ছাড়া আর কিছু অলক করতে পারত না। নতুন নতুন যারা দেশ থেকে যায় তারা অবশ্য এর চাইতে বেশি কিছু পারে না। দু'চার মাসের মধ্যে সবাইকে রান্না-বান্না শিখে নিতে হয়। অলক সে তাগিদটুকুও বোধ করত না। সকাল বেলায় দু'এক কাপ চা খেয়ে অফিস বেরুবার পথে গোল্ডর্স গ্রীন স্টেশনের পাশে একটা ইটালীয়ান রেস্তোরাঁয় হেভী ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিত। দুপুরে লাঞ্চের টাইমে ফ্লীট স্ট্রিটের কোনো না কোনো রেস্টুরেন্টে দু'একটা স্যান্ডউইচ আর এক কাপ কফি খেত।

বিকেলে অফিস ছুটির পর প্রায়ই চারিং ক্রশ অবধি হেঁটে আসত। কোনোদিন স্ট্রান্ড, কোনোদিন ভিক্টোরিয়া এম্বব্যাঙ্কমেন্ট ধরে হেঁটে আসতে আসতে অলকের বেশ লাগত মানুষের ভীড় দেখতে। স্ট্রান্ডের উইন্ডো শপিংও মন্দ লাগত না। কিছুকাল পরে যখন এসব পুরনো হয়ে গেল তখন সোজা চলে আসত নিজেব ফ্ল্যাটে। নিজের স্টুডিওতে কাজ করত অনেক রাত অবধি।

ল্যান্ড স্কেপের চাইতে জীবন্ত মানুষের পোর্ট্রেট আঁকতেই অলকের বেশি ভালো লাগত। প্রথম দিন ইজেলের সামনে রঙ তুলি নিয়ে বসবাব সময় ভেবেছিল সামনের ফ্ল্যাটের বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পোর্ট্রেট আঁকবে। কিন্তু তাই কি হয়? যার স্মৃতি, যার ভালোবাসা অলকের জীবনযাত্রার একমাত্র পাথেয়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই কবিতারই পোর্ট্রেট আঁকল অলক। একটির পর একটি করে চার রকমের চারটি পোর্ট্রেট আঁকল কবিতার। স্টুডিওর চার দেওয়ালে ঝুলানো হল সেই চারটি পোর্ট্রেট। রিভলবিং একটা টুলের ওপর বসে অলক ঘুবে ঘুরে দেখত সেই পোর্ট্রেটগুলো আর মনে মনে বলত, কবিতা, তুমি আমার কাছে নেই, পাশে নেই সত্য কিন্তু আমার জীবনের চতুর্দিকে থেকে তুমি আমার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছ। এই বিদেশ বিভুঁইতে শুধু তুমিই আমাকে চতুর্দিক থেকে রক্ষা করবে।

বেডরুমে একলা একলা ঘুমুতে মন টিকত না। প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেত। ছুটে আসত স্টুডিওতে। বাকি রাতটুকু কবিতার চারটি পোর্ট্রেট দেখে কাটাত অলক।

তারপর মাস কয়েকের অক্লান্ত পরিশ্রমে কবিতার একটা লাইফ-সাইজ পোর্ট্রেট তৈরি করল অলক। জীবনের এত দরদ দিয়ে, এত ভালোবাসা দিয়ে মনের সমস্ত সত্তা, সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে পর পর ক'টি রাত জেগে পোর্ট্রেটের ফিনিশিং টাচ দিয়েছিল অলক।

যে কবিতাকে নিজের জীবনে, নিজের সংসারে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, তাকেই রং-তুলি দিয়ে বরণ করে তুলল শিল্পী অলক, প্রেমিক অলক। এই নতুন পোর্ট্রেটকে দেবীর মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করল নিজের বেড-রুমে।

পরবর্তী কিছুকাল অফিস ছাড়া অলক বাকি সময়টুকু কাটিয়েছে কবিতার পোর্ট্রেট দেখে, তাদের সঙ্গে কথা বলে, গান গেয়ে, আর পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে। মন কিন্তু এইখানেই স্থির হতে পারেনি, সে আরো এগিয়ে গেছে। মন চেয়েছে সমস্ত কিছু দিয়ে কবিতাকে গ্রহণ করতে, তাকে প্রাণের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে দেহের প্রতিটি সত্তা, প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করতে।

মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে তো দুনিয়া চলে না। মনের হুকুম মেনে চললে দুনিয়াটা হয়তো আরো সুন্দর, আরো মনোরম হত। কিন্তু তা হয়নি। হবারও নয়। অলকের সে উপলব্ধি হলে আর সহ্য করতে পারেনি, কবিতার পোর্ট্রেট ধরে হাউ হাউ করে কেঁদেছে। সারারাত্তির কেঁদেছে। সারাদিন কেঁদেছে।

বেশিদিন আর এমনি ভাবে কাটাতে পারেনি। অফিস ফেরার পথে কোনোদিন বড় একটা বোতল সঙ্গে এনেছে। দেবদাসের মতো ঢক্ ঢক্ করে গিলেছে সে বিষ। মাতাল হয়ে ভুলতে চেয়েছে কবিতাকে। পারেনি। বরং আরও মনে পড়েছে। মনে পড়েছে এলাহাবাদ টেগোর সোসাইটিতে গান গাইবার কথা। কবিতা হারমোনিয়াম বাজিয়েছিল আর অলক গেয়েছিল, 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে', 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে।'

বোতলের শেষটুকু পর্যন্ত খেয়েছে। ভেবেছে তাল সামলাতে পারবে না। অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে বাকি রাতটুকু সমস্ত অতীত স্মৃতিভার থেকে মুক্ত থাকবে। সব হিসাব-নিকাশ উল্টে-পাল্টে গেছে।

বন্ধুহীন, প্রিয়হীন অলকের দিন এইভাবেই কাটছিল। পরে বিধাতা পুরুষের অসীম কৃপায় ড্রুরী লেন থিয়েটারের পাশের একটা ছোট্ট গলির মধ্যে একটা 'পাবে' অপ্রত্যাশিতভাবে আলাপ হল ডাঃ মুখার্জীর সঙ্গে। প্রায় প্রথম দর্শনেই অলককে ভালো লেগেছিল ডাক্তারের। ভাবেভোলা উদাস নিঃসঙ্গ ব্যর্থ প্রেমিক শিল্পীকে কার না ভালো লাগবে? ডাক্তারের মধ্যে সংবেদনশীল দরদী মনের স্পর্শ পেয়ে অলক প্রায় কৃতার্থ হয়েছিল।

রোজ সম্ভব হতো না, কিন্তু প্রায়ই দুজনে মিলত। কোনোদিন কোনো 'পাবে' এক জাগ বিয়ার নিয়ে, কোনোদিন চিপস খেতে খেতে ভিক্টোরিয়া এম্বব্ধমেন্টে হাঁটতে হাঁটতে, কোনোদিন আবার মার্বেল আর্চের পাশে বা হাইড পার্কের কোনায় বসে বসে দুজনে গল্প করছে, আড্ডা দিয়েছে। অলকের আহত মন ডাক্তারের ভালোবাসার ছোঁয়ায় মুগ্ধ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, একদিন এক দুর্বল মুহূর্তে উজাড় করে দিয়েছিল নিজের স্মৃতি, বলেছিল কবিতাকে-ভালোবাসার ইতিহাস আর তার ব্যর্থতার কাহিনি।

জানো ডাক্তার, বাবা নিজে ওস্তাদ ছিলেন বলে তিনি চাইতেন আমি গান শিখি, ওস্তাদ হই, তাঁর ঐতিহ্য, তাঁর ধারা রক্ষা করি। ছেলেবেলায় বাবার কাছেই গান শিখেছি।

সবাই বলত আমার নাকি ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমার কিন্তু মন বসত না। আমি চাইতাম ছবি আঁকতে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পরই বাবা মারা গেলেন। আর আমার গানের চর্চাও বন্ধ হল। ভর্তি হলাম বোম্বে জে. জে. স্কুল অফ আর্টস-এ।

সেকেন্ড ইয়ারে পড়বার সময় মা মারা গেলেন। ছুটিতে এলাহাবাদ যাবার তাগিদ ও আকর্ষণ দুটোই কমে গেল। তাছাড়া দাদা বৌদির সংসারে আমার আসনটা ঠিক মজবুত ছিল না। আমার কাছে এলাহাবাদের একমাত্র আকর্ষণ ছিল আমার ছোট্ট ভাইঝি ময়না। দীর্ঘ দুটি বছর ওকে না দেখে মনটা বড়ই উতলা হয়ে উঠেছিল। বড্ড ইচ্ছে করছিল ওকে আদর করতে ; তাছাড়া ও যখন খুব ছোট্ট ছিল তখন থেকেই আমার কাছে রঙ-তুলি নিয়ে খেলা করত, গান শিখত। ইতিমধ্যে খবর পেলাম ময়না ভীষণ অসুস্থ। ফাইন্যাল পরীক্ষা যেদিন শেষ হল, তাব পরের দিনই বোম্বে মেলে চেপে পড়লাম। এলাম এলাহাবাদ!

মাস খানেক ধরে ময়নাকে নিয়ে জীবন-মৃত্যুর লড়াই চলল। তারপর ময়না ভালো হয়ে উঠল। ভেবেছিলাম বোম্বে ফিরে একটা চাকরি জোগাড় করব আর একটা ছোট্ট স্টুডিও খুলব। কিন্তু ময়না কিছুতেই ছাড়ল না। পৃথিবীতে শুধু ময়না ছাড়া আর কেউ আমাকে ভালোবাসত না। তাই তাকে কাঁদিয়ে, তাকে প্রতারণা করে, তার ভালোবাসার অপমান করে চোরের মতো পালিয়ে যেতে মন চায়নি। আমি বাধ্য হয়ে থেকে গেলাম এলাহাবাদে।

অলক থামেনি, আরো এগিয়ে গিয়েছিল। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে, কার্পণ্য না করে তার চোখের জলের পূর্ণ ইতিহাস শুনিয়েছিল ডাক্তারকে।

.. টেগোর সোসাইটি থেকে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে অলককে গান গাইতে ধরল পাড়াব ছেলেরা। অনেক দিন চর্চা নেই বলে তাদের অনুরোধ এড়িয়ে গেল। শেষে অনুষ্ঠানের দিন অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পীর গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে টেগোর সোসাইটির সেক্রেটারি মাইক্রোফোনে ঘোষণা করলেন, আজকেব অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী অলক মৈত্র।

নিরুপায় হয়ে অলককে গান গাইতে হয়েছিল। হারমোনিয়াম বাজাবার অভ্যাসটা ঠিক ছিল না। তাই বিশেষ অনুরোধে সেদিনের নির্ধারিত অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী কবিতা বাজিয়েছিল হারমোনিয়াম। প্রথমে ভেবেছিল একটি গান গাইবে. কিন্তু শ্রোতাদের দাবি ও কবিতার অনুরোধের মর্যাদা রাখবার জন্য অলককে চার চারটি গান গাইতে হয়েছিল। শ্রোতাদের নমস্কার করে স্টেজ থেকে উঠে উইং স্ক্রিনের পাশে এসেই অলক ধন্যবাদ জানিয়েছিল কবিতাকে। 'আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। এই আনাড়ীর সঙ্গে বাজাতে আপনার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধা হচ্ছিল. কিন্তু তবুও যে ধৈর্য ধরে বাজিয়েছেন তার জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

কবিতা বলেছিল, 'থাক্ থাক্ অনেক হয়েছে। ধন্যবাদ জানাব আপনাকে।'

'কেন বলুন তো? কি অপরাধ করলাম?'

'সত্যি বলছি, চমৎকাব গেয়েছেন। বড্ড ভালো লেগেছে।'

'ঠাট্টা করছেন?'

'আমাকে কি এতই অসভ্য মনে হচ্ছে যে প্রথম আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার

সঙ্গে ঠাট্টা করব!'

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল কবিতাকে একদিন ভালো করে গান শোনাবে অলক।

প্রয়াগতীর্থ এলাহাবাদের গঙ্গা-যমুনার মতো অলক আর ছোট্ট ময়নার স্নিগ্ধ শান্ত জীবনে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সবার অলক্ষ্যে অন্তঃসলিলা সরস্বতী এসে মিশে গেল।

জীবনের সেই পরম লগ্নে প্রথম প্রেমের উন্মাদনায় দুজনেই একটু বেহিসেবী হয়ে পড়েছিল। সমস্ত রাত্রির অন্ধকারের পর যখন প্রথম সূর্য ওঠে তখন সমস্ত দিগন্ত রাঙিয়ে সে আত্মপ্রকাশ করে। সারা রাত্রির মৌনের পর যখন পাখির ঘুম ভাঙে, যখন দিনের আলোর প্রথম ইঙ্গিত পায়, অনাগত সূর্য-কিরণের প্রথম স্পর্শের সামান্যতম অনুভূতি উপলব্ধি করে, তখন তার কলকাকলী সারা বিশ্বকে জাগিয়ে দেয়। একটু বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের রক্তিম আভা বিদায় নেয়, পাখিদের কলকাকলীও থেমে যায়। পরিচয়ের পর্ব শেষ হবার পর যখন দুজন দুজনকে সম্যকভাবে আবিষ্কার করল, উপলব্ধি করল, তখন সে উন্মাদনা, সে আধিক্য বিদায় নিল।

খসরুবাগের পিছন দিকের বাগানে কবিতার প্রথম পোর্ট্রেট আঁকল অলক। কবিতা স্থির হয়ে বসতে পারে না বেশিক্ষণ। দশ-পনেরো মিনিট পরপরই ছটফট করে উঠত। অলক তাকে ধরে নিয়ে বসিয়ে দিত। মুখটা নড়ে গেলে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঠিক করে দিত, লম্বা বিনুনীটা আবার পেছন থেকে টেনে এনে সামনে বুকের ওপর ঝুলিয়ে দিত ঠিক আগের মতো করে। আবার দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে সব কিছু ঠিক রেখেও এ্যাঙ্গেলটা করে দিত কবিতা। কখনও কখনও একটু বকে, একটু আদর করে আবার ঠিক করে নিত অলক।

পোর্ট্রেটটা যখন শেষ হল তখন চমকে উঠেছিল কবিতা। দু'হাতে তালি বাজিয়ে বলেছিল, আঃ ওয়ান্ডারফুল!

ভাবের বন্যায়, তৃপ্তির আনন্দে, ভালোবাসার আতিশয্যে কবিতা দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিল অলককে। আর অলক? গঙ্গার মতো স্নিগ্ধ শান্ত অলক হঠাৎ পদ্মার মতো পাগল হয়ে উঠেছিল কবিতার প্রথম আলিঙ্গনে, কেউটে সাপের বিষের মতো ভালোবাসার বিষ ঢেলেছিল কবিতার দুটি ওষ্ঠে।

মিনিট দুই পরে দুজনেরই সম্বিত ফিরে এসেছিল। দুজনেই লজ্জায় চোখ সরিয়ে নিয়েছিল। লজ্জায় কারুর মুখ দিয়েই কথা বেরোয়নি বেশ কিছুক্ষণ। প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল অলক, 'কবিতা।'

'উঃ।'

'রাগ করলে?'

কোন উত্তর দেয় না কবিতা। শুধু মুচকি হাসে।

অলক আবার প্রশ্ন করে, 'বল না কবিতা, রাগ করছ?'

কবিতা আলতো করে অলকের কাঁধে মাথা রেখে ক্ষীণকণ্ঠে বলে, 'উঁহু!'

এরপর অলক-কবিতার জীবন থেকে যেন শীতের জড়তা কেটে গেল, যেন কোনো ইঙ্গিত না দিয়ে কালবৈশাখীর ঝড় উঠল দুটি প্রাণের গহন রাজ্যে! প্রায় ঝড়ের বেগে

দুরন্ত বর্ষার পদ্মার মতো দুটি জীবন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চললো।

এলাহাবাদের পরিচিত মানুষের ভিড়ের মধ্যে সীমিত স্বাধীনতায় মন ভরে না। দুটি প্রাণ, দুটি মন, দুটি আত্মা অন্তহীন আকাশের তলায় দিগন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরের স্বাধীন পরিবেশে মিলতে চায়, চায় ভালোবাসার প্রয়াগতীর্থে বিলীন হয়ে যেতে।

অলক বলে, জানো ডাক্তার, কামনাবৃত্তির মধ্যে ভালোবাসা না থাকতে পারে, কিন্তু ভালোবাসার মধ্যে নিশ্চয়ই কামনাবৃত্তি লুকিয়ে থাকে। রক্তমাংসের মানুষ এর উর্দ্ধে যেতে পারে না, আমরাও পারিনি। দুজনেই সে আগুনের উত্তাপ উপলব্ধি করেছিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতের চিন্তা করে সে আগুনে আহুতি দিতে পারিনি!

দুজনেই ঠিক কবলাম, আর কিছু না হোক অন্তত লোকারণ্যের বাইরে সমাজের শ্যেন চক্ষুর আড়ালে দুজনে নিঃসঙ্গ তীর্থ যাত্রা করব, আগামী দিনের ইতিহাসের বুনিয়াদ তৈরি করব। কবিতা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু পূর্ণিমার সঙ্গে পূর্ণিমার দিল্লিবাসী মামার কাছে যাবার অনুমতি নিল বাবা-মার কাছ থেকে। আমিও গেলাম। উদয় অস্ত ঘুরে বেড়িয়েছি দুজনে। হেসেছি, খেলেছি, আনন্দ করেছি, করেছি ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকে পাকাপাকি।

পূর্ণিমার মামা গাড়িতে করে আগ্রা-জয়পুর দেখার প্রোগ্রাম করলেন। হঠাৎ যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় কবিতা জানাল, তার শরীর খারাপ। মামা প্রোগ্রাম বাতিল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কবিতা বলেছে, তা হয় না মামা। মামা বার বার আপত্তি করেছেন, কবিতাও বার বারই আপত্তি করেছে। শেষে মামা মামীকে রেখে যেতে চেয়েছেন, কিন্তু তখন পূর্ণিমা বলেছে, না মামা, তা হয় না। মামী না গেলে আমিও যাব না। মামা ঠিক রাজি হতে পারেননি, কিন্তু পূর্ণিমা বলেছে, দুটো দিন আমাদের ছাড়া থাকলে কবিতা উড়ে যাবে না। বেশ থাকতে পারবে। তাছাড়া বুড়ো রামনাথ তো রইল!

মামা-মামী পূর্ণিমা রওনা হবার পরই কবিতার শরীর ঠিক হয়ে গেল। কবিতাকে নিয়ে সেদিন আমি গেলাম রিজ-এ! অনেক গল্প, অনেক গান হল, ভবিষ্যৎ নিয়েও অনেক আলোচনা হল। স্থির হল, এবার এলাহাবাদ ফিরে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই দুটি জীবন একই গ্রন্থিতে বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর দুজনে চলে যাব বোম্বে, খুলব স্টুডিও।

কিছুদিন পরে কবিতাকে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড় করালাম। আর আমি রঙ-তুলি দিয়ে প্রাণহীন ক্যানভাসে আমার মনের প্রতিমাকে গড়ে তুলতে শুরু করলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মোটামুটি স্কেচটা করে নিলাম। কবিতা আর স্থির থাকতে পারল না। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে করতে দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দিল। আমি অনেকবার বারণ করলাম, কবিতা, এতো হুড়োহুড়ি করো না। হঠাৎ কোনো পাথরে চোট লেগে যাবে। আমি যত বারণ করি, আমাকে রাগাবার জন্য ও তত বেশি দৌড়াদৌড়ি করে। শেষে হঠাৎ একবার একটা গোল পাথরের ওপর পা পড়া মাত্র কবিতা ছিটকে গড়িয়ে পড়ল অনেক দূরে। মনে পড়ে ওর শুধু একটা বিকট চিৎকার শুনেছিলাম। আমি দৌড়ে লাফিয়ে গেলাম ওর পাশে। দেখি আধাশুকনো মোটা ডালে খোঁচা খেয়ে হাত পা রক্তারক্তি হয়েছে। চীৎকার করে ডাক দিলাম, কবিতা?

কোনো সাড়া পেলাম না। মুহূর্তের জন্য আমার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল. মনে হল মাটিটা কাঁপছে, চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল, কবিতাকে বাঁচাতে হবে। ওর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে একটু ভালো করে নজর করতে দেখলাম জ্ঞান নেই। আর দেখলাম সারাটা কাপড় রক্তে ভিজে উঠেছে। দু'এক মিনিটের মধ্যেই আবিষ্কার করলাম একটা মোটা ডাল ওর উরুতে কয়েক ইঞ্চি ঢুকে গেছে আর সেখান দিয়ে রক্ত বইছে।

অলক সেদিনের ভয়াবহ স্মৃতির কথা স্মরণ করে ভয়ে-আতঙ্কে শিউরে উঠল। ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরে বলল, আমি আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ডালটাকে বের করলাম। ওর শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে ওখানে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলাম।

ডাক্তার এতক্ষণ মুখ বুজে শুধু শুনছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, তারপর?

তারপর ওকে নিয়ে গেলাম দিল্লির উইলিংডন হাসপাতালে। এমার্জেন্সীতে নেবার. সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তাররা দল বেঁধে ঢুকল অপারেশন থিয়েটারে। অনেকক্ষণ ধরে অপারেশন হল! সতেরোটা স্টিচ করতে হয়েছিল।

ডাক্তার মুখার্জী একটু চমকে উঠলেন, ভ্রূ দুটোও কুঁচকে উঠল।

অলক বলল, শুধু শুনেই ঘাবড়ে যাচ্ছো ডাক্তার! আর ভেবে দেখো তো আমার সেদিনের অবস্থা!

অলকের চোখের ওপর থেকে ডাক্তার দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিল। মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে কি যেন চিন্তা করে নিল।

অলক বলেছিল, তার পরের কাহিনি বিস্তারিতভাবে বলে লাভ নেই। শুধু জেনে রাখ, পূর্ণিমা আর মামা-মামীমার অসীম কৃপায় কবিতা ভালো হয়ে উঠল আর আমরা দুজনেই অনেক অপমানের হাত থেকে রক্ষা পেলাম! কবিতা যখন এলাহাবাদ ফিরে গেল, তখন ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। দিল্লির রিজ-এর কাহিনি, অপারেশনের খবর কেউ জানল না। পূর্ণিমা আর ওর মামা-মামী ছাড়া কবিতার অপারেশনের খবর আজো কেউ জানে না।

পৃথিবীর অসংখ্য প্রেমের কাহিনির মতো অলক-কবিতার প্রেম বাস্তবে সাফল্য লাভ করেনি। একটা সামান্য আর্টিস্টের সঙ্গে যে কবিতার বিয়ে হওয়া অসম্ভব, সে কথা অলককে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন ওর বাবা, দাদা। এতদিন যে কথা, যে কাহিনি এলাহাবাদের কেউ জানতো না, হঠাৎ এতদিন পরে সে কাহিনি জর্জ টাউন, টেগোর টাউন, কাটরা, সিভিল লাইন্সের সব বাঙালি মহলে ছড়িয়ে পড়ল।

কবিতা-বিহীন জীবনে অলক সহ্য করতে পারেনি এই অপমানের ঝড়। একদিন গভীর রাতে ময়না ঘুমিয়ে পড়ার পর অলক দেশত্যাগী হল।

'জানো ডাক্তার, আর একবার দিল্লি দেখতে ভীষণ ইচ্ছা করল। তাই সব চাইতে প্রথম এলাম সেখানে। রিজ-এর চারপাশে, উইলিংডন হাসপাতালের আশে-পাশে ঘোরাঘুরি করে কিছুটা চোখের জল ফেলে কবিতার উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা জানালাম, তার ভালোবাসার স্মৃতি রোমন্থন করে অনেক দুঃখের মধ্যেও নতুন করে বাঁচার প্রেরণা পেলাম। শেষ দিন পূর্ণিমার মামা-মামীকে প্রণাম করে ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিলাম।'

অলকের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছিল। গলার স্বরটা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবুও থামল না।

'মা, ময়না আর কবিতা এই তিন জনের তিনটি ছবি আর মাত্র দশটি পাউন্ড সম্বল করে চড়ে পড়লাম প্লেনে। এলাম তেহেরান। তেহেরান থেকে বাগদাদ, বাগদাদ থেকে কায়রো, কায়রো থেকে এথেন্স, তারপর রোম, জুরিখ, জেনেভা, ফ্রাঙ্কফার্ট, প্যারিস ও সব শেষে এই হতচ্ছাড়ার দেশে। ন'মাস ধরে ঘুরেছি এইসব দেশে। যে কবিতাকে আমি পেলাম না আমার জীবনে, সেই কবিতার অসংখ্য পোর্ট্রেট এঁকেছি। জীবন ধারণের জন্য সামান্য কিছু পয়সার বিনিময়ে সে সব পোর্ট্রেট দিয়ে এসেছি ঐসব দেশের সম্ভ্রান্ত মানুষের হাতে। আমার ঘরে আমি কবিতাকে কোনো মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম না, তাইতো মর্যাদার সঙ্গে তার প্রতিষ্ঠা করে এলাম অসংখ্য মানুষের সংসারে।'

প্রায় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল অলক। তবুও বেশ খানিকটা সামলে নিয়ে বলল, এখানে এসেও কবিতার পোর্ট্রেট এঁকেছি ; একটি নয়, দু'টি নয়, অনেকগুলি। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে আজ আর তার পোর্ট্রেটগুলো কাউকে দিতে পারব না।

একটু চুপ করল অলক। শেষে বলল, 'ভাই ডাক্তার, এই দেশেও আমার মন টিকছে না। কয়েকদিনের মধ্যেই ইমিগ্রেশন নিয়ে কানাডা চলে যাচ্ছি। ডাক্তার মুখার্জীর হাতটা চেপে ধরে বলল, ডাক্তার, বোধহয় তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। এ ফাঁদে আমি আর পা দেবো না। তাই তোমার সঙ্গেও আর বিশেষ যোগাযোগ রাখব না বা রাখতে পারব না। তবে কানাডা যাবার আগে তোমার হাতে আমার কবিতার পোর্ট্রেটগুলো দিয়ে যাবো। একটু মর্যাদার সঙ্গে ওগুলো রক্ষা করো।

এবার ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরল অলক। বলল, 'আর একটা শেষ অনুরোধ আছে তোমার কাছে। যদি কোনোদিন কবিতার দেখা পাও বোলো, আমি আজও ভুলতে পারিনি তাকে। বোলো, আজও বোধহয় আমি তাকে ভালোবাসি। সে আর তার স্বামী যেন আমাকে ক্ষমা করে। ডাক্তার! আর যদি কোনোদিন কোনো কারণে সুযোগ আসে তবে আমার ময়নার একটু খোঁজ কোরো, একটু আদর কোরো আমার হয়ে।

ডাক্তার আর অলক দুজনেই চোখের জল মুছতে মুছতে বিদায় নিল সে রাত্রে। দিন তিনেক পরে অলক তার গোল্ডার্স গ্রীনের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছিল ডাক্তারকে। কবিতার পোর্ট্রেটগুলো দেখে ডাক্তার যেন ভূত দেখার মতো আঁতকে চমকে উঠেছিল। অলক জিজ্ঞাসা করেছিল, কী হল ডাক্তার?

কোনমতে সামলে নিয়ে ডাক্তার জবাব দিল, না, কিছু না। এতগুলো সুন্দর পোর্ট্রেট দেখে চমকে না উঠে কী করি বলুন!

পোর্ট্রেটগুলো নেবার আগে ডাক্তার শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা ধরুন যদি কোনোদিন আপনার কবিতার দেখা পাই, তাকে যদি একটা পোর্ট্রেট দিতে হয়, তবে কোনটা দিলে আপনি সুখী হবেন?

'ডাক্তার, যদি কোনোদিন কবিতার দেখা পাও তবে সে ভারটা তাকেই নিতে বলো।'

ডাক্তার মুখার্জী ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন।

অলক তার শূন্য মন্দিরে ফিরে এসে প্রায় উন্মাদের মতো চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

তিন

'জানেন বাচ্চুদা, আপনার বিনয ডাক্তার আমাব অতগুলো পোর্ট্রেট নিয়ে আসতেই হঠাৎ আমার মাথায বজ্রাঘাত হল। অতীত বর্তমানের সমস্ত স্মৃতি যেন আমাকে উন্মাদ করে তুলল। সেদিন যে কিভাবে নিজেকে সংযত রেখেছিলাম, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন আর কেউ না।'

অনেক রাত হয়েছিল। হাউস বোটের ছাদে বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। কিন্তু তবুও দুজনের কেউই নড়তে পারলাম না।

রত্না আঁচল দিয়ে একবার চোখের জল মুছে নিল। বলল, আপনার ডাক্তার বিন্দুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ করল না। কিন্তু দিন কতক আগে আমাব উরুর অপারেশন নিয়ে আলাপ-আলোচনা আর সেদিনের পোর্ট্রেট আনার সঙ্গে আমার চোখেব সামনে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠল। যথারীতি ডিনার খেতে বসলাম দুজনে। আমার গলা দিয়ে কিছু নামতে চাইছিল না। ডাক্তাব কিন্তু অন্য দিনেব চাইতে অনেক বেশি খেয়েছিল। অন্য দিন একটাও বেশি ফিস ফ্রাই খায় না, সেদিন আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিন তিনটে খেলো। দু'বাব করে ভাত আর মাছ চেয়ে নিল।

রত্নার গলা দিয়ে আর স্বর বেরুচ্ছিল না। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম কিন্তু তবুও ওকে কিছু বলতে পারলাম না।

একটু কাশল, একটু চোখের জল মুছে নিয়ে আবার শুরু করল, আজ আর আপনার কাছে কিছু গোপন কবব না। সব কিছু বলে কিছুটা হালকা হতে চাই।

রত্নাব মন হালকা হয়েছিল কিনা জানি না। তবে বলেছিল, ডাক্তাব সে রাত্রে ওকে অনেক আদর করেছিল, ভালোবাসায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে চরম আনন্দ দিতেও কার্পণ্য করেনি। তারপর দু'হাত দিয়ে বুকেব মধ্যে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

রত্নার চোখে অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি। কিন্তু বিধাতাপুরুষেব বিধান কে খণ্ডাবে। শেষ রাত্তিরেব সর্বনাশা ঘুম তাকে গ্রাস করল।

অন্যদিনের চাইতে পরের দিন অনেক বেলায ঘুম ভাঙল রত্নার। হাসপাতালে ডাক্তারের ডিউটি আটটা থেকে। সাড়ে সাতটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট খেয়ে রওনা হয়। ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজে দেখে চমকে উঠল রত্না। কিন্তু ডাক্তারকে তখনো ঘুমিয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ যেন আঁতকে উঠল!

রত্না আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাচ্চুদা, একটু পরে একটু নাড়াচাড়া করতেই দেখলাম সব কিছু শেষ। পাশে দেখি স্লিপিং পিলের দুটো খালি শিশি পড়ে আছে। বালিশের তলায একটা চিঠি পেয়েছিলাম...

রত্না, আমি যাচ্ছি, দুঃখ করো না। তোমাকে আমি ভালোবেসেছি, কিন্তু সে ভালোবাসা শুধু স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা। তার বেশি কিছু নয়। তুমি যাঁর কবিতা, সেই অলক আর তোমার সারা মনকে বঞ্চনা করে রত্নাকে উপভোগ করার কোনো অধিকাব আমার

নেই।

রত্না, আমি যাচ্ছি, আবার তোমার কাছে ফিরে আসব। তবে আগামী জন্মে নয়। আগামী জন্মে তুমি নিশ্চয়ই অলককে পাবে। তার পরের জন্মে আমি আসব তোমার কাছে।

আমার জন্যে তুমি চোখের জল ফেলো না। আমি তো তবুও ক'টি বছর তোমার ভালোবাসা পেয়েছি, তোমাকে উপভোগ করেছি, সুখে-দুঃখে তোমাকে পাশে পেয়েছি। দুঃখ হয় সেই সর্বত্যাগী শিল্পীর জন্য, যে তোমার ভালোবাসার জ্বালা বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা পৃথিবীময় আর শুধু তোমার ছবি এঁকে দিন কাটাচ্ছে।

আর হ্যাঁ, অলক যাবার আগে আমাকে দুটি বিশেষ অনুরোধ করেছিল। তার একটি আমি রক্ষা করার সময় পেলাম না। ওর বড় আদরের ময়নাকে একটু দেখো আর অলকের হয়ে একটু আদর করো।

ভগবান তোমার সহায় হোন।

তোমার বিনয়

শিউলি

মালপত্র গুছিয়ে রাখার পর হট কেসটাকে দেখিয়ে শৈবাল বললেন, দোয়েল-কোয়েল, তোমরা আগে দাদুনকে খাইয়ে দিও। তারপর তোমরা দু'জনে. .

উনি কথাটা শেষ করার আগেই দোয়েল একটু হেসে বলল, তোমার ভয় নেই। তোমার বাবাকে আমরা না খাইয়ে রাখব না।

এবার উনি মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমরা দাদুনকে একলা রেখে কোথাও যাবে না। দাদুনের সব কথা শুনবে।

কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে দাদুনের গলা জড়িয়ে ধরে বেশ গম্ভীর হয়ে বলে, এই বুড়ো! শুনলে তো ছেলের কথা? আমাদের পারমিশান না নিয়ে তুমি কোথাও যেতে পারবে না।

দোয়েল বলে, তুই কিছু চিন্তা করিস না কোয়েল। পুরীতে তো দাদুন ছেলেকেও কাছে পাবে না, পুত্রবধূকেও কাছে পাবে না। আমরা যা বলব, বুড়োকে তাই শুনতে হবে।

ওদের কথায় শুধু শৈবাল আর বৃদ্ধ অনিলবাবু না, সামনের বার্থের বৃদ্ধা ও মধ্যবয়সী ভদ্রলোকও হাসেন।

শৈবাল ঐ ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেন, আপনারাও কী পুরী যাচ্ছেন?

উনি পাশের বৃদ্ধাকে দেখিয়ে বলেন, আমার মাসীমা যাচ্ছেন। আমি যাচ্ছি না।

শৈবাল বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বলেন, মাসীমা, আপনিও মেয়ে দুটোর দিকে একটু খেয়াল রাখবেন।

দোয়েল সঙ্গে সঙ্গে বলে, দিদাকে কিচ্ছু করতে হবে না। আমরাই দিদাকে দেখব!

বৃদ্ধা এক গাল হাসি হেসে বলেন, আমার মত বুড়িকে দেখাশুনা করতে তোমাদের কষ্ট হবে না তো?

—না, না, কিছু কষ্ট হবে না।

দোয়েল মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, এই বুড়োকে যদি সামলাতে পারি, তাহলে আপনার মত সুন্দরী দিদাকে দেখাশুনা করতে আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

বৃদ্ধা চাপা হাসি হেসে বলেন, আমাকে আর সুন্দরী বলো না। তোমাদের মত সুন্দরী তো চোখেই পড়ে না।

কোয়েল বলে, ও কথা বলবেন না দিদা। আপনাকে এই বয়সেই যখন এত সুন্দর দেখতে, তখন অল্প বয়সে যে কত সুন্দর ছিলেন, তা ভাবাই যায় না।

উনি চাপা হাসি হেসে বলেন, তোমরা যাই বলো না কেন, আমি অল্প বয়সেও তোমাদের মত সুন্দর ছিলাম না।

বৃদ্ধ অনিলবাবু একবার হাতের ঘড়ি দেখেই ছেলেকে বললেন, হ্যারে খোকা, তুই এবার

যা। বাড়িতে বৌমা একলা আছেন।

দোয়েল বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা, তুমি যাও। মায়ামাসী আজ কাজে আসবে না। মা অনেকক্ষণ একলা একলা আছে।

শৈবাল বাবাকে প্রণাম করার পর দুই মেয়েকে একটু আদর করে ট্রেন থেকে নামার আগে বলেন, তোমরা রোজ একবার করে ফোন করতে ভুলে যেও না যেন।

দোয়েল বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, রোজই ফোন করবো। সময় পেলে তুমিও ফোন করো

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করব।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার বোনপো মাসীকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

দু'পাঁচ মিনিট পরই ট্রেন ছাড়ল।

ট্রেন ছাড়ার পর পরই কোচ অ্যাটেনডান্ট চার্টের উপর চোখ বুলিয়েই অনিলবাবুকে জিজ্ঞেস করে, আপনি মিঃ ব্যানার্জী?

—হ্যাঁ।

—আর ওরা দু'জনে মিস ডি ব্যানার্জী আর মিস কে. ব্যানার্জী?

—হ্যাঁ।

এবার কোচ অ্যাটেনড্যান্ট বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি মিসেস চৌধুরী?

বৃদ্ধা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।

কোচ অ্যাটেনডান্ট সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়।

দোয়েল হট কেস খুলতে খুলতেই বলে, দাদুন, হাত ধুয়ে এসো।

কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে সাবান-তোয়ালে বের করে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দেয়।

অনিলবাবু বাথরুম থেকে ঘুরে আসতেই দোয়েল ওর হাতে লুচি-আলুর দমের প্লেট তুলে দেয়।

দ্বিতীয় প্লেটটি ও মিসেস চৌধুরীর দিকে এগিয়ে ধরতেই উনি একটু হেসে বললেন, দিদি, তোমরা খাও। আমি খেয়ে এসেছি।

কোয়েল বলে, বাড়ি থেকে যা খেয়ে এসেছেন, তা এতক্ষণে হজম হয়ে গেছে।

দোয়েল বলে, এই ছোট্ট ছোট্ট দু'চারটে লুচি খেতে আপনার কোনো কষ্ট হবে না। আমরা তিনজনে খাবো আর আপনি খাবেন না, তাই কখনো হয়?

—কিন্তু...

—না, না, দিদা, এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে পারে না। নিন, নিন, ধরুন।

মিসেস চৌধুরী প্লেট হাতে নিতেই কোয়েল ওর দিকে তাকিয়ে বলে, দ্যাটস্ লাইক এ গুড গার্ল!

ওর কথা শুনে উনি না হেসে পারেন না।

খেতে খেতেই মিসেস চৌধুরী অনিলবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনার এই দুটি নাতনি কী যমজ?

—হ্যাঁ।

কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে বলে, দাদুন, মিথ্যে কথা বলছ কেন?

ও মিসেস চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা যমজ না। দিদি আমার থেকে সাত মিনিটের বড়।

মিসেস চৌধুরী চাপা হাসি হেসে বলেন, তাহলে তো তোমরা যমজ না!

লুচি-আলুর দমের পর্ব শেষ হতেই দোয়েল সবাইকে মিষ্টি দেয়।

মিষ্টি খেতে খেতেই মিসেস চৌধুরী দোয়েল-কোয়েলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা বুঝি একটু রাত করে খাওয়া-দাওয়া করো?

কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁ।

দোয়েল বলে, দশটা পর্যন্ত তো আমরা পড়াশুনাই করি। তারপর আমরা সবাই মিলে একটু আড্ডা দেবার পরই সবাই একসঙ্গে খেতে বসি।

—তোমার দাদুনও অত রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করেন?

ও হাসতে হাসতে বলে, আমরা দুই বউ দু'পাশে না বসলে তো বুড়ো খেতেই পারে না।

কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে বলে, জানেন দিদা, এই বুড়ো যেমন আমাদের দু'জনকে দু'পাশে না নিয়ে ঘুমুতে পারে না, আমরা দু'জনেও বুড়োকে কাছে না নিয়ে শুতে পারি না।

—তোমাদের দাদুন সত্যি ভাগ্যবান।

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর অনিলবাবু মিসেস চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলেন, হ্যাঁ, সত্যি আমি ভাগ্যবান। শুধু এরা দু'জনে না, আমার ছেলে আর পুত্রবধূও অসম্ভব ভালো।

দাদুনকে শুইয়ে দেবার পর দোয়েল-কোয়েল উপরের বার্থে যায়। দোয়েল বার্থের বাইরে মুখে নিয়ে মিসেস চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করে, দিদা, আপনি কোথায় উঠবেন?

—আমি বরাবরই হালদার মশায়ের পুরী হোটেলে উঠি।

ও একটু উত্তেজিত হয়ে বলে, আমরাও তো পুরী হোটেলেই উঠব।

কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে বলে, দিদা, আমরা পাশাপাশি ঘরে থাকব। আপনি পাশের ঘরে থাকলে খুব মজা হবে।

মিসেস চৌধুরী একটু হেসে বলেন, তোমাদের দু'জনকে কাছে পেলে তো আমিও আনন্দে থাকব।

হ্যাঁ, ওরা পাশাপাশি ঘরেই থাকেন। এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব আর সমুদ্রের ধারে, জগন্নাথ মন্দিরের আশেপাশে ঘুরাঘুরি করে দু'তিনটে দিন বেশ কেটে যায়।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। বাইরে না বেরিয়ে ঘরে বসেই ওরা সবাই গল্পগুজব করছিলেন। হঠাৎ কথায় কথায় মিসেস চৌধুরী অনিলবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দাদা, বৌদিকে সঙ্গে আনলেন না কেন?

উনি একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, সে বহুকাল আগেই মারা গিয়েছে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আমার ছেলে যখন মাত্র ছ'বছরের তখনই আমার স্ত্রী মারা যান।

কথাটা শুনেই মিসেস চৌধুরী অবাক হন। সঙ্গে সঙ্গেই উনি প্রশ্ন করেন, তখন ঐটুকু বাচ্চাকে কে দেখাশুনা করতেন?

অনিলবাবু জবাব দেবার আগেই দোয়েল বলে, দাদুনই তো বাবাকে মানুষ করেছেন।

ও প্রায় না থেমেই একটু হেসে বলে, বাবা তো আমাদের দুই বোনকে সব সময় বলেন, তোমাদের চাইতে তোমাদের দাদুনকে আমি হাজার গুণ বেশি ভালোবাসি।

মিসেস চৌধুরী একটু হেসে বলেন, ওটা উনি মজা করে বলেন।

কোয়েল বলে. না, না, দিদা, বাবা সত্যি দাদুনকে অনেক বেশি ভালোবাসে।

দোয়েল ডান হাত দিয়ে দাদুনের গাল টিপে আদর করে মিসেস চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে একটু চাপা হাসি হেসে বলে, বাবা-মা যাকে ইচ্ছে ভালোবাসুক, আমরা এই বুড়োকে নিয়ে মহা সুখে আছি।

ওর কথা শুনে মিসেস চৌধুরী একটু হেসে বলেন, সে তো আমি নিজের চোখেই দেখছি।

উনি একটু থেমে অনিলবাবুব দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনার স্ত্রী যখন মারা যান, তখন আপনার বয়স কত।

—ঠিক তিরিশ।

—মাত্র তিরিশ?

—হ্যাঁ।

—ঐ বয়সে তো অনেকে বিয়েই করেন না।

মিসেস চৌধুরী প্রায় এক নিঃশ্বাসেই প্রশ্ন করেন, আপনি আবার বিয়ে করলেন না কেন?

অনিলবাবু একটু হেসে বলেন, মা জোব করে বিয়ে না দিলে আমি বিয়েই করতাম না। দ্বিতীয় বার বিয়ের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

কোয়েল সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, দাদুন, তুমি বিয়ে করতে চাওনি কেন?

—এমনি।

—ইস! কি আমার সাধু?

দোয়েল গম্ভীর হয়ে বলে, দাদুন, আমরা কচি বাচ্চা না। আমরা মাধ্যমিক পাশ করে কলেজে পড়ছি। আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করো না। সত্যি করে বলো, কেন বিয়ে করতে চাওনি।

বৃদ্ধ হাসতে হাসতে বলেন, সত্যি বলছি বড় বউ, আমি এমনি বিয়ে করতে চাইনি।

কোয়েল ফৌজদারি উকিলের মতো জেরা করে, সত্যি করে বলো তো কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছিলে কিনা।

ওর প্রশ্ন শুনে শুধু অনিলবাবু না, মিসেস চৌধুরীও হো হো করে হেসে ওঠেন।

—দাদুন, হাসি দিয়ে ছোট বউকে ভোলাতে পারবে না। আমার কথার জবাব দাও।

—সত্যি বলছি ছোট বউ...

বৃদ্ধকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই দোয়েল বিদ্যুৎ গতিতে ওর দুটি হাত ওদের দুই বোনের মাথায় চেপে ধরে গম্ভীর হয়ে বলে, আমাদের মাথায় হাত দিয়ে মিথ্যে কথা বলবে না।

বৃদ্ধ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, হ্যাঁ, বড় বউ, আমি সত্যি একটা মেয়েকে ভালোবাসতাম।

দোয়েল সঙ্গে সঙ্গে বলে, দ্যাটস্ লাইক এ গুড বয়!

কোয়েল বলল, তোমাব মতো হ্যান্ডসাম ছেলে যৌবনে প্রেমে পড়েনি, তাই কখনো হয়?

ওদের কাণ্ড-কারখানা দেখে মিসেস চৌধুরী শুধু হাসেন।

দোয়েল বৃদ্ধের মুখের সামনে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করে, যে মেয়েটিকে ভালোবাসতে, তার নাম কি?

—শিউলি।

কোয়েল চিৎকার করে বলে, হাউ রোমান্টিক!

দোয়েল আবার প্রশ্ন করে, উনি নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী ছিলেন?

—হ্যাঁ, বড় বউ, শিউলি খুবই সুন্দরী ছিল।

বৃদ্ধ অনিলবাবু মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে বলেন. ও লেখাপড়ায় যেমন ভালো ছিল, সেইরকমই ভালো গান গাইতে পারতো।

কোনোমতে হাসি চেপে কোয়েল জিজ্ঞেস করে, কি-ভাবে তোমাদেব ভাব হল?

বৃদ্ধ চাপা হাসি হেসে বলেন, আমার বাবার মতো শিউলির বাবাও রেলের ডাক্তার ছিলেন। আমরা পাশাপাশি বাংলোয় থাকতাম।

—প্রথম যখন আলাপ হয়, তখন তোমাদের বয়স কত?

গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে দোয়েল।

—আমাদের কারুরই বয়স বেশি ছিল না। বলতে পারো কিশোর-কিশোরীর প্রেম; কিন্তু দু'জনেই দু'জনকে খুব ভালোবাসতাম।

কোয়েল হাসতে হাসতে বলে, দাদুন, তুমি কি পাকাই ছিলে!

—যাই বলো ছোট বউ, শিউলিকে দেখলে বা তার সঙ্গে মেলামেশা করলে তোমরাও তাকে না ভালোবেসে থাকতে পারতে না।

দোয়েল প্রশ্ন করে, শিউলিকে বিয়ে করলে না কেন?

—আমার বাবা তখন কলকাতা থেকে ধানবাদ বদলি হয়ে গেছেন। আমি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি। ঐ সময় হঠাৎ জানতে পারলাম, শিউলির বাবা-মা অ্যাকসিডেন্টে মাবা গিয়েছেন।...

—ও মাই গড!

দোয়েলের মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে যায়।

—ঐ অ্যাকসিডেন্টের পরই শিউলি আর ওর দিদিকে বোধহয় কোনো আত্মীয় নিয়ে যায় কিন্তু আমরা ওদের ঠিকানা না জানায় কোনো চিঠিপত্রও লিখতে পারলাম না।

—কিন্তু উনি তো তোমাদের ঠিকানা জানতেন!

দোয়েল মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলেন, উনি তো তোমাকে চিঠি দিতে পারতেন।

বৃদ্ধ অনিলবাবু ম্লান হাসি হেসে বলেন, বড় বউ, মিসফুরচুন নেভার কামস্ অ্যালোন। ঠিক ঐ সময়ই আমার বাবা হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া ছেড়ে চাকরি করতে শুরু করলাম।

উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, শিউলি নিশ্চয়ই আমাকে চিঠি দিয়েছিল কিন্তু ওর চিঠি আসার আগেই তো আমি বেনারস ছেড়ে চাকরি নিয়ে কটক চলে গেছি।

মিসেস চৌধুরী মুখ নীচু করে থাকেন। দোয়েল আর কোয়েলও কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দোয়েল বলে, রিয়েলী ভেরি আনরচুনেট!

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর মিসেস চৌধুরী একটু হেসে অনিলবাবুকে বললেন, এত কাল যে কথা কাউকে বলতে পারেননি, তা এই দুই বউকে বলে দিলেন?

—কী করব বলুন, এদের তো মিথ্যে কথা বলতে পারি না। ওরা দু'জনেও তো আমার কাছে কোনো কিছু গোপনও করে না, মিথ্যেও বলে না।

—না, না, আপনি ঠিকই করেছেন। এদের দু'জনের চাইতে ভালো বন্ধু তো আপনার হতে পারে না।

কোয়েল হাসতে হাসতে বলে, জানেন দিদা, আমাদের তিনজনের একটা আলাদা জগৎ আছে। সেখানে আমাদের মা-বাবারও নো অ্যাডিমিশন!

মিসেস চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন, তোমাদের ঐ তিনজনের জগতে একটু ঠাঁই পাবো না?

দোয়েল সঙ্গে সঙ্গে বলে ; আপনাকে ঠাঁই না দিলে কী আপনি আমাদের এইরকম সিক্রেট মিটিং-এ থাকতে পারতেন?

যাই হোক দিনগুলো বেশ কেটে যায়।

সেদিন সকালে মিসেস চৌধুরীর ঘরে বসে দোয়েল-কোয়েল গল্পগুজব করছিল। হঠাৎ এ-কথা সে-কথার পর দোয়েল বলল, দিদা, কলকাতায় ফিরে যাবার পর আমাদের ভুলে যাবেন না তো?

—না, দিদি, তোমাদের কাউকেই ভুলতে পারবো না।

মিসেস চৌধুরী একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, দিদি, এ সংসারে কিছু কিছু মানুষকে সারা জীবনই একা থাকতে হয়। আমি এইরকমই এক অভাগিনী। আমি কারুর বাড়িতেই বিশেষ যাই না।

—কিন্তু দিদা...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উনি বললেন, না, দিদি, আমাকে জোর করো না। আমি একা একা লুকিয়ে-চুরিয়ে চোখের জল ফেলেই বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চাই।

উনি দু'হাত দিয়ে ওদের দু'জনকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, তোমাদের সঙ্গে ক'টা দিন কাটিয়ে যে আনন্দ পেলাম, তা সারা জীবনেও পাইনি। তোমাদের কথা আমি কোনোদিন ভুলব না।

পরের দিন সকালে দাদুনকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে দোয়েল-কোয়েলের সঙ্গে ওদের এক বন্ধু ও তার মা-বাবার সঙ্গে দেখা। ঐ বন্ধু জোর করে দোয়েল-কোয়েলকে ওদের হোটেলে নিয়ে গেল। বলল, সন্ধের আগেই ফিরে আসবে।

বিকেলবেলায় চা খেয়ে অনিলবাবু বারান্দায় বসে ছিলেন নাতনিদের পথ চেয়ে। হঠাৎ মিসেস চৌধুরী হাজির।

অনিলবাবু মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, বেড়াতে বেরুচ্ছেন?

—আমি কলকাতা ফিরে যাচ্ছি।

—আজই?

—হ্যাঁ।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমেই হঠাৎ নীচু হয়ে অনিলবাবুকে প্রণাম করেই ম্লান হাসি হেসে বললেন, আমাকে চিনতে পারলে না?

অনিলবাবু অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, না, ঠিক...

—আমি শিউলি।

—তুমি, শিউলি?

—হ্যাঁ।

মিসেস চৌধুরী আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধরে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হঠাৎ দেখা

এভাবে হঠাৎ মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তা সিদ্ধার্থ বা সোহিনী স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি।

একমাত্র সন্তান বিয়ের পর সংসার করার জন্য বরোদায় চলে যাবার পর ওরা দু'জনেই নীরবে এক বিচিত্র নিঃসঙ্গতার জ্বালা সহ্য করেন। তারপর আস্তে আস্তে আবার অনেকটা স্বাভাবিক হন।

সিদ্ধার্থ ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে ফ্ল্যাটে পা দিয়েই সোহিনীকে চিঠি পড়তে দেখে একটু হেসে জিজ্ঞেস করেন, সায়ন্তনীর চিঠি এসেছে?

উনি প্রায় না থেমেই ডান হাত এগিয়ে দিয়ে বলেন, দেখি, দেখি।

সোহিনী গম্ভীর হয়ে বলেন, এটা ওর পুরনো চিঠি।

—ও!

সিদ্ধার্থ একটু হতাশ হয়েই নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

সোহিনী মুখ না তুলেই একটু গলা চড়িয়ে বলেন, শ্রীধর, সাহেবকে চা দাও।

কিচেনের ভিতর থেকেই শ্রীধর জবাব দেয়, দিচ্ছি মেমসাহেব।

চা-সিগারেট খেয়ে সিদ্ধার্থ বাথরুমে যান, স্নান করেন। তারপর পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে আবার ড্রইংরুমে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ান। জিজ্ঞেস করেন, কি হল সোহিনী? কি এত চিন্তা করছ?

সোহিনী আপনমনেই একটু হেসে বলেন, ভাবছি, কিভাবে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল।

সিদ্ধার্থ একটু হেসে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ওর উল্টো দিকের সোফায় বসে বলেন, সত্যি! কি আশ্চর্যভাবে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল, তা ভাবলে অবাক হয়ে যাই।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, সায়ন্তনীকে দেখে আমার কত বন্ধুবান্ধব আর সহকর্মী যে ভাই-ভাইপো বা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছে, তার ঠিকঠিকানা নেই।...

—জানি।

—কিন্তু আমি সবাইকে সাফ বলে দিয়েছি, মেয়ে এম. এ পাশ করুক। তারপর চিন্তা করে দেখব, কবে ওর বিয়ে দেওয়া যায়।

শ্রীধর ট্রলি-ট্রে'তে হুইস্কীর বোতল, আইস বক্স, ঠাণ্ডা জলের বোতল, গেলাস আব এক প্লেট চীজ পাকৌড়া এনে সেন্টার টেবিলে সব সাজিয়ে রেখে চলে যায়। সিদ্ধার্থ গেলাসে হুইস্কি ঢেলে জল মিশিয়ে নেবার পর ঠিক দুটো আইস কিউব ফেলে এক চুমুক দিয়েই হাসতে হাসতে বলেন, প্রফেসর চিত্রা চৌধুরী এসে সব হিসেব-নিকেশ উল্টে-পাল্টে দিলেন।

সোহিনীও একটু হেসে বলেন, সব ব্যাপারটা ভাবলে আমার এখনও যেন মনে হয়, স্বপ্ন

দেখছি।...

সিদ্ধার্থ ফ্যাক্টরিতে, শ্রীধর বাজারে গিয়েছিল আর সায়ন্তনী গিয়েছিল বাণীচক্রে দ্বিজেন মুখার্জীর কাছে গান শিখতে। তাইতো বেল বাজতেই সোহিনীই দরজা খুলে ভদ্রমহিলাকে দেখে অবাক হয়ে তাকায়।

ভদ্রমহিলা এক গাল হাসি হেসে হাত জোড় করে নমস্কার করে বলেন, আমি চিত্রা চৌধুরী। সায়ন্তনী আমার ছাত্রী।

সোহিনীও এক গাল হাসি হেসে বলেন, আসুন। মেয়ের কাছে আপনার প্রশংসা শুনি না, এমন দিন যায় না।

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই মিসেস চৌধুরী বলেন, প্রশংসা করার তো কারণ দেখি না। তবে হ্যাঁ, আপনার মেয়েকে আমি একটু বেশি পছন্দ করি।

মিসেস চৌধুরী সোফায় বসতেই সোহিনী জিজ্ঞেস করেন, কি খাবেন বলুন। ঠাণ্ডা, নাকি গরম?

উনি একটু হেসে বলেন, আমার কথা শুনলে হয়তো আপনি আমাকে সন্দেশ রসগোল্লাও খাওয়াতে পারেন ; আবার বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দিতে পারেন।

—প্লীজ, ও কথা বলবেন না।

সোহিনী মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আপনি দয়া করে এসেছেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।

মিসেস চৌধুরী বলেন, ওসব কথা থাক। আমি কিন্তু এসেছি অনেক আশা নিয়ে। যদি দয়া করে আমার অনুরোধ রাখেন...

—আপনাকে আমি দয়া করবো? কি বলছেন আপনি?

—হ্যাঁ, ভাই, ঠিকই বলছি।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, সায়ন্তনীকে প্রথম দিন দেখেই মনে একটা স্বপ্ন উঁকি দিয়েছিল। তারপর গত তিন বছরে ওকে যত দেখেছি, আমার তত বেশি ভালো লেগেছে।

সোহিনীও একটু হেসে বলেন, আপনাকে ও যে কি শ্রদ্ধা করে, তা আপনি ভাবতে পারবেন না।

মিসেস চৌধুরী হাসতে হাসতে বলেন, আসল ব্যাপার হচ্ছে, আমরা দু'জনেই দুজনকে ভালোবাসি।

ঠিক এই সময় শ্রীধর বাজার থেকে ফিরতেই সোহিনী বললেন, ইনি সায়ন্তনীর প্রফেসর। শিগগির চা-টা দাও।

চা-টা খেতে খেতেই মিসেস চৌধুরী বললেন, আপনি অনুমতি দিলে একটা কথা বলতাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন। এত দ্বিধা করছেন কেন?

মিসেস চৌধুরী আস্তে আস্তে শুরু করেন, আমার বাবা রিপন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন ; আবার ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতেও লেকচারার ছিলেন। ঠিক দশ বছর হল বাবা মারা গিয়েছেন।

—মা বেঁচে আছেন?

—না, না ; মা অনেক দিন আগেই মারা গিয়েছেন।

উনি চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলেন, আমরা তিন ভাইবোন। সব চাইতে বড় হচ্ছেন দাদা, তারপর আমি আর আমার ছোট ভাই।

সোহিনী কোনো প্রশ্ন না করে ওর কথা শুনে যান।

—দাদা ব্যাঙ্গালোর থাকেন।

—উনি কি করেন?

—ইন্ডিয়ান ইনিস্টিটিউট অব সায়েন্সের সিনিয়ার সাইনটিফিক অফিসার আর বৌদি একটা কলেজে পল সায়েন্সের লেকচারার।

—ওদের ছেলেমেয়েরা কত বড়?

—ওদের দুটি মেয়ে। বড় মেয়েটি আমেদাবাদে ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব ডিজাইনে এই বছরই ভর্তি হয়েছে আর ছোট মেয়ে নাইন'এ পড়ছে।

সোহিনী বলেন, আমার এক বন্ধুর ছেলেও এন-আই-ডি'তে গত বছরই ভর্তি হয়েছে কিন্তু সায়ন্তনীর এক বন্ধু পর পর দু'বছর পরীক্ষা দিয়েও ভর্তি হতে পারলো না।

—ওখানে ভর্তি হওয়া সত্যি খুব কঠিন ; তবে একবার ওখানে ঢুকতে পারলে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর চিন্তা করতে হয় না।

—হ্যাঁ, জানি।

সোহিনী মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে জিজ্ঞেস করেন, আপনার স্বামীও কি অধ্যাপনা করেন?

মিসেস চৌধুরী একটু হেসে বলেন, না, না, ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফাইনান্স ম্যানেজার।

—ছেলেমেয়েরা কত বড়?

—আমার দুটি ছেলে। বড়টি দশ বছরের আর ছোটটি ন'বছরের।

—আপনার ছোট ভাই কী করেন?

প্রশ্নটা শুনেই মিসেস চৌধুরীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন, ওর কথা বলতেই তো আপনার কাছে এসেছি।

সোহিনী কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতেই উনি বলেন, আমার ছোট ভাই ম্যাসাচুসেটস্ ইনিস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং'এ মাস্টার্স করে মাস ছয়েক আগেই ইন্ডিয়ান পেট্রো-কেমিক্যালস্'এ জয়েন করেছে।

সোহিনী এক গাল হাসি হেসে বলেন, তার মানে সে তো দারুণ ছেলে!

—হ্যাঁ, আমার ছোট ভাই সত্যি অসম্ভব ভালো।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, মাস্টার্সেও অসম্ভব ভালো রেজাল্ট করেছিল বলে এম আই-টি ওকে রেখে দেবার জন্য খুব ভালো অফার দিয়েছিল কিন্তু ছোট মামা ওকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন।

—আপনার ছোট মামাও কি আমেরিকায় থাকেন?

—উনি হার্ভার্ড স্কুল অব ম্যানেজমেন্টে আছেন বহুদিন ধরে। ওর জন্যই তো আমার

ছোট ভাই এত বছর ধরে আমেরিকায় পড়াশুনা করতে পারল।

মিসেস চৌধুরী প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলেন, আমার এই ছোট মামা তো আমাকেও ওখানে নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার ছেলে হল বলে আমি আর গেলাম না।

—ও!

মিসেস চৌধুরী ব্যাগ থেকে একটা ফটো বের করে ওর হাতে দিয়ে বললেন, এই দেখুন আমার ছোট ভাই এর ছবি।

ছবির উপর চোখ রেখেই সোহিনী বললেন, বাবা! দারুণ হ্যান্ডসাম তো।

—আমার দাদাকেও দেখতে খুব সুন্দর। তিন ভাইবোনের মধ্যে আমিই শুধু ওদের মত সুন্দর না।

সোহিনী চোখ দুটো বড় বড় করে একটু চাপা হাসি হেসে বলেন, গড়িয়াহাটের মোড়ে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকলেও তো আপনার মতো একটা সুন্দরী চোখে পড়বে না। আর আপনি বলছেন...

ওর কথার মাঝখানেই মিসেস চৌধুরী হাসতে হাসতে বলেন, আমার স্বামী তো যখন-তখন ছেলেদের বলেন—হ্যাঁরে, তোদের কালো বুড়ি মা'কে ডেকে দে তো।

—শুনেছি, সুন্দরী চিরযৌবনা স্ত্রীর গর্বে গর্বিত স্বামীরা এইভাবেই কথা বলেন।

ব্যাস! সঙ্গে সঙ্গেই ওরা দু'জনে হো হো করে হেসে ওঠেন। ঠিক সেই মুহূর্তে সায়ন্তনী ড্রইংরুমে ঢুকেই ওর পরমপ্রিয় অধ্যাপিকাকে দেখে বিস্ময়-মুগ্ধ খুশিতে এক গাল হেসে বলে, আপনি!

মিসেস চৌধুরী হাসতে হাসতে বলেন, কি করবো বলো? তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করল বলেই চলে এলাম।

সায়ন্তনী সলজ্জ হাসি হেসে দৃষ্টি গুটিয়ে নিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে বলে, তোমাদের হাসি শুনে ভেবেছিলাম, নিশ্চয়ই বত্নামাসী এসেছে।

সায়ন্তনীর হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে পাশে বসিয়ে মিসেস চৌধুরী বলেন, তোমাদের মত ছাত্রীদের জন্য কলেজে হাসাহাসি করতে পারি না বলে কি তোমাদের বাড়িতে এসেও হাসতে পারব না?

মিসেস চৌধুরী দৃষ্টি ঘুরিয়ে সোহিনীর দিকে তাকিয়ে বলেন, আমার ছোট ভাই-এর জন্য এই মেয়েটাকে আমার চাই।

সোহিনী অবাক হয়ে বলেন, কি বলছেন আপনি? অত হাইলি কোয়ালিফায়েড ভাই এর জন্য...

—কিন্তু আমি যে তিন বছর ধরে স্বপ্ন দেখছি, এই মেয়েটাকে আমাদের চাই।...

সিদ্ধার্থ হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিয়ে বলেন, যাই বলল সোহিনী, রামানুজের মতো জামাই পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার।

—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মেয়ের চিঠিগুলো পড়েই তো বুঝতে পারি, ছেলেটা কত ভালো।

—যে ছেলেটা এত বছর আমেরিকায় কাটিয়েছে, সে যে ড্রিঙ্ক করে না, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

—চিত্রা তো বলছিল, রামানুজ ঠিক ওর ছোট মামার মতো চরিত্রবান আদর্শবান হয়েছে।

সিদ্ধার্থ হুইস্কির গেলাসে আবার চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেন, ওরা তিন ভাই বোনই তো ছোট মামাকে দেবতার মতো ভক্তি করে।

—ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে ভালো। তা না হলে ওরা এভাবে ভক্তি করে?

—হ্যাঁ, তা তো বটেই।

দু'চার মিনিট দু'জনেই চুপচাপ থাকেন।

একটু পরে সোহিনী বলেন, আমাদের মেয়ে তো জাস্ট অর্ডিনারী গ্রাজুয়েট আর মোটামুটি একটু গান জানে। ওর সঙ্গে যে এত গুণী ছেলের বিয়ে হবে, তা আমি ভাবতেই পারিনি।

—কিন্তু সায়ন্তনীকে দেখতে তো ভারী সুন্দর।

—মেয়ের রূপ থাকলেই যে তার কপালে ভালো বর জুটবে, তার তো কোনো মানে নেই।

সিদ্ধার্থ আবার একটু হুইস্কি খেয়েই সোহিনীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, আনন্দদার সঙ্গে শুভশ্রীদির বিয়ের দিন তোমার রূপ দেখেই তো দিদি-জামাইবাবুর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তাই তো...

সোহিনী গম্ভীর হয়ে বলেন, আমার বিয়ের কথা বলো না।

—কেন?

—তখন আমার বিয়ে করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না।

উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তোমার বাবা-মা আর দিদি-জামাইবাবুর পাল্লায় পড়ে আমার বাবা-মা এমনই গলে গেলেন যে আমাকে প্রায় জোর করেই বিয়ে দেওয়া হল।

সিদ্ধার্থ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলেন, আচ্ছা, তুমি কি সত্যি আগে থেকে কিছু জানতে না?

—না, কিছুই জানতাম না।

—তোমার বাবা-মা আগে থেকে তোমাকে কিছু বলেননি কেন?

—বাবা-মা খুব ভালো করেই জানতেন, আমি রিসার্চ শেষ না করে কিছুতেই বিয়ে করবো না।

সোহিনী একটু থেমেই আবার বলেন, বাবা-মা আমার মতামত খুব ভালো করে জানতেন বলে আমাকে কিছু না জানিয়েই ছোট মামার চন্দনগরের বাড়িতে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিয়ের দু'দিন আগে ওখানে পৌঁছে দেখলাম, প্যান্ডেল বাঁধা হয়ে গেছে।

সিদ্ধার্থ একটু হেসে বলেন, আসলে তোমার বাবা-মা আমার মতো ছেলেকে হাত ছাড়া করতে চাননি।

—তা ঠিক কিন্তু আমি তো তোমার মতো বিলেত থেকে পাশ করা এঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করতে চাইনি। আমি চিরকাল ভেবেছি, একজন অধ্যাপককে বিয়ে করব।

—কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে সুখেও রেখেছি।

—নিশ্চয়ই ভালোবাসো, নিশ্চয়ই সুখে রেখেছ কিন্তু প্রত্যেক মেয়ের মতো আমিও স্বামী সম্পর্কে যে স্বপ্ন দেখেছি, তা তো সম্ভব হল না।

হুইস্কির গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে সিদ্ধার্থ একটু হেসে বলেন, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সব ছেলেমেয়েরাই অনেক অবাস্তব স্বপ্ন দেখে। বাস্তব জীবনে ওসব স্বপ্নের কোনো দামই নেই।

সোহিনী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, যাকগে, ওসব আলোচনা বাদ দাও। এখন তুমিও আমাকে ফেলতে পারবে না, আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না।

এইভাবেই দিনের পর দিন কেটে যায়। ঘুরে যায় মাসের পর মাস। গ্রীষ্ম-বর্ষার পর আসে শরৎ। এরই মধ্যে সায়ন্তনীর চিঠি এলে আনন্দে-খুশিতে ফেটে পড়েন ওরা দু'জনে।

সিদ্ধার্থ ড্রইংরুমে পা দিয়েই জিজ্ঞেস করেন, লেটার ফ্রম মাই বিলাভেড ডটার?

সোহিনী মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, ইয়েস, লেটার ফ্রম মাই বিলাভেড ডটার।

সিদ্ধার্থ সামনের সোফায় বসে জুতা-মোজা খুলতে খুলতে চাপা হাসি হেসে বলেন, তোমার প্রিয় মেয়ের চিঠি একটু পড়ে শোনাবে নাকি?

—হ্যাঁ, শোনো।

সোহিনী সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করেন—শ্রদ্ধেয়া মা, তোমরা যখন হঠাৎ আমার বিয়ে দিলে, তখন মনে মনে একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ে করার মতো আমার মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। তাছাড়া তখন আমার বয়সই বা কত! তাইতো অনেক শঙ্কা-আশঙ্কা নিয়েই বিবাহিত জীবন শুরু করেছিলাম। নিজের মনেই নিজেকে বার বার প্রশ্ন করেছি—পারব কি স্বামীকে সুখী করতে? স্বামী কি আমাকে সুখে-শান্তিতে রাখবে? আমার দ্বারা কি সাংসারিক-সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে? আরো কত অসংখ্য প্রশ্ন প্রতি মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছে।

তারপর দেখতে দেখতে প্রায় একটা বছর কেটে গেল। সামনের বারোই আমাদের বিয়ের এক বছর পূর্ণ হবে। প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর ঠিক আগে আজ আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করব, আমাদের বিবাহিত জীবন সত্যি সুখের ও আনন্দের হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, আমি আমার স্বামীর জন্য যথেষ্ট গর্বিত। আমাকে নিয়েও তার খুশির সীমা নেই।

শুধু তাই না। দাদা বোম্বে এলেই আমাদের সঙ্গে দু'দিন কাটাবার পরই উনি মেয়েকে দেখতে আমেদাবাদ যান। কখনও কখনও আমরাও দাদার সঙ্গে চলে যাই। ঐ দিনগুলো যে আমাদের কি আনন্দে কাটে, তা লেখার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু বলবো, দাদা বোধহয় তাঁর প্রাণপ্রিয় ছোট ভাইয়ের চাইতে আমাকেই বেশি স্নেহ করেন। দাদাকে আমি ঠিক তোমাদের মতোই শ্রদ্ধা করি। এই এগারো মাসের মধ্যে দিদি আসতে না পারলেও এরই মধ্যে আমাকে দুটো সুন্দর ব্যাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ি পাঠিয়েছেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দিদি আমাকে চিঠি লেখেন। যদি তোমাদের জামাই ছুটি পায়, তাহলে ডিসেম্বরের শেষে আমরা

ব্যাঙ্গালোর যাব।

দিদি-জামাইবাবুর দু লাইনের চিঠি পেলাম। কি লিখেছেন জানো? লিখেছেন—মাই ডিয়ার ডার্লিং সায়ন্তনী, চিত্রা কলেজে মাস্টারি করে যা আয় করছে, তার বারো আনাই ব্যয় করছে তোমাকে টেলিফোন করার জন্য। আজকাল আমাকে এক প্যাকেট সিগারেটও প্রেজেন্ট করে না। দিস ইজ ফর ইওর ইনফরমেশন।—ইওর বিলাভেড জামাইবাবু।...

এই ক' লাইন শুনেই সিদ্ধার্থ হো হো করে হেসে ওঠে।

সোহিনী বলেন, এবার চিঠির আসল অংশটা পড়ছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়ো।

উনি এবার চিঠির শেষ অংশ পড়তে শুরু করেন—আমাদের দু'জনের শুধু ইচ্ছা নয়, আমাদের দু'জনের দাবি, আগামী বারোই আমাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর দিন তোমাদের দু'জনকে এখানে আসতেই হবে। তোমাদের কোনো ওজর-আপত্তি আমরা শুনব না। আর হ্যাঁ, ছোট মামা আমাদের বিয়ের সময় আসতে পারেননি বলে আগামী নয় বা দশ তারিখে এখানে আসছেন।...

হঠাৎ সিদ্ধার্থকে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখেই সোহিনী জিজ্ঞেস করেন, কি হল? মাথায় হাত দিয়ে বসলে কেন? মাথা ধরেছে?

সিদ্ধার্থ আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমি তো যেতে পারব না।

—কেন? তোমার তো অনেক ছুটি পাওনা আছে।

উনি অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে বলেন, দুবাইতে আমরা যে মেসিনটা পাঠিয়েছি, তার ট্রায়াল শুরু হবে দশ তারিখ। ঐ ট্রায়ালের জন্য এখান থেকে যে তিনজন এঞ্জিনিয়ারকে যেতে হবে, তার মধ্যে আমি একজন।

—ইস! কি কাণ্ড!

সোহিনী মুহূর্তের জন্যে থেমে জিজ্ঞেস করেন, এ খবর তুমি কবে জানতে পারলে?

—দুবাই থেকে কালই ট্রায়ালের দিন জানিয়েছে। চীফ্ এঞ্জিনিয়ার আজই আমাদের তিন জনকে অফিসিয়ালি জানালেন।

—তোমাদের কবে রওনা হতে হবে?

--আট তারিখের মধ্যে আমাদের ওখানে পৌঁছতে হবে।

—ফিরবে কবে?

—ট্রায়াল সাকসেস্ফুল হলে সাত-দশ দিন পরই ফিরতে পারব মনে হয় ; যদি কোনো প্রবলেম দেখা দেয়, তাহলে আরো বেশি থাকতে হবে।

সিদ্ধার্থ একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, বারো তারিখে ওদের কাছে থাকতে পারব না ভেবে সত্যি খুব খারাপ লাগছে। তবে ফেরার পথে নিশ্চয়ই ওদের ওখানে যাবো।

—তাহলে আমি তোমার সঙ্গেই ফিরব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ওখানেই থেকো। তারপর আমরা একসঙ্গে ফিরব।

সেদিন রাত্রে খেতে বসে সিদ্ধার্থ বললেন, সোহিনী, তুমি প্লেনেই যেও।

—না, না প্লেনে যাব না ; ট্রেনেই যাব।

—একলা একলা এত লং জার্নি করা খুব বোরিং হবে।

—না, না, বোরিং হবে না। সঙ্গে দু'চারটে বই থাকলে সময় বেশ কেটে যাবে।

সোহিনী একটু থেমেই জিজ্ঞেস করেন, এখান থেকে তোমরা কবে রওনা হবে?

—বোধহয় ছ' তারিখ।

—তাহলে ঐ দিনই আমিও রওনা হবো।

—সেদিন রওনা হলে আমি তো তোমাকে ট্রেনেও চড়িয়ে দিতে পারব না। তুমি তার দু' একদিন আগেই রওনা হবে।

—ঠিক আছে তোমার যা ভালো মনে হয়, তাই করো।

পরের দিন অফিস থেকে ফিরেই সিদ্ধার্থ বললেন, সোহিনী, তোমার টিকিট হয়ে গেছে।

—কোনো ট্রেনের টিকিট কাটলে?

—তুমি পাঁচই এখান থেকে গীতাঞ্জলিতে যাবে। পরের দিন রাত্রে বোম্বে পৌঁছে আমাদের গেস্ট হাউসে থাকবে। তার পরদিন ভোরে গুজরাত এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে সাড়ে বারোটায় বরোদা পৌঁছে যাবে।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, যোশী তোমাকে রিসিভ করে গেস্ট হাউসে পৌঁছে দেবে ; উনিই আবার পরদিন ভোরে তোমাকে গুজরাত এক্সপ্রেসে চড়িয়ে দেবেন।

সোহিনী বললেন, ঠিক আছে কিন্তু মেয়ে-জামাইকে তো খবর দিতে হবে।

—সেটা তো কোনো সমস্যা না। তুমি যদি চাও আজ রাত্রেই ওদের টেলিফোন করতে পারো ; নয়তো কাল আমি অফিস থেকে...

—না, না, আজই ওদের টেলিফোন করব। ওরা তো আমাদের খবর জানার জন্য হাঁ করে বসে আছে।

হ্যাঁ, সে রাত্রেই খাওয়া-দাওয়ার পর সোহিনী মেয়েকে ফোন করেন। সায়ন্তনীই ফোন ধরে।

—কে? মা? আমার চিঠি পেয়েছ?

—হ্যাঁ, কালই পেয়েছি।

—তোমরা আসছো তো?

—আমি আসছি কিন্তু তোর বাবা আসতে পারছে না।...

—কেন? বাবা আসবে না কেন?

—তোর বাবাকে ঠিক ঐ সময় দুবাই যেতে হবে।...

—দু'চারদিন আগে পরে যেতে পারছে না?

—তোর বাবাকে আট তারিখে দুবাই পৌঁছতেই হবে।

সোহিনী প্রায় না থেমেই বলেন, তবে দুবাই থেকে ফেরার সময় তোর বাবা তোদের ওখানে যাবে।

—বাবা সত্যিই আসবে তো? নাকি আমাকে ভোলাচ্ছ?

সোহিনী একটু হেসে বলেন, নারে, সত্যি তোর বাবা আসবে। আমি তোর বাবার সঙ্গেই কলকাতা ফিরব।

সায়ন্তনী বেশ অভিমানের সঙ্গেই বলে, বাবা না এলে আমি কিন্তু তোমাকেও যেতে

দেব না।

মেয়ের কথা শুনে সোহিনী না হেসে পারেন না। তারপর হাসি থামলে জিজ্ঞেস করেন, রামানুজ কি শুয়ে পড়েছে?

—না, না ; বাথরুমে স্নান করছে।

—খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

—না, না, ও তো এই মাত্র ক্লাব থেকে ফিরল।

—এতো রাত্রে ক্লাব থেকে...

মা'কে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সায়ন্তনী বলে, টেনিসের কম্পিটি'শান চলছে তো! কোনোদিনই দশটা-সাড়ে দশটার আগে খেলা শেষ হয় না।

সোহিনী এবার জিজ্ঞেস করেন, তোদের আর কি খবর?

সায়ন্তনী বেশ উত্তেজিত হয়েই বলে, জানো মা, একটু আগেই ছোট মামা কায়রো থেকে ফোন করেছিলেন।

—কায়রো থেকে? ওখানে কি উনি বেড়াতে গিয়েছেন?

—না, না, বেড়াতে যাননি। উনি একটা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করার জন্য কায়রো গিয়েছেন।

সায়ন্তনীয় মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, জানো মা, ছোট মামা মাঝে মাঝেই আমাকে ফোন করেন। উনি এত সুন্দর কথা বলেন যে তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, মা। ওনার কথা শুনেই আমার প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

—উনি তো ন'-দশ তারিখে তোদের ওখানে আসছেন?

—ছোট মামা আজই আমাকে বললেন, ওনার পেপার নিয়ে আলোচনা শেষ হলেই ওখান থেকে রওনা হবেন।

—তার মানে দু'চারদিন আগে বা পরে উনি আনছেন।

—না, না, পরে না ; বরং দু'চারদিন আগেই হতে পারে।

সোহিনী একটু হেসে বলেন, ভদ্রলোকের সম্পর্কে সবাই এত প্রশংসা করে যে ওর সঙ্গে আলাপ করার জন্য আমিও হাঁ করে বসে আছি।

—আমি জোর করে বলতে পারি, ছোট মামার সঙ্গে আলাপ করে তোমার খুব ভালো লাগবে।

পরের দিন দুপুর বেলায় হঠাৎ চিত্রা ফোন করেন।

—মাসীমা, আপনি বরোদা যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—আমি ঠিক কলেজে বেরুচ্ছি, সেই সময় আপনার জামাই ফোন করে খবর দিল। চিত্রা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, আপনি আজ কোথাও বেরুবেন নাকি?

—না, না, কোথাও বেরুব না। তুমি আসবে?

—তিনটের সময় আমার ক্লাশ শেষ হবার পরই আসছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো।

চিত্রা এলেন প্রায় চারটে নাগাদ। চা-টা খেতে খেতেই কথা হয়।

—মাসীমা, আমরা তো যেতে পারছি না। তাই ওদের প্রেজেনটেশনটা আপনার সঙ্গেই পাঠাবো।

—হ্যাঁ, তা দিও কিন্তু তোমরা যেতে পারছো না কেন?

—এখন আমাদের দু'জনের কেউই ছুটি পাবো না।

—সপ্তাহ খানেকের জন্যও ছুটি পাবে না?

—না, মাসীমা, অসম্ভব। অনার্সের মেয়েদের এখনও কিছু কোর্স বাকি আছে। যেভাবেই হোক মাস দেড়েকের মধ্যে ওদের কোর্স কমপ্লিট করতেই হবে।

তারপর এ কথা—সে কথার পর চিত্রা বলেন, তবে ছোট মামার সঙ্গে আলাপ করে খুব আনন্দ পাবেন।

সোহিনী একটু হেসে বলেন, তোমাদের সবার কাছে ওর এত প্রশংসা শুনি যে ওর সঙ্গে আলাপ করার জন্য আমিও হাঁ করে বসে আছি।

—বিশ্বাস করুন মাসীমা, নিজের ছোট মামা বলে বলছি না। আজকালকার দিনে ওর মতো মানুষ সত্যি দুর্লভ।

চিত্রা মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, উনি এত বড় পণ্ডিত, বছরে লাখ লাখ টাকা আয় করেন, এত বছর ধরে আমেরিকায় আছেন অথচ ওর মতো সহজ সরল প্রাণবন্ত সাদাসিধে বাঙালি এই কলকাতা শহরেও বিশেষ দেখা যায় না।

উনি না থেমেই বেশ গম্ভীর হয়েই বলেন, তবে ছোট মামার জন্য আমরা সবাই খুব চিন্তিত।

—কেন?

—বছর চারেক আগে ছোট মামার বাই পাস সার্জারী হয়েছে। তারপর একলা একলা থাকেন। তাই...

সোহিনী অবাক হয়ে বলেন, আমার মেয়ে-জামাই তো এ খবর কোনোদিন জানায়নি।

—ছোট মামাই চান না, ওর অসুখের খবর জানিয়ে কাউকে বিব্রত করা হোক। তাই বোধহয় আমার ভাই আপনাদের কিছু বলেনি।

—যার বাই পাস সার্জারী হয়েছে, তার তো কখনই একলা থাকা উচিত না।

—কিন্তু কি করা যাবে বলুন? উনি তো কিছুতেই বিয়ে করলেন না।

—বিয়ে করলেন না কেন?

সোহিনী একবার নিঃশ্বাস নিয়েই আবার বলেন, ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে গেলে মা-বাবার কাছে না থাকতে পারে কিন্তু বিয়ে করলে ওর স্ত্রী তো ওর দেখাশুনা করতে পারতেন।

—এসব কথা আমরাও জানি, উনিও জানেন কিন্তু উনি বিয়ে না করলে আমরা কি করতে পারি?

—কিন্তু বিয়ে করলেন না কেন?

চিত্রা এবার একটু হেসে বলেন, ঠিক জানি না ; তবে ছোট মামার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে শুনেছি, উনি ওরই এক সহপাঠিনীকে ভালোবাসতেন কিন্তু ঐ ভদ্রমহিলা অন্য একজনকে

বিয়ে করেন বলেই দুঃখে ও অভিমানে ছোট মামা সারাজীবনে বিয়েই করলেন না।

সোহিনীও একটু হেসে বলেন, এ ধরনের ঘটনা তো আকছার ঘটে কিন্তু তাই বলে কি সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে জীবন কাটাতে হবে?

কেনাকাটা গোছানো-গাছানো আর বাড়ি-ঘরদোরের ব্যাপারে শ্রীধরকে সব বুঝিয়ে দিতে দিতেই মাঝখানের কটা দিন যেন হাওয়ায় উড়ে যায়। তারপর সিদ্ধার্থ ওকে চড়িয়ে দেন গীতাঞ্জলিতে। ট্রেন ছাড়ার আগে সোহিনী বলেন, যদি পারো দুবাইতে পৌঁছে বরোদায় একটা ফোন করো।

—হ্যাঁ, করবো।

—কবে তুমি বরোদায় পৌঁছবে, তাও জানিয়ে দিও।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানাবো।

পরের দিন ঘণ্টা খানেক লেটে গীতাঞ্জলি ভি. টি. পৌঁছয়। মিঃ যোশী হাসি মুখে অভ্যর্থনা করে সোহিনীকে গেস্ট হাউসে পৌঁছে দিয়েই বলেন, ভাবীজি, প্লীজ গেট রেডি বিফোর ফাইভ। উই মাস্ট লিভ ফর স্টেশন অ্যাট ফাইভ।

হ্যাঁ, যথা নির্দিষ্ট পৌনে ছ'টার গুজরাত এক্সপ্রেসে সোহিনী বরোদা রওনা হন। অনেক দিন পর মেয়ে-জামাইকে কাছে পাবার আনন্দে উত্তেজনায় কখন যে সুরাট ভারুচ পার হয়ে যায়, তা যেন উনি খেয়ালই করেন না।

বরোদা!

সোহিনী এক মুহূর্ত দেরি না করে নিজেই সুটকেশ হাতে করে প্ল্যাটফর্মে পা দিতে না দিতেই সায়ন্তনী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে। প্রণাম করে। রামানুজও ছুটে এসে প্রণাম করে। সোহিনী দু'হাত দিয়ে দু'জনকে একসঙ্গে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন। আদর করেন।

স্টেশন থেকে গাড়িতে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সায়ন্তনী বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে, জানো মা, ছোট মামা এসে গিয়েছেন।

—উনি কবে এলেন?

—পরশু।

সায়ন্তনী মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলে, মা, তুমি ভাবতে পারবে না, ছোট মামা কি দারুণ ভালো মানুষ। আমাকে উনি কি বলে ডাকেন জানো?

—কি বলে?

—মা আদরিণী!

—বা! খুব সুন্দর নাম দিয়েছেন তো তোর।

সায়ন্তনী হাসতে হাসতে বলে, ছোট মামা, একটা বদ্ধ পাগল। উনি আমার জন্য একটা সুটকেশ কিনে সেটা ভর্তি করে শুধু আমারই জন্য কত কী এনেছেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—রামানুজের জন্য কিছু আনেননি?

—ওর জন্য খুব সুন্দর একটা স্যুট আর দুটো পুলওভার এনেছেন।

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পরই সায়ন্তনী আবার হাসতে হাসতে বলে, জানো মা,

ছোট মামা কাল রান্না করে খাওয়ালেন। উনি কি সুন্দর রান্না করেন, তাও তুমি ভাবতে পারবে না।

সোহিনী একটু হেসে বলেন, বেশিদিন বিদেশে থাকলে রান্না করা শিখতেই হয়।

কথায় কথায় রাস্তা ফুরিয়ে আসে। আই-পি-সি-এল কমপ্লেক্সে গাড়ি ঢোকে। স্টাফ কোয়ার্টারগুলো বাঁ দিকে রেখে গাড়ি ডানদিকে ঢুকতেই রামানুজ বলে, মা, এই হচ্ছে আমাদের কলোনী।

সোহিনী একবার চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েই বলেন, বাঃ! খুব সুন্দর কলোনী তো!

সায়ন্তনী সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, মা, আমাদের কলোনীটা রিয়েলী খুব সুন্দর।

গাড়িটা হঠাৎ থামতেই সায়ন্তনী ওর মা'র হাত ধরে আলতো করে একটু টান দিয়েই বলে, এসো, এসো ; এই আমাদের কোয়ার্টার।

ও রামানুজকে বলে, তুমি মা'র সুটকেশটা নিয়ে এসো।

লনে পা দিয়েই সায়ন্তনী একটু গলা চড়িয়ে বলে, ছোট মামা, শিগ্‌গির দরজা খুলুন। মা এসে গিয়েছেন।

ভিতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—আসছি মা আদরিণী।

রামানুজ সুটকেশ নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ওর ছোট মামা দরজা খুলেই সোহিনীকে দেখে অবাক হয়ে যান। ওকে দেখে সোহিনীও বিস্মিত। কয়েকটা সোনাঝরা মুহূর্তের জন্য দু'জনেই দু'জনকে মুগ্ধ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন। তারপরই রামানুজের ছোট মামা হাসতে হাসতে বলেন, আরে সোহিনী, তুমি!

সোহিনীও হাসতে হাসতে বলেন, শান্তনু, তুমি রামানুজের ছোট মামা!

বিস্মিত রামানুজ আর সায়ন্তনীর দিকে তাকিয়ে উনি চাপা হাসি হেসে বলেন, আমরা দু'জনে একসঙ্গে বি. এ আর এম. এ পড়েছি।

রামানুজ আর সায়ন্তনী আনন্দে খুশিতে হো হো করে হেসে ওঠে। দু'জনেই প্রায় এক সঙ্গে বলে, মাই গড! হোয়াট এ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ!

একটু পরে চারজনে মিলে কফি খেতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তনু সোহিনীর দিকে তাকিয়ে বলেন, আমারই ভুল হয়েছে। আমারই বোঝা উচিত ছিল, আমার মা আদরিণী শুধু তোমার পেটেই জন্মাতে পারে।

রামানুজ কফির কাপে চুমুক দিয়েই চাপা হাসি হেসে বলে, ছোট মামা, ইউ রিয়েলী থিংক সো?

—অব কোর্স।

শান্তনু মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, তোর শাশুড়ি কী অসাধারণ ভালো মেয়ে, তা আমি জানি বলেই...

ওর কথার মাঝখানেই সোহিনী বলেন, হঠাৎ এই বুড়িকে নিয়ে পড়লে কেন? আমি যে কত ভালো বা মন্দ, তা কি আমার মেয়ে জামাই জানে না?

শান্তনু ওর কথার কোনো জবাব না দিয়ে সায়ন্তনীর দিকে তাকিয়ে বলেন, মা আদরিণী, একটা গোপন খবর ফাঁস করে দেব?

—হ্যাঁ, ছোট মামা, বলুন বলুন।

—এই পৃথিবীতে শুধু সোহিনীই জানে, শ্রেয়া আমাকে বিয়ে করলো না বলেই আমি সারাজীবন একলা একলা কাটিয়ে দিলাম।

সোহিনী বলতে পারলেন না, কালিম্পং-এর সেই অবিস্মরণীয় রাত্রে শান্তনু ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, এই পৃথিবীতে তোমার চাইতে কেউ শ্রেয় নেই বলেই আজ থেকে তোমাকে শ্রেয়া বলে ডাকবো।

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, শান্তনু, তুমি জানো না, বিয়ের পর পরই শ্রেয়া মারা গেছে?

শান্তনু এক গাল হেসে বললেন, না, না, সোহিনী, আমার শ্রেয়া মরতে পারে না। 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে'।

—